~ www.amarboi.com ~

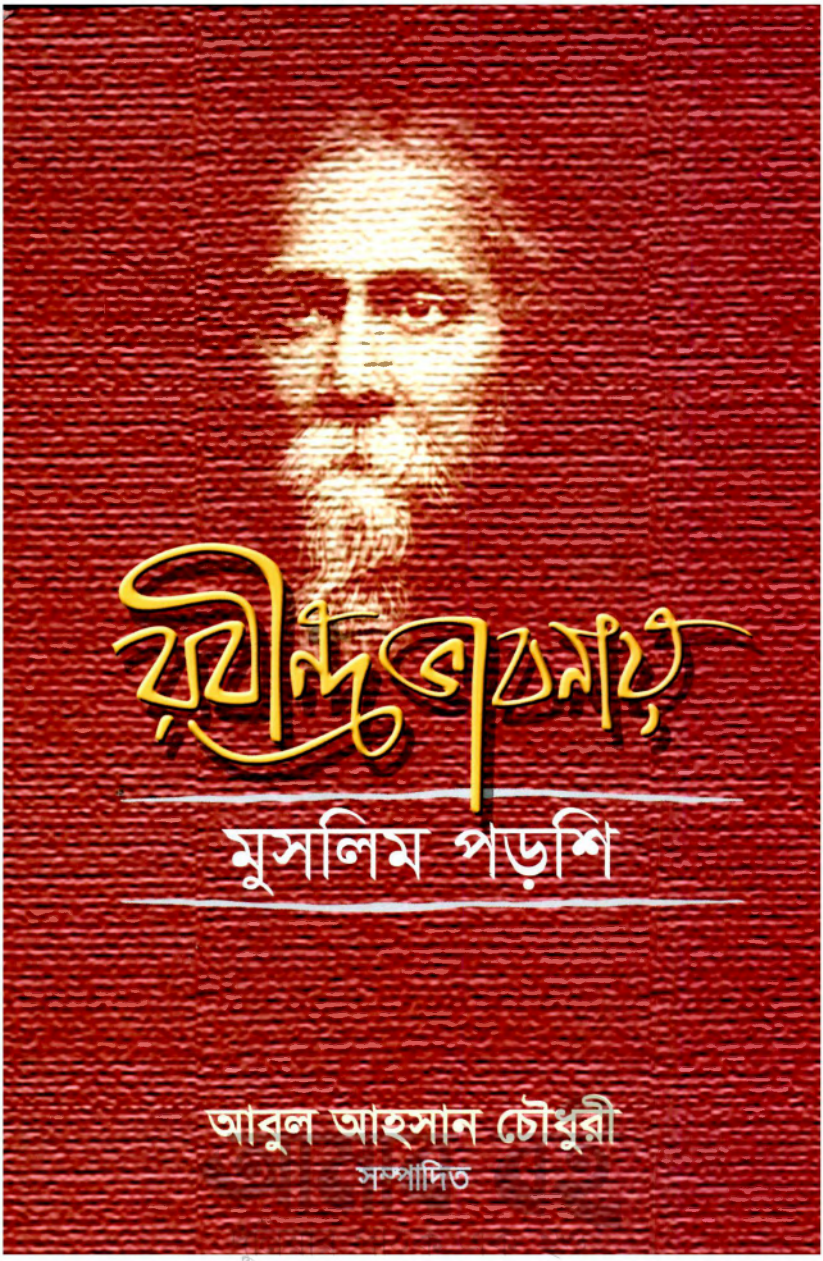

~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায় প্রায় হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বাস করলেও তাদের সম্পর্কের টানাপড়েন ও সংকট থেকেই গেছে। কেউ কাউকে গভীরভাবে জানার-বোঝার চেষ্টা করে নি। তুচ্ছ কারণে তাদের দ্বন্দ্ব-কলহ ও বিচ্ছেদ-ব্যবধান দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর ভেবেছেন। এই সমস্যা-সংকটের স্বরূপ, মূল কারণ ও তার সমাধান-সূত্র কী—সে-বিষয়ে তাঁর ভাবনার স্বাক্ষর মিলবে নানা লেখায়। নিকট-পড়শি মুসলমান সমাজ সম্পর্কে এমন গভীর আগ্রহ, অন্তর্যোগ, প্রীতি ও সহমর্মিতা আর-কোনো বাঙালি লেখক বা মনীষী দেখিয়েছেন, তার নজির নেই।

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের কালে সফল হতে পারে নি। কিন্তু তিনি আশা জাগিয়ে রেখেছিলেন মনে : 'হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই; কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব...।'

মুসলমান সমাজ ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রচিন্তার পরিচয় ও বিশ্লেষণের স্মারক একগুচ্ছ প্রবন্ধ গ্রথিত হয়েছে ড. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *রবীন্দ্রভাবনায় মুসলিম পড়শি* বইয়ে। এইসব প্রবন্ধে উদার-মানবিক-নিরপেক্ষ-সমাজমনস্ক এক রবীন্দ্রনাথের সন্ধান মেলে।

আমার বই
আমার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবুল আহসান চৌধুরী মূলত প্রাবন্ধিক ও গবেষক। সমাজমনস্ক ও ঐতিহ্যসন্ধানী। তাঁর চর্চা ও গবেষণার বিষয় ফোকলোর, উনিশ শতকের সমাজ ও সাহিত্য, সাময়িকপত্র, আধুনিক সাহিত্য ও আঞ্চলিক ইতিহাস। অনুসন্ধিৎসু এই গবেষক সাহিত্যের নানা দুষ্প্রাপ্য ও বিলুপ্তপ্রায় উপকরণ সংগ্রহ করে ব্যবহার করেছেন। তাঁর লালন সাঁই, কাঙাল হরিনাথ ও মীর মশাররফ হোসেন-বিষয়ক গবেষণা-কাজ দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে।

জন্ম কুষ্টিয়া জেলার মজমপুরে, ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৩। সাহিত্যচর্চার পেছনে আছে পারিবারিক আবহ ও আনুকূল্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি। প্রায় তেত্রিশ বছর অধ্যাপনা পেশায় যুক্ত। কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও বাংলা বিভাগের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে ওই বিভাগের প্রফেসর।

আবুল আহসান চৌধুরীর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৭৫। তাঁর লিখিত-সংকলিত-সম্পাদিত রবীন্দ্রবিষয়ক বইয়ের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য : *রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ* (১৯৯০), *রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলি* (২০০৫), *রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের পাণ্ডুলিপি* (২০০৯), *রবীন্দ্রনাথ ও লালন* (২০১১) এবং *রবীন্দ্রনাথ : বাউলসংস্কৃতি ও অন্যান্য* (২০১২)।

পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালনমেলা সমিতির লালন পুরস্কার (২০০০), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (কলকাতা, ২০০৮) এবং গবেষণায় বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০০৯)।

প্রচ্ছদ ■ উৎপল দাস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রভাবনায় মুসলিম পড়শি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রভাবনায় মুসলিম পড়শি

আবুল আহসান চৌধুরী
সম্পাদিত

নাদনিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নি বে দ ন

এক

ফকির লালন সাঁই তাঁর এক গানে বলেছেন

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
বাড়ির কাছে আরশিনগর
সেথা এক পড়শি বসত করে॥

ঠিক তেমনি হিন্দু ও মুসলমান—এই দুটি সম্প্রদায় প্রায় হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বাস করলেও তারা একে অপরের প্রায়-অচেনাই হয়ে আছে। শুধু অপরিচয়ের কুয়াশাই নয়, বিবাদে-বিরোধে তারা আত্মবিনাশের সমাধি খনন করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। এসব স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে বিচলিত রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর ভেবেছেন। এই সমস্যা-সংকটের স্বরূপ, মূল কারণ ও তার সমাধান-সূত্র কী—সে-বিষয়ে তাঁর ভাবনার স্বাক্ষর মিলবে নানা লেখায়। নিকট-পড়শি মুসলমান সমাজ সম্পর্কে এমন গভীর আগ্রহ, মনোযোগ, প্রীতি ও সহমর্মিতা আর-কোনো বাঙালি মনীষী দেখিয়েছেন, তার নজির নেই।

'এদেশে হিন্দুমুসলমান-বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্ব্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পাই না, তখন মাঝে মাঝে দূরে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কুলকে দুই বাহু দিয়ে আপন ক'রে আছে এমন এক-একটি সেতু'—কাজী আবদুল ওদুদের *হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ* পুস্তিকার 'ভূমিকা'য় তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেন। এই কথা যে তাঁর নিজের সম্পর্কেও গভীরভাবে প্রযোজ্য—সব থেকে বেশি সত্য, তা তো কবুল না করে উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথের মননচর্চায় যেমন সৃজনসাহিত্যেও তেমনি মুসলিম জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর সৌজন্য ও প্রীতিময় মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু এর পরেও অনুদার-রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের একাংশের কাছে তাঁর ভূমিকা বারবার বিতর্ক ও বিরূপতার মুখোমুখি হয়েছে,—জানা যায় 'রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে; বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমার বই

~ www.amarboi.com ~

হয়েছে, প্রতিবেশী সমাজের কোনো ছবি তাঁর সাহিত্যে নেই; যেটুকু আছে, তাও নিন্দাসূচক' (আনিসুজ্জামানের 'ভূমিকা'; ভূঁইয়া ইকবাল *রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ*, ঢাকা, বৈশাখ ১৪১৭)। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মুসলমান সমাজের এই ভ্রান্তি ও অপ্রসন্নতা কাটাতে এই সমাজ থেকেই মুক্তবুদ্ধির কিছু লেখক এগিয়ে আসেন। এ-বিষয়ে প্রথম পর্যায়ে আবদুল হামিদ খান ইউসফ্জয়ী ও মৌলভী এক্রামদ্দীন এবং কিছু পরে কাজী আবদুল ওদুদ ও তাঁর সাহিত্যসতীর্থদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

২

পরধর্ম ও ভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আচরণে-বক্তব্যে চিরকালই সৌজন্য-সহিষ্ণুতা-উদার মনোভাব দেখিয়ে এসেছেন। বিশেষ করে প্রতিবেশী মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে এ-কথা বেশি সত্য। ইসলাম ধর্ম ও তার প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নানা সময়ে নানা উপলক্ষে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি ইসলামকে 'মহান ধর্ম' ও এই ধর্মের প্রবর্তককে 'Holy Prophet' বা 'মহাপুরুষ' বলতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

মুসলমান সমাজকে অন্তরঙ্গভাবে জানার-বোঝার উপায় যে 'সাহিত্যের পথ' সে-কথায় গভীর বিশ্বাস ছিল রবীন্দ্রনাথের। আবুল ফজলের *চৌচির* (১৯৩৪) উপন্যাসটি পড়ে তাঁকে যে-চিঠি (৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০) তিনি লেখেন তাতে এই মনোভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুসলমান সমাজের জীবনযাত্রা ও ঘরোয়া খবর জানতে রবীন্দ্রনাথ যে কী পরিমাণে উৎসুক ছিলেন তা বেশ বোঝা যায় কাজী আবদুল ওদুদের *নদীবক্ষে* (১৯১৯) ও কাজী ইমদাদুল হকের *আবদুল্লাহ* (১৯৩৩) উপন্যাসের পাঠ-প্রতিক্রিয়ায়। হিন্দু-মুসলমানের আচার-সংস্কার-ধর্মান্ধতার স্বরূপ যে অভিন্ন 'আবদুল্লাহ' উপন্যাস পড়ে সে-কথাই তাঁর মনে হয়েছে 'দেখলুম যে ঘোরতর বুদ্ধির অন্ধতা হিন্দুর আচারে হিন্দুকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করেছে সেই অন্ধতাই ধুতিচাদর ত্যাগ করে লুঙ্গি ও ফেজ পরে মুসলমানের ঘরে মোল্লার অন্ন জোগাচ্ছে। একি মাটির গুণ? এই রোগবিষে ভরা বর্ব্বরতার হাওয়া এ দেশে আর কতদিন বইবে। আমরা দুই পক্ষ থেকে কি বিনাশের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও অপমান করে চলব।' এ-ও তাঁর অগোচর থাকে না, ধর্মীয় উগ্রতার বশে একজন 'কাফের' ও অপরজন 'ম্লেচ্ছ' বলে পরস্পরকে গাল দিয়ে 'আত্মীয়তা'র পথে কাঁটা ছড়িয়ে রাখে ('সমস্যা', *কালান্তর*)।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের রোগ তিনি বাইরের উপসর্গ দেখে সারানোর চেষ্টা করেন নি, গভীরে গিয়ে কারণ আবিষ্কার করে একে নির্মূল করতে চেয়েছেন। অবশ্য এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পথে তিনি ছিলেন প্রায় নিঃসঙ্গ পথিক, তাই তাঁর একক কণ্ঠের আওয়াজে সমাজের ঘুম ভাঙে নি—যাদের জন্যে তাঁর এই উৎকণ্ঠা তাদের সম্বিত ফেরে নি—বোধোদয় হয় নি। যদিও তাঁর সদিচ্ছা ও ব্যাকুলতা বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে কোনো ফল বয়ে আনে নি, তবুও কিছু সমানধর্মা বিবেকবান মানুষের মধ্যে সেই চিন্তা চারিত হয়েছে—সমকাল সাড়া না দিলেও উত্তরকাল একেবারে বিমুখ করে নি।

৩

সামাজিক পীড়ন, রাজনৈতিক বঞ্চনা কিংবা যে-কোনো অবিচার-বৈষম্যের শিকার হলে ন্যায্য বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সমাজের পক্ষে কথা বলেছেন—আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়েছেন—সমর্থন জুগিয়েছেন। মুসলমানদের তরফে যখন শিক্ষার ক্ষেত্রে—পাঠ্যপুস্তকের বিষয়-নির্বাচনের ব্যাপারে বৈষম্যের বিষয়টি তুলে ধরা হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন এই অভিযোগ সম্পর্কে সহমত পোষণ করে স্পষ্টভাবেই বলেন

বাংলা বিদ্যালয়ে হিন্দু ছেলের পাঠ্যপুস্তকে তাহার স্বদেশীয় নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমানদের কোনো কথা না থাকা অন্যায় ও অসঙ্গত' (*ভারতী*, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০৭)।

হিন্দু-মুসলমানের তুচ্ছ-স্থূল বিরোধকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন। মসজিদের সামনে বাদ্যি বাজানো—অপরদিকে গো-কোরবানির কারণে যে কলহ-বিবাদ তা ধর্মান্ধ মানুষের মূঢ়তার ফল। বিহারের গো-কোরবানির ফলে এক দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নিজের ধর্মের নামে পশু হত্যা করিব অথচ অন্যের ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না' ('ছোটো ও বড়ো', *কালান্তর*)। আবার জাতপাত-ছোঁয়াছুঁয়ির সংস্কার কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল সে-সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণযোগ্য '...আমাদের দেশে এমন অসংখ্য লোক আছে, মুসলমান যাদের কুয়ো থেকে জল তুলতে এলে মুসলমানকে মেরে খুন করতে যারা কুণ্ঠিত হয় না' ('চরকা', *কালান্তর*)।

রবীন্দ্রনাথ এ-কথা বুঝলেও সমাজপতি ও রাজনীতিকেরা বোঝেন নি যে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির ওপরেই নির্ভর করে দেশের উন্নতি—মানুষের কল্যাণ। তাই তিনি বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন 'ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গলপ্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়োই ভুল করব' ('স্বামী শ্রদ্ধানন্দ', *কালান্তর*)।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-বিদ্বেষ-সমস্যার পরিচয় তুলে ধরে এর সমাধানের যে-যে পথ নির্দেশ করেছিলেন তিনি, তার মধ্যে 'সমকক্ষতা'র ধারণাটি ছিল সবচেয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তব 'মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত, জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি' ('সভাপতির অভিভাষণ', 'সমূহ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, ১৩৫৭)।

৪

পূর্ববঙ্গে জমিদারির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার নতুন ও বিচিত্র রূপ দেখলেন। এতদিন এদের মিলনের ও ব্যবধান ঘোচানোর যেসব কথা ভেবেছেন, শিলাইদহে কিছু পরিমাণে হাতেকলমে তা তিনি করে দেখাতে পারলেন। জমিদারিতে এসেই ঘোষণা দিলেন—তিনি এবার 'সাহা'দের হাত থেকে 'শেখ'দের বাঁচাবেন। 'সাহা'রা সুদখোর বড়ো মহাজন আর 'শেখ'রা গরিব মুসলমান প্রজা। কথা রাখলেন কবি-জমিদার—ফলে চরের বেয়াড়া মুসলমান প্রজারাও তাঁর বশ মানলো। পুণ্যাহ উপলক্ষে যে দরবার বসতো, সেখানে হিন্দু ও মুসলমান প্রজার বসার ব্যবস্থা ছিল আলাদা আলাদা,—হিন্দুরা বসতো জাজিমের ওপর আর মুসলমানদের জাজিম উলটে বসতে দেওয়া হতো—রবীন্দ্রনাথ সেই আসন-বৈষম্য ঘোচালেন। আবার তাঁর জমিদারি এলাকায় গো-কোরবানি নিয়ে গোল বাধলো। রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে জানিয়েছেন 'আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোর্‌বানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করিনি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে, তারা তখনই তা মেনে নিলে। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটে নি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন' ('হিন্দু-মুসলমান', *কালান্তর*)।

৫

শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথের সুযোগ হয় বাউলদের সঙ্গে আলাপেশার। সরাসরি আলাপের সুযোগ হয় গগন হরকরা আর লালন ফকিরের শিষ্য-শাবকদের সঙ্গে। নানা সাধকের কণ্ঠে শোনেন লালনের গান। বাউলেরা তো জাতধর্ম মানেন না—শাস্ত্র মানেন না—হিন্দু-মুসলমানে ভেদ করেন না—লালনের অনেক গান আছে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অসাম্প্রদায়িক চেতনার– জাতপাত আর শাস্ত্রধর্মের বিপক্ষে। সম্প্রদায়-সম্প্রীতির প্রেরণার জন্যে রবীন্দ্রনাথ লালন ও বাউলদের কাছেও কিছু ঋণী। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রয়াসে এই বাউলসম্প্রদায় ও শিক্ষিত ভদ্রজনের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের বাউলগানের সংকলন 'হারামণি'র 'ভূমিকা'য় রবীন্দ্রনাথ খোলসা করে বলেছেন 'আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্চেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু, আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত, প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন ক'রে এসেচে। বাউলসাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই; একত্র হয়েচে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করে নি। এই মিলনে সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয় নি; এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্য্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধে নি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্ব্বরতা। বাঙলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেচে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেচে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।'

বেশ বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের হিন্দু-মুসলমানকে মিলিয়ে দেওয়ার যে সাধনা তার মূলে মরমিসাধনার সম্প্রদায়-সম্প্রীতির আদর্শও কাজ করেছে। তাই এই 'হারামণি'র ভূমিকায় মানব-মিলনের সাধক হিসেবে যেমন বাংলার বাউল-ফকির তেমনি রামানন্দ, কবির, দাদু, রবিদাস, নানক—মধ্যযুগের এই মানবপ্রেমী সন্তসাধকদের কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। সর্বমানবের মিলনের মরমি সুর তাই রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যে ধ্বনিত হয়েছে 'যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খ-মুখরিত দেবালয়ে যে পূজারী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর' (বিজয়া সম্মিলনীর ভাষণ ১৩১২)।

৬

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের শুরুটা কবে থেকে?—এই প্রশ্নের সঠিক জবাব পাওয়া ভারি মুশকিল! অনেকেই মনে করেন ব্রিটিশের ভেদনীতিই এই বিবাদের উৎস। কী রাজনীতিক কী ইতিহাসবিদ তাঁদেরও এই একই মত। সুরেন্দ্রনাথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আগেই এমন তথ্য জানিয়েছিলেন। হাল আমলে ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরী ব্রিটিশ শাসনকেই এরজন্যে দায়ী করেছেন। কিন্তু মার্জনা চেয়ে সবিনয়ে বলি, অতীত কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। মোগল আমলেও যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, সে তথ্য মেলে 'সিয়ারুল মোতাআখেরীন' পুস্তকে। মধ্যযুগের সাহিত্যেও হয়তো এর নমুনা ছিটেফোঁটা পাওয়া যেতে পারে। মুসলিম শাসনের গোড়ার দিকে বিরোধটা যতো তীব্র ছিল, ধীরে ধীরে তা থিতিয়ে আসে—তার মানে দ্বন্দ্বটা সহনীয় পর্যায়ে ছিল। এর কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

মুসলমান শাসনে সেই বিরুদ্ধতার তীব্রতা ক্রমশই কমে আসছিল, কেননা তারা এই দেশকেই আপন দেশ করে নিয়েছিল—সুতরাং দেশকে ভোগ করা সম্বন্ধে আমরা পরস্পরের অংশীদার হয়ে উঠলুম।... কিন্তু তীব্রতর বিরুদ্ধতা রয়ে গেল ধর্ম নিয়ে। মুসলমান শাসনের আরম্ভকাল থেকেই ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই আপন জীবনে ও বাক্যপ্রচারে এই বিরুদ্ধতার সমন্বয়-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন' ('হারামণি'র ভূমিকা)।

তাই বলা যায়, এই দুই সম্প্রদায়ের মনান্তর ও বিরোধের ইতিহাস যথেষ্টই পুরনো। তবে আপন স্বার্থের প্রয়োজনে এই বিচ্ছেদ-কলহের 'অগ্নিতে ঘৃতাহুতি' দিয়েছিল ব্রিটিশ শাসকেরা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ জীবনভর বিচ্ছিন্ন-বিবদমান এই দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের সাধনা করেছেন—হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সেতু হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। এই দুই নিকট-পড়শির মিলনের আকাঙ্ক্ষায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, সেই কথা আজ স্মরণ করতে হয় 'হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই, কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব; যদি না আসি তবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' ('হিন্দু-মুসলমান', *কালান্তর*)।

দুই

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ২০ নভেম্বর ২০১১ কলকাতায় 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ' বিষয়ে দিনব্যাপী এক আলোচনার আয়োজন করেন। বাংলাদেশের আমন্ত্রিত-আলোচক হিসেবে ওই আলোচনাসভায় অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়। আগে থেকেই এই বিষয়ে একটা আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল, সাহিত্য পরিষদের আলোচনা তা আরও উসকে দেয়। এই বইয়ের পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্যে ভেতরে ভেতরে জোর-তাগিদ অনুভব করি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মুসলমান সমাজ বা হিন্দু-মুসলমান বিরোধ—এই বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তর লিখেছেন, আবার রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন অনেকেই—রবীন্দ্রনাথের সম্প্রদায়-সম্প্রীতির ভাবনায় তাঁরা প্রাণিত। আমরা রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ-বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো এখানে গ্রথিত করেছি। এই বইয়ে সংকলিত সব লেখাই সুলভ নয়—তেমন অন্তত একটি লেখা সংগ্রহ করে দিয়েছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ড. স্বপন বসু। প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রবন্ধটি পেয়েছি বিশিষ্ট কবি-প্রাবন্ধিক-সাংবাদিক আবুল মোমেনের সৌজন্যে। ড. ভুঁইয়া ইকবাল, যাঁর *রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ* বইটিকে এই বিষয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচনা করা যায়, তাঁর আন্তরিক সহায়তার কথাও স্মরণ করি। আমার ছাত্র ড. মাসুদ রহমান প্রুফ দেখা ও অন্যান্য কাজে যথেষ্ট শ্রম ও সময় দিয়েছেন। এই সূত্রে মোঃ হুসাইন টিটুর কথাও উল্লেখ করতে হয়। ভূঁইয়া ইকবালের বইয়ের ভূমিকাটি এই বইয়ে ছাপার অনুমতি দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন শ্রদ্ধেয় এমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান—লেখাটির নামও তিনি দিয়ে দেন। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখাটি পুস্তিকা হিসেবে বের হয়েছিল। ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই সংকলনধর্মী পুস্তিকাটি হয়তো বেশি প্রচার পায় নি বলেই, এর উল্লেখ কেউ তেমন একটা করেন নি। আবুল ফজলের বক্তব্যের পরিপূরক বিবেচনায় তাঁর দুটি প্রবন্ধ এই সংকলনে নেওয়া হয়েছে। এই বইয়ে সংকলিত লেখাগুলি কোন্ বই বা পত্রিকা থেকে গৃহীত, তা জানা যাবে শেষে সংযোজিত প্রকাশনার তথ্যসূত্র থেকে।

নান্দনিক অত্যন্ত আগ্রহ ও যত্ন নিয়ে এই বই প্রকাশ করেছেন—সেজন্যে প্রকাশক লায়লা সিদ্দিকীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষ আবদুল হান্নান ঠাকুর ও মোঃ মাসুদুর রহমানের উদ্‌যোগের কথাও বলা প্রয়োজন—এবং সেইসঙ্গে প্রচ্ছদশিল্পি উৎপল দাসের কথাও।

শাস্ত্র-ধর্ম ও জাতপাতের আচার-সংস্কার যেন মানুষের মধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষের দেয়াল না তোলে—রবীন্দ্রনাথের এই আকুতি ও আবেদন আমাদের বিশ্বাস ও আচরণে সত্য হয়ে উঠুক—শুভবুদ্ধির উদয় হোক মনুষ্যত্বের অমৃতধারায় স্নাত হয়ে—এ-ই কামনা।

আবুল আহসান চৌধুরী

বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচি

কাজী আবদুল ওদুদ ॥ রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান-সমাজ ১৭
আবুল ফজল ॥ মুসলিম স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও রবীন্দ্রনাথ ২১
রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ ২৯
অমিতাভ চৌধুরী ॥ ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ৩৮
আনিসুজ্জামান ॥ রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমানসমাজ একটি ভূমিকা ৫৭
খোন্দকার সিরাজুল হক ॥ রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ ৬০
আসাদ চৌধুরী ॥ রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ ৮২
ভূঁইয়া ইকবাল ॥ রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ ১০০
প্রবোধচন্দ্র সেন ॥ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১১৫
মৈত্রেয়ী দেবী ॥ হিন্দু-মুসলমান ও রবীন্দ্রবাণী ১২৮
গৌরী আইয়ুব ॥ হিন্দু-মুসলমান বিরোধ—রবীন্দ্রনাথের চোখে ১৬৭
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ॥ রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ১৮৬
হুমায়ুন আজাদ ॥ রবীন্দ্রপ্রবন্ধ মুসলমান ও হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক ২১৩
গোলাম মোস্তফা ॥ ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ২৩৫
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ॥ গল্পগুচ্ছের মুসলিম চরিত্র ২৪৯
মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া ॥ রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলিম সমাজ ও জীবন ২৫৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান-সমাজ

কাজী আবদুল ওদুদ

আজকার দিন বাংলাদেশের পক্ষে যে এক দুর্দিন সে-কথা অনেকেই বলে থাকেন। হয়ত মিথ্যা বলেন না। এমন একটা সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য, অবিশ্বাস, এমন-কি শত্রুতা, আজ বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে যে, এই পরিমণ্ডলে বাস করা ভদ্রব্যক্তিদের পক্ষে রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তবে আর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বর্তমানের এই অস্বস্তিকর অবস্থা মনে হয় ভালই। ফোঁড়া যখন পেকে ওঠে তখনকার যন্ত্রণা অসহ্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সান্ত্বনাও পাওয়া যায় যে, বেদনার অবসান হতে দেরী হবে না।

এই দিনে কোনো কোনো শিক্ষিত মুসলমান বাঙালীর মুখেও শুনতে পাওয়া গেছে এই প্রশ্ন   রবীন্দ্রনাথ একজন অতি বড় কবি, মহামানব, বিশ্বপ্রেমিক, কিন্তু তাঁর বাড়ীর কাছের মুসলমানদের জন্য তিনি কি করেছেন?

এরূপ প্রশ্ন বহুবার আমাকে শুনতে হয়েছে। কিন্তু একবার একজন শ্রদ্ধেয় মুসলিম সাহিত্যিক এ প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলেন তা মনে রাখবার মতো; তিনি বলেছিলেন   আকাশের সূর্য মুসলমানদের জন্য বিশেষ কি করেছে?

রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের সমালোচকদের উক্তির এইই হয়ত শ্রেষ্ঠ প্রত্যুত্তর। কবি আকাশের সূর্যের মতোই একজন সহজ মানববন্ধু। অবশ্য যেহেতু কবি একজন মানুষ, এক বিশেষ পরিবেষ্টনের সৃষ্টি, সেজন্যে অত্যন্ত কাছে থেকে তাঁকে দেখতে গেলে তাঁর সত্যকার পরিচয় না পাওয়াই স্বাভাবিক। অত্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে আলোকের উৎস সূর্যেও ধরা পড়ে কালো দাগ। যে গোলাপ সৌষ্ঠবে আর গন্ধে অতুলনীয় তার স্পর্শলোভাতুর লাভ করে হাতে কাঁটার আঘাত। কিন্তু কালো দাগ সত্ত্বেও সূর্য সূর্যই। কাঁটা সত্ত্বেও গোলাপ গোলাপই। এক বিশেষ পরিবেষ্টনে জন্ম

'আমাদের দুঃখ'-প্রণেতা আনোয়ারুল কাদীর

~ www.amarboi.com ~

সত্ত্বেও কবি চিরন্তন মানব—তাঁর পরিবেষ্টনের সমস্ত সীমারেখা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে তাঁতে উৎসারিত হয় মানুষের চিরন্তন সুখ, চিরন্তন দুঃখ, চিরন্তন প্রেম, চিরন্তন অভয়। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ কবি, এবং যেহেতু মুসলমান মানুষ, সেজন্যে মুসলমান তার আজকার বিশেষ ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রভাবে বুঝুক আর নাই বুঝুক, রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিকই তার পরম বন্ধু ব্যতীত আর কিছু নন।

কিন্তু চিরন্তন যদি সত্য হয়, যা স্থানিক ও কালিক তাও তো মিথ্যা নয়। আজকার এই বিশেষ যুগে যদি কবি-রবীন্দ্রনাথের মুসলিম দেশ-ভ্রাতাদের মনে এই অকরুণ প্রশ্ন জেগে থাকে যে তিনি তাঁদের কোন্ কাজে লেগেছেন, তবে সত্য-জিজ্ঞাসুকে সে-প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হয়।

এই প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের মুসলমান প্রতিবেশীর মনে জেগেছে প্রধানত দু'টি কারণে,—প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশ্বকবি নন, বিশেষভাবে একজন ভারতীয় কবিও বটে। সেই ভারতীয়তার রূপ দান করতে গিয়ে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু মনোরম চিত্রও তিনি অঙ্কিত করেছেন; তাঁর সেই সব সৃষ্টি হিন্দুকে শুধু আনন্দিতই করেনি, গর্বিতও করেছে।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত বিরূপতা না থাকলেও, এমন কি অল্পাধিক অনুরাগ সত্ত্বেও, সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি প্রায় মৌনীই রয়েছেন তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে।

খুব সহজভাবে এই ব্যাপারের এই ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যে, শিল্পীর তুলিকার অবলম্বন হয় যে-সমস্তের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় হয় সেই-সব। হয়ত তাঁর প্রতিদিনের পরিচিত মুখ তাঁর তুলিকায় ধরা পড়ে না, কিন্তু ক্ষণিকের দেখা এক আধ-পরিচিত মুখ তাঁর অন্তরে চাঞ্চল্য জাগায় দীর্ঘ দিন ও দীর্ঘ রাত্রি। শিল্পীর এই পক্ষপাতের তত্ত্ব দুরধিগম্য। কিন্তু হয়ত প্রশ্ন হবে, রবীন্দ্রনাথ তো শুধু শিল্পী নন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ জীবন-সমালোচক। সে-ক্ষেত্রে তাঁর দেশবাসী মুসলমান সম্পর্কে তাঁর প্রায়-তুষ্ণীম্ভাব অদ্ভুত নয় কি?

এ-প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের একদল অনুরাগী এই কৈফিয়ৎ দিয়ে থাকেন, যে মুসলমান সাধারণত সমালোচনা-অসহিষ্ণু। এরূপক্ষেত্রে আলোচনা বা সমালোচনার পক্ষে যে-অবাঞ্ছিত কলহ অপরিহার্য রবীন্দ্রনাথের রুচি তাঁকে সে-পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করেছে। কিন্তু এই কৈফিয়ত বড় দুর্বল। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর সমালোচনাও কম করেননি, এবং সে-ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর কলহ তিনি যে এড়িয়ে যেতে পেরেছেন ঠিক তা নয়। হয়ত তিনি এড়িয়ে যেতে চানও নি, চাইলে এই বাণী তাঁর জন্য অসত্য হ'ত—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি' উঠে খর খড়্গ সম...

বস্তুত তাঁর দেশবাসী মুসলমান সম্পর্কে তিনি যে কম আলোচনা করেছেন তা নয়, অন্তত, তিনি যে আলোচনা করেছেন তা' গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমান ধর্মের প্রতি—অথবা পরধর্মের প্রতি—তাঁর যে-শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর 'সতী' নাটিকায় তা তুলনাহীন। ভারতের মুসলমান শাসনের দোষ ও গুণ দুই-ই তাঁর আলোচনার বিষয় হয়েছে।* বিশেষত ভারতীয় মুসলমানের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাইরের মুসলমানের পার্থক্য কোথায় এবং ভারতীয় মুসলিম জীবনের সত্যকার পরিণতি কোন্ পথে সে-সম্বন্ধেও স্পষ্ট ভাষায় তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন।* তাঁর এই সব মত স্বীকার্য কি অস্বীকার্য তার চাইতেও বড় কথা এই যে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই তিনি এ-সব মতামত ব্যক্ত করেছেন।

অবশ্য মুসলমানের ধর্ম বা ধর্ম-প্রবর্তক সম্বন্ধে কোনো বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেন নি। কিন্তু বিস্তৃত আলোচনা কোনো ধর্ম সম্পর্কেই তিনি করেন নি। তিনি যে কবি—জগতের প্রাত্যহিক জীবনের সাহচর্য আর আত্ম-অনুভূতি এই-ই যে তাঁর জীবনের রাজপথ—এ-বোধের সঞ্চার তাঁতে হয়েছিল তাঁর প্রথম যৌবনে আর এই স্বধর্ম থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি কখনো। একজন ব্রাহ্মনেতার সন্তান হয়ে তিনি জন্মলাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই পিতৃধর্মও তাঁর জন্য হয়েছিল এক প্রেরণার স্থল, পরিক্রমণের স্থল নয়। এসম্বন্ধে তাঁর এই উক্তি স্মরণীয়

> ...ধর্মসম্প্রদায় ব্যাপারটাকে আমরা কী চোখে দেখিব? তাহাকে এই বলিয়াই জানিতে হইবে যে, তাহা তৃষ্ণা মিটাইবার জল নহে, তাহা জল খাইবার পাত্র। সত্যকার তৃষ্ণা যাহার আছে, সে জলের জন্যই ব্যাকুল হইয়া ফিরে, সে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে গণ্ডূষে করিয়াই পিপাসা নিবৃত্তি করে। কিন্তু যাহার পিপাসা নাই সে পাত্রটাকেই সবচেয়ে দামি বলিয়া জানে। সেই জন্যই জল কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিক নাই, পাত্র লইয়া বিষম মারামারি বাধিয়া যায়। তখন যে-ধর্ম বিষয়বুদ্ধির ফাঁস আলগা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহা জগতে একটা নূতনতর বৈষয়িকতার সূক্ষ্মতর জাল সৃষ্টি করিয়া বসে, সে-জাল কাটানো শক্ত।*

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভিতরে সত্যের জন্য এই যে সহজাত তৃষ্ণা ছিল এই জন্যই হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সব সমাজেরই সত্যকার ধর্ম-জিজ্ঞাসুদের তিনি পরম বন্ধু তা তিনি সেই সমস্ত ধর্মের বিশেষ আলোচনা ও অনুশীলন করুন আর নাই করুন। যে সমস্ত

---

* দ্রঃ আত্মশক্তি ও আধুনিক সাহিত্য।
* দ্রঃ আত্মপরিচয় পরিচয়।
* দ্রঃ চারিত্রপূজা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুসলমান সমালোচক এই প্রশ্নের অবতারণা করেন—রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের জন্য কি করেছেন, তাঁদের নিজেদের প্রথমে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত—মুসলমান কে, এবং কি সে চায়। যদি মুসলমানীর অর্থ এই হয় যে তা বিশেষ কতকগুলি অনড় মতবাদের সমষ্টি তবে সে-মুসলমানীর জন্য রবীন্দ্রনাথ কিছুই করেন নি। এই মুসলমানীর সমর্থন কোরআন, হজরত মোহম্মদ, এবং যুগযুগান্তের মুসলিম-শ্রেষ্ঠরাও করেন নি, বরং তার প্রতিবাদ করেছেন, যেমন মহামনীষী সাদী বলেছেন

তরিকত ব-জূজ্ খেদ্মতে খাল্ক নিস্ত
ব-তস্বিহ্ ও সাজ্জাদা ও দল্ক নিস্ত।

সৃষ্টির সেবা ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয়, তস্বিহ জায়নামাজ ও আলখাল্লায় ধর্ম নেই। অথবা যেমন কোরআনে বলা হয়েছে—আল্লাহ্ সম্বন্ধে ভুল ধারণার জন্য মানুষ আল্লাহ্র রোষে পতিত হয় না, পতিত হয় দুষ্কৃতির জন্য (১১ ১১৭)।

কিন্তু মুসলমানীর অর্থ যদি হয় সত্যপ্রীতি, কাণ্ডজ্ঞান-প্রীতি, মানব-প্রীতি, জগৎপ্রীতি, ন্যায়ের সমর্থন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ, তবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় মুসলমান এ যুগে আর কেউ জন্মেছেন কি না সে-কথা এই সব সমালোচকদের গভীর বিচার-বিশ্লেষণের বিষয় হওয়া উচিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় মুসলমান আজও ভুগছে একটি মানসিক বিকৃতি থেকে, ইংরেজিতে তাকে বলা হয় Inferiority complex. তারা সংখ্যায় অল্প, প্রভাবে খর্ব, এই চেতনা তাদের অন্তরে সঞ্চারিত করেছে একটি মানসিক অস্বস্তি। সেই মানসিক অস্বস্তির চশমার সাহায্যে জগৎকে যথাযথভাবে দেখা ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। এই মানসিক অস্বস্তি যেদিন তার কেটে যাবে, তার পরিবর্তে তার অন্তরে সঞ্চারিত হবে অভয় ও আশা, সেদিন সহজেই সে বুঝবে, দেশে দেশান্তরে মুসলমানদের মধ্যে অমুসলমানদের মধ্যে কোথায় তার পরম মিত্রেরা বাস করছেন। সেদিনে আজকার একশ্রেণীর দুঃখী মুসলমানের এই যে প্রশ্ন—কবি ও বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাদের জন্য কি করেছেন, এটি তার অট্টহাসির সামগ্রী হবে।

১৩৪৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুসলিম স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও রবীন্দ্রনাথ

আবুল ফজল

রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন সত্যেরই সার্বিক রূপ একই সময় কারো মনে প্রতিভাত হওয়ার কথা নয়। কারণ, এ সবই কালের ও ইতিহাসের ঘটনাস্রোতের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা। যে কোন সত্যের ভবিষ্যৎ পরিণতি এ ক্রমবিবর্তনেরই ফল। তাই যে কোন সত্যের প্রথম উপলব্ধি ও তার প্রতিভাস আংশিক না হয়ে যায় না।

ইকবালকে যে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা বলা হয় তা-ও মাত্র আংশিক সত্যেরই প্রকাশ। বাকীটা আমরা উচ্ছ্বাস ও আবেগ দিয়ে পূরণ করে নিই। না হয় ওয়াকিফহালদের ভালো করেই জানা আছে যে, তিনি যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থাৎ বর্তমান পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের বাসভূমির কোন স্থান ছিল না। তখনকার ভারতের এ অংশ মুসলমান প্রধান হলেও তাঁর স্বপ্নের পাকিস্তান প্রায় দেড় হাজার মাইলের যে নৈসর্গিক দূরত্ব রয়েছে তা তিনি কল্পনার রথে চড়েও পার হতে পারেন নি। এ দুই মুসলিম প্রধান এলাকা নিয়ে যে এক রাষ্ট্রীয় সেতুবন্ধন সম্ভব এ উপলব্ধি সেদিন তাঁর রাষ্ট্রীয় চেতনায় ছিল অনুপস্থিত। তাই সেদিন বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান, কাশ্মীর আর আফগানিস্তানকে নিয়ে গঠিত পাকিস্তানই ছিল তাঁর স্বপ্নের পাকিস্তান। তাই পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ইকবাল কথাটা আংশিক সত্য। এটা তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র অগৌরবের কথা নয় অথবা তাঁকে খাটো করার জন্যও কথাটা উত্থাপিত হয়নি। কোন সত্যেরই পরিপূর্ণ রূপের উপলব্ধি একই কালে ও একই সঙ্গে হয় না। হওয়া যে সম্ভব নয় তার নজির হিসেবেই মাত্র এই ইতিহাসটুকুর প্রতি ইংগিত করা হলো। অসামান্য প্রতিভাবান সমাজবিজ্ঞানী মার্ক্স পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা উপলব্ধি করেছিলেন তাও কি পুরোপুরি সত্য হয়েছে? তাঁর উপলব্ধিকেও বড় জোর আংশিক সত্যই বলা যায়। আজ পাকিস্তানে সে সব নেতা-উপনেতা-রাষ্ট্রবিদ আর শাসকদের আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁদের মধ্যে এমন অনেকেই

~ www.amarboi.com ~

আছেন যাঁরা পাকিস্তানের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেই ছিলেন সন্দিহান। দেড় হাজার মাইলের দূরত্ব আর ভাষা এবং জীবনযাত্রার দুস্তর ব্যবধান নিয়ে একটা স্থায়ী ও সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র যে গঠিত হতে পারে, সেদিন এঁরা তা আরো অনেকের মতো বিশ্বাসই করতে পারেন নি। অথচ পাকিস্তান আজ একটা বাস্তব সত্য এবং তার রাষ্ট্রীয় সংহতি আর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহানদের মনেও আজ আর কোন সন্দেহ নেই।* কাজেই কেউ যদি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বা বক্তা হিসেবে খাঁটি প্রমাণিত না-ও হন, তাতে তাঁর অবদানের মূল্য কমে যায় না আর তিনিও হয়ে যান না ছোট।

অনেক সময় অভাবিত ঘটনা-স্রোতের দ্বারা ইতিহাসের গতিধারা যায় পাল্টে আর হয় নিয়ন্ত্রিত। এ গতিধারা এত দুর্বার যে, মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা চাওয়া-না-চাওয়া তাতে তৃণের মতো ভেসে যায়। পাকিস্তানও এই ঐতিহাসিক গতিধারারই ফল। কেউ কেউ, বিশেষ করে প্রতিভাবানেরা, যাঁরা সমাজ ও মানুষের চরিত্র ও মানস-জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, অনেক সময় ইতিহাসের গতিধারা আঁচ করতে পারেন। অবশ্য এ আঁচ করায় যে আগামী ইতিহাসের পরিপূর্ণ চেহারা ফুটে উঠবে তা আশা করা যায় না।

বিশেষত ইকবাল আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি। ইকবাল মাঝে মাঝে তাঁর কবি-ভূমিকা ছেড়ে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যে জড়িত হয়ে পড়েননি, তা নয়। এককালে মুসলিম লীগ রাজনীতিতে সক্রিয় অংশও তিনি গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁর মনে তাঁর পরিচালিত মুসলমানদের জন্য (তিনি কখনো পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে পদার্পণ করেছেন শুনিনি) একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-কাঠামো জেগে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন অর্থে রাষ্ট্রবিদ ছিলেন না। কিন্তু কোন কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে সাময়িকভাবে তিনি যে অংশ গ্রহণ না করেছেন তা নয়; কিন্তু সব সময় তাঁর কবিসত্তাকে রেখেছেন নির্লিপ্ত আর কখনো তাঁর কবি-ভূমিকা যাননি ভুলে। তাই দেশের রাজনৈতিক কাঠামো কি হবে বা কি হওয়া উচিত এ নিয়ে তিনি কখনো মাথা ঘামান নি। কবিরা অনুভূতিশীল—অনুভূতিই তাঁদের নিজস্ব খাস এলেকা। তাই রাজনীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেটুকু করেছেন বা লিখেছেন তা সবই তাঁর কবিমনের অনুভব—অনুভূতিরই ফল, ফসল। ভবিষ্যতে ভারতের রাষ্ট্রীয় রূপ কি হবে সে সম্বন্ধেও তিনি কোন দিন কোন স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন মনে পড়ে না। তাঁর কাছ থেকে সে আশাও বোধ করি কেউ করেনি।

কাজেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় রূপের স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন বা ঐরকম কল্পনা করেছিলেন, তা মনে না করেও বলা যায়—যে মনোভাব [illegible] পাকিস্তানের তথা

---

* এ-প্রবন্ধ বাংলাদেশ [illegible] লেখা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুসলিম মনে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের চেতনা, দাবি ও প্রতিষ্ঠা, তা তিনি তাঁর স্বাভাবিক কবি-দৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে পেরেছিলেন। নীচে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু লেখা উদ্ধৃত করব যার থেকে সহজেই বুঝতে পারা যাবে মুসলমানদের হৃদয়-বেদনা তিনি কতখানি বুঝতে পেরেছিলেন এবং প্রতিবেশী সমাজের অসহিষ্ণু ও অন্যায় ব্যবহারের ফলে তাদের মনে কি ভাবে একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ তখন থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, উঠতে চেয়েছিল, তাও তাঁর উপলব্ধির বিষয় না হয়ে পারেনি। এই স্বাতন্ত্র্যবোধেরই ত শেষ পরিণতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তথা পাকিস্তান। ১৯৪০-এর আগ পর্যন্ত মুসলমানদের সব রকম রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল চাকরি ও দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিষদে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি। এ আন্দোলনে মুসলমানরা প্রতিবেশী সমাজের কাছ থেকে কোন সহানুভূতি কি সহযোগিতা তো পায়ইনি বরং পদে পদে পেয়েছে বাধা। সামাজিক ক্ষেত্রে, মানুষ হিসেবে মুসলমানরা যে ব্যবহার পেয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের মতো স্থির-ধী মানুষকেও যে-ভাবে বিচলিত করে তুলেছিল তা থেকে মুসলমান সমাজের বিরক্তি ও মরিয়া হয়ে ওঠা সহজেই অনুমেয়। এ বিরক্তি ও মরিয়া হয়ে ওঠাই জুগিয়েছে পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি ও তার প্রেরণা। ১৯৩৯-এর মাঝামাঝি থেকে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯৪১-এ মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কখনো পুরোপুরি সুস্থ হননি। তাই পাকিস্তানের দাবি-দাওয়া বা রূপ-রূপায়ণ সম্বন্ধে তিনি কোন মন্তব্য করে যান নি, যেতে পারেন নি। তবে পাকিস্তানের পটভূমি কি ভাবে রচিত হয়েছে ও হচ্ছিল তার যথেষ্ট সাক্ষ্য তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় রেখে গেছেন। তার কয়েকটি মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হল

(ক) হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রী-ভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইত নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে নাই।

আমরা বিদ্যালয়ে ও অফিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি, সেটা সম্পূর্ণ প্রীতির নহে তাহা মানি, তবুও সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে।...

বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল।... বাংলার মুসলমান যে এ বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।

—লোকহিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

(খ) যে সময় দেশের লোক তৃষিত চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত, যে সময়ে রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ার পর্যবেক্ষকরা খবর দিলেন যে, হোমরুলের প্রবল মৌসুমী হাওয়া আরব সাগর পাড়ি দিয়াছে, মুষলধারে বৃষ্টি নামিল বলিয়া; ঠিক সেই সময়েই মুষলধারে নামিল বিহার অঞ্চলে মুসলমানের প্রতি হিন্দুদের একটা হাঙ্গামা।

...নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোন নাম দেওয়া যায় না।

—ছোটো ও বড়

(গ) অল্পকাল হলো একটা আলোচনা আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তার সিদ্ধান্ত এই যে, পরস্পরের মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এক চালের নীচে হিন্দু-মুসলমান আহার করতে পারে না, এমন কি সেই আহারে হিন্দু ও মুসলমানের নিষিদ্ধ কোনো আহার্য যদি নাও থাকে। যাঁরা এ কথা বলতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সময় তাঁরাই সন্দেহ করেন যে বিদেশী কর্তৃপক্ষরা এ বিরোধ ঘটাবার মূলে।

—বাতায়নিকের পত্র

(ঘ) হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উদ্দেশ্যে পরস্পরের মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্তন করা সহজ নয়। সমস্যাটা সেখানেই ঠেকেছে। হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের—স্বরাজপ্রাপ্তির লোভেও একথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না। আমি একজন ইংরেজি নবিশের কথা জানতেম, হোটেলের খানার প্রতি তার খুব লোভ ছিল। তিনি আর সমস্তই রুচিপূর্বক আহার করতেন। কেবল গ্রেট ঈস্টার্ণের ভাতটা বাদ দিতেন। বলতেন, মুসলমানের রান্না ভাতটাত কিছুতেই মুখে উঠতে চায় না। যে সংস্কারগত কারণে ভাত খেতে বাধে সেই সংস্কারগত কারণেই মুসলমানের সঙ্গে ভালো করে মিলতে তাঁর বাধবে।

—স্বরাজ সাধন

(ঙ) আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান, কোরবানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সঙ্গত বলে মনে করিনি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের যখন ডেকে বলে দিলুম কাজটা যেন এমন ভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে তারা তখনই তা মেনে নিলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোন উপদ্রব ঘটেনি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।

আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানের ত্রুটি বিচারটা থাক—আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি।

—হিন্দু-মুসলমান

(চ) আমি যখন আমার জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানায় এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞাসা করলেম 'এ কেন'—তখন জবাব পেলেম, যে সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোষে বসাতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ-প্রথা তো অনেক দিন ধরে চলে এসেছে, অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে। জাজিম তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তারপর এদের ডেকে একদিন বলেছি, 'আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে। তখন দেখি অপর পক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বল্লে, 'আমরা পৃথক।' আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়। বাধা ঐ জাজিম তোলা আসনের বহুদিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোটো নয়। ওখানে অকুল অতল কালাপানি। বক্তৃতা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই তা পার হওয়া যায় না। এ দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্বন্ধ থাকবে না, হয়তো বা প্রয়োজনের থাকতে পারে—সেইখানেই যে ছিদ্র, ছিদ্র নয়, কলির সিংহদ্বার। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানেই আকাশ ভেদ করে ওঠে অমঙ্গলের জয়তোরণ। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়ই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটা কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতে পারে কিন্তু ছাদ রক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়।

—কালান্তর

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মহাপ্রাসাদের-ছাদ ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাওয়ার পটভূমি কি, কেন এবং কি ভাবে রচিত হয়েছে এবং এরজন্য কারা দায়ী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে স্পষ্টতর ভাষায় আর কেউ বোধ করি প্রকাশ করেন নি। দীর্ঘদিনের অন্যায় ব্যবহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর হৃদয়হীন উপেক্ষা ও ঘৃণার ফলে হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান, যে ছিদ্র ও ফাঁক দেখা দিয়েছিল, যার ফলে মুসলমানরা বলতে বাধ্য হয়েছিল 'আমরা পৃথক'—তা রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রত্যক্ষ করেন নি, হৃদয় দিয়ে অনুভবও করেছেন। উপরের উদ্ধৃতিগুলোতে তার বিস্তর প্রমাণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়, বিশেষ করে উদ্ধৃত রচনাগুলি লেখার সময় পাকিস্তান শব্দটি রাষ্ট্রীয় পরিভাষায় স্থান গ্রহণ করেনি, হয়নি চালু। তাই ঐ শব্দটি স্বাভাবিক কারণেই তাঁর রচনায় অনুল্লেখিত। না হয় মুসলমানরা যে কারণে পাকিস্তান দাবি করেছে তার সুস্পষ্ট ইংগিত তাঁর লেখায় খুঁজে পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরো দু'একটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর মন্তব্য শোনা যেতে পারে।

(ছ) 'আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা হিন্দুদের পক্ষে যতই অপ্রিয় হোক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়।'

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটি সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এ সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

'আমরা রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে তাহাকে আহ্বান করিয়াছিলাম, তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।'

—রবীন্দ্র-জীবনী ২ খণ্ড

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছিলেন তা-ও স্মরণীয়।

(জ) 'মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।'

একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। ঠিক সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না। এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কি করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়া মিলন হইবে।

—রবীন্দ্র-জীবনী ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮

পাকিস্তানেরও এই একই আদর্শ ও সমস্যা—নিজের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তা বজায় রেখে অন্য রাষ্ট্র ও জাতির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। মুসলমানরা আপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
প্রকৃতিতে মহৎ হতে চাওয়ারই ফল পাকিস্তান। রবীন্দ্রনাথ এই চাওয়াটাকে 'সত্য ইচ্ছা' বলে অভিহিত করেছেন ও জানিয়েছেন স্বীকৃতি।

উপরে রবীন্দ্রনাথের যে সব উদ্ধৃতি দেওয়া হলো তার মর্মকোষে পাকিস্তানের বীজ যে নিহিত ছিল সে বিষয়ে আশা করি পাঠক নিঃসন্দেহ হতে পেরেছেন। অবশ্য বীজের বেশী মূল্য এর নয়। মুসলমানের স্বতন্ত্র জীবনদর্শন কিভাবে অবস্থার বিপাকে পড়ে আর হিন্দুসমাজের গোঁড়ামি আর নির্মম অসহনীয়তার ফলে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যবোধে রূপান্তরিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আরো কোন কোন রচনায়ও তার প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে। যে বেদনাবোধের ফলে মুসলমানের মনে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রচেতনার উন্মেষ এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির জাগ্রত চিত্তে কি ভাবে তার পূর্বাভাস ঊষালোকের প্রথম রশ্মিরেখার মতো ছায়াপাত করেছিল তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে কবি-চরিত্রের আর একটা দিকের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তাঁর সম্বন্ধে মুসলমানদের একটা ভুল ধারণার অবসান হবে বলেই আমার বিশ্বাস। কবির অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি-প্রতিপত্তির সুযোগ, বিশেষত তাঁর শেষ বয়সে যখন পার্শ্বচরদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের মনোবল তার কমে এসেছে, তখন অনেকে যে নেননি তা নয়। বেশী করে নিয়েছেন সাম্প্রদায়িকরা। অনেক সময় অন্যায় জেনেও নেহাৎ অনিচ্ছায় এ ঢেঁকি কবিকে গিলতে হয়েছে। এ ধরনের একটা নজির উল্লেখ করছি। ১৯৩৯-এর ২০শে জুন রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখছেন—"হিন্দু-মুসলমানের চাকরির হার বাঁটোয়ারা নিয়ে অবিচার হয়েছে। এ নিয়ে হিন্দুরা ভারত শাসন দরবারে নালিশ জানিয়েছেন। সে পত্রে নাম স্বাক্ষর করতে আমার যথেষ্ট দ্বিধা ছিল।... অনিচ্ছা সত্ত্বেও নালিশের পত্রে আমি সই দিয়েছি।" এই সম্বন্ধে কবির বিখ্যাত জীবনীলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন "বলাবাহুল্য এ শ্রেণীর কাজ কবিকে বহুবার করিতে হইয়াছে। বিশেষভাবে জীবনের শেষ দিকে পাঁচজনের অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিতেন না। অনেক সময় 'সুখের থেকে সোয়াস্তি ভালো' মনে করিয়া পারিপার্শ্বিকের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহু জিনিসে তিনি সহি দিতেন।"

—রবীন্দ্র-জীবনী ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৮

কাজেই এ রকম ঢেঁকি গেলার মধ্যে আসল রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের আসল স্বরূপ তাঁর কবি-সত্তায়। সে সত্তা স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুভব-অনুভূতির প্রেরণায় স্বদেশের কি বিদেশের মানুষের লাঞ্ছনা আর অন্যায় অবিচারে ও অপমানে বারে বারে আলোড়িত, মথিত ও অভিব্যক্ত হয়েছে। উপরের উদ্ধৃতিগুলি তাঁর

~ www.amarboi.com ~

স্বদেশবাসী মুসলমানদের বেদনা তাঁর কবি-মানসে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তারই নিদর্শন। এ প্রতিক্রিয়া যে নির্ভুল পরবর্তী ইতিহাসই তার সাক্ষী।

ভারতবর্ষের হিন্দু এবং মুসলমান কেন এক জাতি হতে পারে নি, হতে পারে নি এক রাষ্ট্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ—তার বাধা ও অন্তরায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন তা নির্ভুল বলেই আমার বিশ্বাস। আজ দু'টা স্বাধীনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও সেই মন্তব্য ও তার অন্তর্নিহিত সত্য কিছু মাত্র মিথ্যা হয়ে যায়নি। তাই ভারত ও পাকিস্তান উভয় পক্ষের কবির এ বাণীও স্মরণীয় "রক্তের সঙ্গে রক্তের যোগ না হইলে—মস্তকের সহিত পদের অঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত রক্ত চলাচল সহজ ও স্বাভাবিক না হইলে এক জাতি বা Nation গঠিত হয় না, বহুজাতির শিথিল সমবায় মাত্র হতে পারে—Federation of castes হতে পারে। কিন্তু তাহা Nation বা মহাজাতি গঠনের পরিপন্থী।"

—রবীন্দ্র-জীবনী ২য় খণ্ড, পৃ. ৪

জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্যের সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রবিধানেরও রয়েছে সায়। অন্তত কোন বিরোধ নেই। কবি মনীষীর এ মন্তব্যের আলোকে আমরা যদি ভারত ও পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখি তা হলে ইতিহাসের এ পরিণতি ছাড়া অন্য কোন পরিণতি ভাবা যায় কি?

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ

আবুল ফজল

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাংবাদিকী ও বিকৃত প্রচারণার ফলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছুটা ভুল ধারণা যে আমাদের দেশে প্রশ্রয় পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মুসলমান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে উদাসীন ছিলেন তা নয়, অনেকের বিশ্বাস তিনি কিছুটা বিরূপও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি, জীবন-ধর্মী কবি। কবি হিসেবে তাঁর দিকে না তাকিয়ে, নিজেদের ইচ্ছানুগ কল্পনার সঙ্গে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য মিলিয়ে মতামত দিতে গিয়েই এ বিভ্রাটের সৃষ্টি। আমি অন্য এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের দুঃখ ও মর্মবেদনা কিভাবে কতটুকু বুঝতে পেরেছিলেন আর তার বিভিন্ন রচনায় তা কতখানি ভাষায়িত হয়েছে তার কিছুটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে আরো উপকরণ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে যার সন্ধান নিলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণারই অপনোদন ঘটবে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি বা লেখক ছিলেন না—এক সুস্থ স্বাভাবিক নাগরিক জীবনও যাপন করেছেন তিনি—মতামত দিয়েছেন দেশের পাঁচটা সমস্যা সম্বন্ধেও। এ সত্ত্বেও রবীন্দ্র-মানসের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা মোটেও সংকীর্ণ অনুদার বা সাম্প্রদায়িক নয়।

কোন বড় প্রতিভা সম্বন্ধেই ভুল ধারণা প্রশ্রয় পাওয়া উচিত নয়। পেলে মনের ভিতর এমন একটা সংস্কার গড়ে ওঠে, যা সে প্রতিভাকে বোঝার প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা ভাষাভাষীদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে না চাওয়া বা সে সম্বন্ধে অনীহা থাকার মতো ক্ষতি কল্পনা করা যায় না। কারণ আজো রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্য।

প্রতিভার এক বড় লক্ষণ সর্বানুভূতি ও গ্রহণশীলতা। বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্য এ বিষয়ে এক প্রামাণ্য দলিল। দেশ বিদেশে যেখানে যা কিছু ঘটেছে, মানুষের মন-মানসে যে সব নবতর ঢেউ দোলা দিয়েছে তার সব কিছু রবীন্দ্র-মানসকেও করে তুলেছে অণুরণিত। সব সময় খোলা ছিল তাঁর মনের সব বাতায়ন। তাঁর কালে দেশ দুই পৃথক রাষ্ট্রে ভাগ হয়নি। তখনো এক দেশ এক ভাষার মানুষ হয়েও হিন্দু-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুসলমানের সামাজিক জীবন প্রবাহিত ছিল ভিন্নতর খাতে—রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ঐক্য এবং এ দুই ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিক পারস্পরিক নির্ভরতাও সামাজিক ঐক্য স্থাপনে হয়েছে ব্যর্থ। এ সবই রবীন্দ্রনাথের দেখা—এর পরিণতি লক্ষ্য করে তিনি বার বার হয়েছেন ব্যথিত। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত তাঁর নিজের সমাজও গ্রহণ করেনি—তাঁর কথা সেদিন কারো কাছে মনে হয়নি মুখরোচক।

হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা ও বিরোধ শুধু যে দীর্ঘকালের তা নয়, দিনে দিনে তা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত জটিল আর জট-পাকানো। এর ফলে মাঝে মাঝে যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তাকে রবীন্দ্রনাথ স্রেফ 'বর্বরতা' বলেই অভিহিত করেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা যে বীভৎস রূপ নেয় তাকে এর চেয়ে মোলায়েম শব্দে হয়তো প্রকাশ করাই যায়না। মনে হয় এটি রবীন্দ্রনাথের মনে এক ক্ষত-চিহ্ন হয়েই বিরাজ করেছিল দীর্ঘকাল ধরে।

১৯৩৫ সালে বিশ্বভারতীতে 'নিজাম বক্তৃতা' দেওয়ার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদকে আর বক্তৃতার বিষয় নির্ধারণ করেছিলেন—'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ'। এ বিরোধের জটিলতা আর 'বিভীষিকা' তাঁকে কতখানি ভাবিত করে তুলেছিল এই বিষয় নির্বাচনে রয়েছে তার ইংগিত। ওদুদ সাহেবের সে তথ্যবহুল মূল্যবান বক্তৃতা কবির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতী থেকে।

রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনে পুরোপুরি সক্রিয় তখনো সচেতন মুসলিম মধ্যবিত্ত তথা বুদ্ধিজীবী সমাজের আবির্ভাব ঘটেনি। তখন বাংলাদেশে যে স্বল্প সংখ্যক মুসলিম অভিজাত পরিবার ছিল তাদের বা তাদের বংশধরদের বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের সঙ্গে ছিল না কোনরকম যোগাযোগ; ফলে সামাজিক ভাবে মুসলমান সমাজের খুব কাছাকাছি আসার তেমন সুযোগ রবীন্দ্রনাথ জীবনে পাননি। বলা বাহুল্য সামাজিক ঐক্য আর সাম্য ছাড়া তা সাধারণত সম্ভবও হয় না—সাংস্কৃতিক চেতনা আর সমভাবিতাও তার জন্য অত্যাবশ্যক। পারস্পরিক ভাব-বিনিময় আর সমঝোতার ঐ পথ। সাহিত্য আর শিল্পের ক্ষেত্রে চিন্তা আর ভাবনা কিছুটা সমরেখা ধরে চল্লেই সহযোগিতা আর সহমর্মিতা হয় সহজ আর স্বাভাবিক।

স্বাধীনতার আগে হিন্দু আর মুসলমানের জীবন-ধারা সমান্তরাল ছিল না। তবুও রবীন্দ্র-জীবন অনুধাবন করলে দেখা যায়—সে যুগে, সে অবস্থায়ও যতদূর সম্ভব তিনি মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের বুঝতে ও তাদের কাছাকাছি আসতে চেয়েছেন। নজরুলের কাব্যজীবনের সূচনায় তিনি তাঁর 'বসন্ত' নাটিকা উৎসর্গ করে তরুণ কবিকে দিয়েছেন স্বীকৃতি; কবির 'ধূমকেতু'কে জানিয়েছেন স্বাগতম্, জেলখানায় কবির অনশনের খবর পেয়ে উৎকণ্ঠিত ভাষায় পাঠিয়েছেন টেলিগ্রাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবি গোলাম মোস্তফার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রক্তরাগ' যখন বের হয় তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকেও উৎসাহিত করেছিলেন এ বলে

তব নবপ্রভাতের রক্তরাগখানি
মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।

জসীমউদ্‌দীন রবীন্দ্রনাথের শুধু যে স্নেহভাজন ছিলেন তা নয়, অজস্র উৎসাহও তিনি পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে—ঠাকুরবাড়ীর আরো অনেকের কাছ থেকেই পেয়েছেন স্নেহ ও ভালবাসা। সে সব কথা জসীম নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কবি আবদুল কাদিরের প্রথম কাব্য "দিলরুবা" পড়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহিত করে লিখেছিলেন, "তোমার দিলরুবা কাব্যখানি পড়ে খুশী হলুম। ভাষা এবং ছন্দে তোমার প্রভাব অপ্রতিহত। তোমার বলিষ্ঠ লেখনীর গতিবেগ কোথাও ক্লান্ত হয় না। বাঙলার কবি-সভায় তোমার আসনের অধিকার অসংশয়িত। বিষয় অনুসারে কবিতায় তুমি মাঝে মাঝে আরবী-পার্সি শব্দ ব্যবহার করেছ, আমার কাছে তা অসঙ্গত মনে হয়নি।" শেষের মন্তব্য সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই মূল্যবান।

১৯৩৭-এর ৬ই মার্চ মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের একটি ভ্রাম্যমাণ দল শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন খুবই অসুস্থ। তা সত্ত্বেও ছাত্রেরা যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল তিনি তাদের যে কবিতাটি তখন লিখে উপহার দিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল

"আমার আত্মার মাঝে ঘন হলো কাঁটার বেড়া এ
কখন সহসা রাতারাতি
স্বদেশের অশ্রুজলে তারেই কি তুলিব বাড়ায়ে
ওরে মূঢ়, ওরে আত্মঘাতী।
ওই সর্বনাশটাকে ধর্মের দামেতে করো দামী
ঈশ্বরের করো অপমান
আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন শয়তান!
ও কাঁটা দালতে গেলে দুই দিকে ধর্ম-ধ্বজীদলে
ধিক্কারিবে। তাহে ভয় নাই,
এ পাপ আড়ালখানা উপাড়ি ফেলিব ধূলিতলে,
জানিব আমরা দোঁহে ভাই"

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই একমাত্র হিন্দু চিন্তাবিদ যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' যে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হওয়ার অনুপযুক্ত—এ মত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দুসমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। 'বন্দেমাতরমে'র প্রতি মুসলমানদের আপত্তি ও বিক্ষোভ রবীন্দ্রনাথ অন্তর দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন ও স্বীকার করে নিয়েছিলেন বিনা দ্বিধায় নিজ সমাজের ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই। বলা বাহুল্য, প্রচলিত হিন্দুত্বের আচার-বিচারে রবীন্দ্রনাথ কখনো বাঁধা পড়েন নি। সামাজিক তথা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভংগী যে কতখানি উদার ও যুক্তিনির্ভর ছিল নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে তা আরও স্পষ্টতর।

"ধর্ম যখন বলে—মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো, তখন কোন তর্ক না করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব। ধর্মের এ কথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে 'মুসলমানের ছোঁয়া অন্ন গ্রহণ করবে না' তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে—কেন করব না এ কথাটা আমার কাছে ঘড়ার জলের মতো অনিত্য। তাকে রাখব কি ফেলব সেটার বিচার যুক্তির দ্বারা। যদি বল এসব কথা স্বাধীন বিচারের অতীত, তাহলে সমস্ত বিধানের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হবে, বিচারের বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার ধিক্কার আছে, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। তারা পাণ্ডাকে দেবতার চেয়ে বেশী ভয় ও শ্রদ্ধা করে...।"

১৯৩৬-এ প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের এক ভাষণের কিয়দংশও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে "নানা কারণে অবশ্য এতদিন মুসলমান সম্প্রদায় সুযোগ সুবিধার অসাম্য হেতু নানারূপ কষ্ট পাইয়াছে। এ বৈষম্য হইতে তাহারা যাহাতে মুক্ত হয় সর্বান্তঃকরণে তাহাই আমি চাই।... মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু-দুর্লভ ও প্রশংসনীয় গুণের সমাবেশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; বিশেষত তাহাদের সহজাত গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি তাহাদিগকে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে মুসলমান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অল্প নহে, আমি তাহাদের মনেপ্রাণে ভালবাসিয়াছি, তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়াছি। আমি সব সময় আশা করিয়াছি, সে মূঢ়তা ও অসংস্কৃত যুক্তিহীনতা আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা এই ব্যক্তিগত নৈকট্যবোধ ও মৈত্রীবুদ্ধির কাছে পরাজিত হইবে।"

১৩১২ সনে এক বিজয়া সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন তাতেও তাঁর সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়

"যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খ-মুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান সভয় পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গুণী ও যোগ্য মুসলমানকে রবীন্দ্রনাথ সবসময় শ্রদ্ধা করতেন এবং কাছে আনার চেষ্টাও কম করেন নি। তাঁর জীবনী থেকে কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি

"বিশ্বভারতীতে যখন হিন্দুস্তানী গান শিখাইবার ক্লাস খোলা হয়, তাহাতে প্রথমেই দুইজন মুসলমান ওস্তাদকে নিযুক্ত করা হয়।" রঃ জীঃ

"১৩৩৫-এর বর্ষামঙ্গল উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল আলাউদ্দীন খাঁর যন্ত্রসঙ্গীত। কবির আহ্বানে তিনি পুত্র আকবর আলী খাঁর সহিত পক্ষকাল শান্তিনিকেতনে থেকে যান। এই সময়ে তাঁর ভাই আয়াত আলী খাঁ সংগীত ভবনের সহিত যুক্ত হন।" রঃ জীঃ

শ্রীনিকেতনে ডক্টর মুহম্মদ আলী নামে এক কৃষি-বিজ্ঞানী বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক মৌলানা জিয়াউদ্দীনের মৃত্যুতে কবি তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যে কবিতা লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেন :—

"কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব
কারো অর্থের খ্যাতি
কেহ বা প্রজার সুহৃদ সহায়
কেহ বা রাজার জ্ঞাতি
তুমি আপনার বন্ধু জনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।"

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত মন্তব্য অর্থপূর্ণ

"ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে।" রঃ জীঃ

১৩৪০ সনে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রের জবাবে জনাব এম, এ, আজমকে লিখেছিলেন "সর্বপ্রথমে বলে রাখি, আমার স্বভাবে ও ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানে দ্বন্দ্ব নেই। দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে সমস্ত দেশেরই অগৌরব মনে করে থাকি।"

বলা বাহুল্য মুসলমানরাও রবীন্দ্রনাথকে কম শ্রদ্ধা করতেন না। কবির আহ্বানে হায়দ্রাবাদের নিজাম বিশ্বভারতীকে এক লক্ষ টাকা সাহায্য করেছেন। পরে নিজাম অধ্যাপকের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য দেন আরো উনিশ হাজার টাকা। মনে রাখতে হবে সে যুগে টাকার মূল্য এখন থেকে অন্তত দশগুণ বেশী ছিল। মুসলিম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কর্তৃত্বাধীন ওসমানিয়া এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি, লিট উপাধি দিয়ে কবিকে সম্মানিত করেছেন, এবং কবি-প্রতিভাকে দিয়েছেন স্বীকৃতি।

১৯২০ সালে একবার রবীন্দ্রনাথ বোম্বে পৌঁছে জানতে পারলেন কয়েক দিনের মধ্যেই জ্বালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সাম্বৎসরিক সভা হচ্ছে আর তার সভাপতি হচ্ছেন ব্যারিস্টার মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্। জিন্নাহ্ সাহেবের অনুরোধে কবি ঐ সভার জন্য একটি ভাষণ লিখে পাঠিয়েছিলেন। জ্বালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর নাইট উপাধি ত্যাগ করেন, তখন বিহারের সে যুগের অন্যতম জননায়ক ব্যারিস্টার হাসান ইমাম কবির কাছে প্রেরিত এক টেলিগ্রামে বলেছিলেন Your action is as we expected. Please accept my most loving homage.

১৯১০-এ য়ুরোপ যাওয়ার সময় জাহাজে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সহযাত্রী ছিলেন আগা খাঁ। জাহাজের অন্যান্য যাত্রীরা ছিল সবাই সাহেব-মেম। এ সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার প্রভাত মুখার্জী লিখেছেন "এই প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মাঝে তিনি বেশ স্বস্তি অনুভব করেন যখন মহামান্য আগা খাঁর সঙ্গে দেখা হয়। আগা খাঁর মুখে হাফিজের কবিতার আবৃত্তি শুনিতে বড়ই ভাল লাগে। সেই অপরিচিতের মরুতে এই ছিল মরূদ্যান।" রঃ জীঃ

মুসলিম ভাব সাধনার এক বড় অঙ্গ সূফীবাদ। এসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহম্মদ হাবিবকে দিয়ে এ সম্পর্কে বিশ্বভারতীতে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থাও কবি করেছিলেন ১৯৩৬-এ।

১৯২৪-এ চীনের পথে হংকং-এ রবীন্দ্রনাথ "পূর্ব ব্যবস্থানুসারে সুরাতি মুসলমান ব্যবসায়ী জনাব নমাজির বাড়ীতে সদলবলে উঠিলেন।" রঃ জীঃ

১৯২৭-এর কথা। কবির সহযাত্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন "কবি সিঙ্গাপুরে পৌঁছুলে অভ্যর্থনাকারী আরিয়াস উইলিয়ামস জানালেন যে মালয় উপদ্বীপের গভর্নরের একান্ত ইচ্ছা কবি যেন তাঁর মালয় প্রবাসের প্রথম তিন দিন তাঁর অতিথি হয়ে লাটভবনে থাকেন। কথাটা শুনে কবি কিছুমাত্র খুশী হলেন না। কবি সদলবলে নামাজিদেরই আতিথ্য গ্রহণ করলেন।"

শুধু দেশে নয়, বিদেশেও রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের কাছ থেকে প্রচুর শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছেন। পারস্যে, ইরাকে, মিশরে যেখানেই কবি গেছেন সেখানে তিনি সংবর্ধিত হয়েছেন—পেয়েছেন জনগণের ভালবাসা। বাংলা ভাষাভাষী না হয়েও তাঁরা বাংলা ভাষার কবিকে জানিয়েছেন আন্তরিক শ্রদ্ধা। ১৯৩২-এ কবি যখন পারস্যে যান তখন একদিনের বর্ণনা "পথে শাহ বেজা নামক এক গ্রামে লোকে কবির মোটর থামাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল।" রঃ জীঃ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৩৩-এ পারস্যের তদানীন্তন শাহ রেজা শাহ পাহলবী আগাপুরে দাউদ নামক একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতকে নিজ ব্যয়ে শান্তিনিকেতনে পাঠান পারসী ভাষা ও সংস্কৃতির অধ্যাপক হিসাবে।

১৯২৬-এ একবার কবি মিশর গিয়েছিলেন। তখন ফুয়াদ মিশরের রাজা। এ ভ্রমণের একদিনের ঘটনা কবি এক পত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন

"পরদিন কায়রোর পালা।... বৈকালেই সেখানকার সর্বোত্তম আরবী কবির বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ। সেখানে ঈজিপ্টের সমস্ত রাষ্ট্রনায়কগণ উপস্থিত ছিলেন।

পাঁচটায় পার্লামেন্ট বসবার সময়। আমার খাতিরে এক ঘণ্টা সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে জানানো হলো—এমন ব্যবস্থা বিপর্যয় আর কখনও আর কারো জন্য হতে পারতো না। ওখানে ক্লানুন ও বেহালা যন্ত্রযোগে আরবী গান শোনা গেল। বোঝা গেল, ভারতের সঙ্গে আরব পারস্যের রাগরাগিণীর লেনদেন এক সময় খুবই চলেছিল।"

রাজা ফুয়াদ বিশ্বভারতীর জন্য পরে বহু আরবী গ্রন্থ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গোড়ার দিকে বিশ্বভারতীতে গোঁড়ামীও কম ছিল না। হয়তো নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের খাতিরে হিন্দু বর্ণভেদ প্রথাকে আমল দিতে কবি বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর উদার জীবনদর্শনই জয়ী হয়েছে—বর্ণাশ্রমের কৃত্রিম ভেদরেখা পরে একটির পর একটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে শান্তিনিকেতনে।

১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু সংবাদ শান্তিনিকেতনে পৌঁছা মাত্রই কবি বিদ্যালয়ে ছুটি দিয়ে শোকসভার ব্যবস্থা করেন। সে সভায় কবি বলেন

"Turkey was once called the sickman of Europe until Kamal came and set before us an example of a new Asia where living present recalled the glories of dead past... Kamal Pasha's heroism was not on the battlefield only, he waged a relentless war against the tyranny of blind superstition which perhaps is the deadliest enemy a people have to contend against. To his own people he was a great deliverer, to us he should remain a great example."

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তা নয়, উপরন্তু তাঁর মধ্যে এমন একটা সহজাত মনুষ্যত্ববোধ ছিল, যা সব সময় তাঁকে সব রকম ক্ষুদ্রতা ও মনুষ্যত্বহীনতার ঊর্ধ্বে থাকতে সহায়তা করেছে। যে যুগে ও যে পরিবেশে তাঁর জন্ম

~ www.amarboi.com ~

সেখানে মানুষের অপমান ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনো তার শিকার হননি।

১৯১৯-এ একবার রবীন্দ্রনাথ শিলং থেকে সিলেট আসছিলেন। তখনো শিলং-সিলেট মোটর রাস্তা তৈরী হয়নি। সাধারণত চেরাপুঞ্জী পর্যন্ত মোটরে অথবা এক্কায় এসে সেখান থেকে 'থাপায়' চড়েই আসতে হতো সিলেটে ও অন্যান্য নিম্নভূমিতে। 'থাপা' মানে—মানুষের মাথার সঙ্গে ফেটি-বাঁধা চেয়ার। আর খাসিয়া শ্রমিকরাই নিজের পিঠে এসব চেয়ার বহন করতো। এ দুর্গম পথে মানুষের পিঠে চড়ে সিলেট আসতে রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই রাজী হননি। তিনি গৌহাটি হয়ে লামডিং ঘুরে রেলপথেই সিলেট এলেন।

এমন সবল ও গভীর মনুষ্যত্ববোধের জন্যই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল মুসলমান প্রজাদের জন্য স্বতন্ত্র ও নিম্নমানের আসন-ব্যবস্থার প্রতিবাদে সভাগৃহ ত্যাগ করে যাওয়া। তাঁর জমিদারী সেরেস্তার এক কর্মচারী লিখেছেন

"At Shelaidaha a Durbar was arranged for him. He found that while chairs and benches was provided for the Hindus, Muslims were expected to sit on the floor. He was furious.

"Why this discrimination? Why were not the same seating arrangement made for everybody?" "This is the way it has always been, Babu Masai" he was told in reply. "Does your lordship wish to change this ancient custom? Administration will become difficult if you do."

Tagore made it known that he would take no part in such a Durbar. The same respect must be shown to all. In the end it was."

এ রবীন্দ্রনাথের মুসলিম প্রীতির নিদর্শন নয়, বরং তাঁর সুগভীর মনুষ্যত্ব প্রীতিরই। রবীন্দ্ররচনা ও জীবন-দর্শনের মূল সুরও এই। যে সুগভীর ও সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে সাহিত্যের উৎসারণ, এ দেশের বিচ্ছিন্ন সমাজ-বিন্যাসের ফলে মুসলমান জীবনের সে অভিজ্ঞতা লাভ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না সে যুগে।

তবুও তাঁর রচনায় এখানে ওখানে মুসলমান জীবন ও চরিত্রের যে ছোঁয়া লেগেছে তাতে কোথাও সামান্যতম অশ্রদ্ধার ভাব নেই। শাজাহান বা তাজমহলের মতো অবিস্মরণীয় কবিতা কোন ভাষায় কোন মুসলমান কবি লিখেছেন কিনা সন্দেহ। 'মুকুট'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে কবির জীবনীকারের একটি মন্তব্য "কর্তব্যপরায়ণ সেনাপতি ঈশা খাঁর চরিত্র খাঁটি মুসলমান-চরিত্র, জান ও জবান যাহার এক।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'সতী' নাটিকা আর গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত খসড়া গল্প 'মুসলমানীর গল্পে' তিনি যে সত্যনিষ্ঠা ও মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, তার কোন তুলনা নেই। সতী নাট্যকাহিনীটির বিস্তৃত আলোচনা শেষে কাজী আবদুল ওদুদ মন্তব্য করেছেন "এমন আন্তরিক পরধর্মপ্রীতি জগতের সাহিত্যে কমই রূপলাভ করেছে।"

মহাপ্রতিভা ও মহৎ কবি সম্বন্ধে এসব কথা ও খুঁটিনাটি তথ্য উদ্‌ঘাটন অনর্থক ও অবান্তর জেনেও তা করতে হলো স্রেফ দেশ ও সমাজের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখেই।

জীবনে এবং সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া মানবিক—তাই বিরুদ্ধ মানস-পরিবেশের মানুষও তাঁর রচনায় যথাযথ মর্যাদায় সমুন্নত ও সমৃদ্ধ। এ না হলে রবীন্দ্রনাথ কখনো রবীন্দ্রনাথ হতে পারতেন না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ

অমিতাভ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত কী ছিল? নিশ্চয়ই তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু অন্য আরও দশজন ব্রাহ্মের চেয়ে আলাদা। এই শতাব্দীর ত্রিশের দশকের গোড়ায় আদমসুমারির সময় রবীন্দ্রনাথ হিন্দু না ব্রাহ্ম, এই নিয়ে জোর তর্ক শুরু হলে তিনি স্পষ্টভাষায় এক বিবৃতি দেন তাঁর ধর্মমত নিয়ে। তিনি বলেছিলেন—"আমি হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত। আমার ধর্ম বিশ্বজনিনতা এবং সেটাই হিন্দু ধর্ম।"

রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেও এবং পৌত্তলিকতা বিসর্জন দিলেও সম্পূর্ণ অহিন্দু হয়ে যাননি। সেই পরিবারেরই ছেলে রবীন্দ্রনাথ, তবে ওঁরা ছিলেন পীরালি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। যশোরে থাকতে ওঁদের এক পূর্বপুরুষ পীর আলি খাঁ নামক এক জমিদারের বাড়িতে গোমাংসের রান্নার গন্ধ শোঁকার অপরাধে 'হাফ মুসলমান' হয়ে যান। অর্থাৎ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ওঁদের বলা হত পীরালি বামুন। এই ছাপ পড়ে ঠাকুরপরিবারের পোশাক ও আহারে। রবীন্দ্রনাথেরও যৌবনের পোশাকে সেই ছাপ আছে।

রবীন্দ্রনাথ আদি সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম হলেও তাঁর ধর্মমত নিয়ে সমস্যার অন্ত ছিল না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে একবার তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা উঠলে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মরা তাতে আপত্তি জানান। কিন্তু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও সুকুমার রায় প্রমুখ তরুণ ব্রাহ্মরা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দাঁড়ান এবং 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' বলে একটি পুস্তিকা বের করে এমন হুমকিও দেন যে, তাঁদের প্রস্তাব না মানলে তাঁরা ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে যাবেন। সবশেষে অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

মোট কথা, রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ছেড়ে শান্তিনিকেতন চলে যাওয়ার পর প্রচলিত ব্রাহ্মরীতির থেকে অনেক তফাত হয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি।

নতুন চিন্তাধারা অনেক ক্ষেত্রেই অনেক উদার হয়ে পড়ে। পরধর্ম সহিষ্ণুতা আরও প্রবলভাবে শান্তিনিকেতনের জীবনে এসে পড়ে। সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই, শান্তিনিকেতনের উপাসনাগৃহে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগুরুদের জীবন নিয়ে আলোচনা হয়েছে সঙ্গীত সহযোগে। বুদ্ধদেব সম্পর্কে তাঁর লেখা 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' এবং যীশুখ্রিষ্ট সম্পর্কে 'একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে'—গান দুটি তাঁদের জন্মদিনে মন্দিরে গাওয়া হত। গুরু নানকের জন্মদিনে 'গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে'ও গাইতে শুনেছি। শুধু তাই নয়, ফতেহাদোয়াজদহমে অর্থাৎ হজরত মহম্মদের জন্মদিনে মন্দিরের অনুষ্ঠান 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো' গানটিও গাওয়া হত। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ইরানের সুফিদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। লালন ফকির, সিরাজ সাঁই প্রমুখ সব সাধক-গাইয়েরা রবীন্দ্রনাথের অতি আপনজন ছিলেন।

এ তো গেল উৎসবের কথা, গানের কথা, আচারের কথা, কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রিস্ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সব রচনা রয়েছে, কিন্তু হজরত মহম্মদ সম্পর্কে তাঁর কোনও লেখা আছে কি? তাঁর প্রতি কবির অনুরাগ কতটা ছিল? কিংবা আদৌ ছিল কি? ব্রাহ্মসমাজের গিরীশচন্দ্র সেন প্রথম বাংলা ভাষায় কোরানের অনুবাদ করেন। সেই বই রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পড়েছিলেন। তবে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক থাকলেও পয়গম্বর মহম্মদ সম্পর্কে তাঁর কোনও লেখা আছে কি? আমরা এ'ও জানি, শান্তিনিকেতনের সর্বজনমান্য এবং রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক প্রমদারঞ্জন ঘোষমশাই পয়গম্বরের একজন একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ক্লাসে ছেলেমেয়েদের মহম্মদ সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন। তাছাড়া কবির পুত্রসম স্নেহভাজন সন্তোষ মজুমদার হজরত মহম্মদ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ রচনাও লিখেছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই তা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে কি হজরত সম্পর্কে কিছু লিখেছেন বা বলেছেন কোথাও?

হ্যাঁ, লিখেছেন, আমি তার তিনটি সাক্ষ্য পেয়েছি। কিন্তু সে বাণী হিসেবে, আসলে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত মহম্মদ সম্পর্কে লিখতে কিছু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তার কারণ লেখার কোথাও কোনপ্রকার স্খলন ঘটলে মুসলমান সমাজ তাঁকে ক্ষমা করত না। ইসলামের কঠোর অনুশাসনে তিনি সম্ভবত লেখার উৎসাহ পাননি। তবু তিনি অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনের কথা জানাতে পেরেছিলেন।

১৯৩৩ সালের ২৬ নভেম্বর বোম্বাইয়ে এক জনসভা হয়। উদ্দেশ্য 'পয়গম্বর দিবস' উদ্‌যাপন। এই দিবসের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি মির্জা আলি আকবর খাঁ। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী পাঠান। সেই বাণীটি সভায় পাঠ করেন সেকালের বিখ্যাত কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। বাণীটি হল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"জগতে যে সামান্য কয়েকটি মহান ধর্ম আছে, ইসলাম ধর্ম তাদেরই অন্যতম। মহান এই ধর্মমতের অনুগামীদের দায়িত্বও তাই বিপুল। ইসলামপন্থীদের মনে রাখা দরকার, ধর্মবিশ্বাসের মহত্ত্ব আর গভীরতা যেন তাঁদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ওপরও ছাপ রেখে যায়। আসলে, এই দুর্ভাগা দেশের অধিবাসী দুটি সম্প্রদায়ের বোঝাপড়া শুধু তো জাতীয় স্বার্থের সপ্রতিভ উপলব্ধির ওপর নির্ভর করে না; সত্যদ্রষ্টাদের বাণীনিঃসৃত শাশ্বত প্রেরণার ওপরও তার নির্ভরতা। সত্য ও শাশ্বতকে যাঁরা জেনেছেন ও জানিয়েছেন, তাঁরা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র। এবং মানুষকেও তাঁরা চিরকাল ভালবেসে এসেছেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি শুধু বাণীমাত্র নয়, তাতে ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্যকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। অনেক খুঁজে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদন থেকে এই বাণীটি উদ্ধার করতে পেরেছি। শুধু তাই নয়, হজরত মহম্মদ সম্পর্কে আর দুটি উল্লেখও পেয়েছি।

১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ আর একটি বাণী পাঠিয়ে হজরত মহম্মদের প্রতি তাঁর বিনম্র শ্রদ্ধা জানান। এই বাণী লেখার অনুরোধ আসে কলকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার স্যার আবদুল্লাহ্ সুহরওয়ার্দির কাছ থেকে। বাণীটি ২৫ জুন ফতেহাদোয়াজদহম, অর্থাৎ হজরত মহম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে বেতারে সম্প্রচারিত হয়। বাণীটি হল—

"ইসলাম পৃথিবীর মহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি। এই কারণে তার অনুবর্তিগণের দায়িত্ব অসীম, যেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের সাক্ষ্য দিতে হবে। ভারতে যে-সকল বিভিন্ন ধর্মসমাজ আছে, তাদের পরস্পরের প্রতি সভ্যজাতিযোগ্য মনোভাব যদি উদ্‌ভাবিত করতে হয়, তাহলে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা তা সম্ভব হবে না, আমাদের নির্ভর করতে হবে সেই অনুপ্রেরণার প্রতি, যা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ও মানবের বন্ধু সত্যদূতদের অমর জীবন থেকে চির-উৎসারিত। আজকের এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে একযোগে ইসলামের মহাঋষির উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি উপহার অর্পণ করে উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁর আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি।"

কবি এই বাণীর একটি ইংরেজি অনুবাদও পাঠান। তবু মনে হয় স্যার আবদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার এই কপিই বিলি করেছিলেন বাঙালী মুসলমান সমাজে। ইংরেজি বাণীটি আমি দেখিনি।

নয়াদিল্লীর জামা মসজিদ প্রকাশিত পয়গম্বর সংখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতন থেকে একটি শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান। সেই বার্তায় পয়গম্বর হজরত মহম্মদ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উক্তি আছে। সেই বার্তায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

~ www.amarboi.com ~

"যিনি বিশ্বের মহত্তমদের অন্যতম, সেই পবিত্র পয়গম্বর হজরত মহম্মদের উদ্দেশ্যে আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। মানুষের ইতিহাসে এক নতুন, সম্ভাবনাময় জীবনীশক্তির সঞ্চার করেছিলেন পয়গম্বর হজরত, এনেছিলেন নিখাদ, শুদ্ধ ধর্মাচরণের আদর্শ। সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, পবিত্র পয়গম্বরের প্রদর্শিত পথ যাঁরা অনুসরণ করছেন, আধুনিক ভারতবর্ষের সুসভ্য ইতিহাস রচনা করে তাঁরা যেন জীবন সম্পর্কে তাঁদের গভীর আস্থা এবং পয়গম্বরের প্রদত্ত শিক্ষাকে যথাযথ মর্যাদা দেন। তাঁরা যেন এমনভাবে ইতিহাসকে গড়ে তোলেন যাতে আমাদের জাতীয় জীবনে শান্তি ও পারস্পরিক শুভেচ্ছার বাতাবরণটি অটুট থেকে যায়।"

আপাতত এই তিনটি মাত্র ক্ষুদ্র রচনাই আমাদের সম্বল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ আর কোথাও হজরত মহম্মদ সম্পর্কে বলেছেন কিনা খুঁজে পাইনি। তবে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কী ছিল, তার বিবরণ নানা রচনায় নানাভাবে পাই, বিশেষ করে জমিদার হিসেবে বাংলার গ্রাম ও গ্রামবাসী সম্পর্কে তাঁর পরিচয় যখন ঘটল, তখনই তিনি মুসলমান সমাজের একনিষ্ঠতা ও কর্মক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হন। তবে তিনি তাঁদের দেখেছেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে—শুধু ধর্মীয় দিক থেকে নয়। বাংলার চাষীদের অধিকাংশই ধর্মমতে মুসলমান এবং তাঁদের প্রায় সবাই হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের কাছে নিপীড়িত—এই বোধটুকু রবীন্দ্রনাথের গোড়া থেকেই ছিল। সেই কারণেই তাঁর সঙ্গে বিরোধ বাধে স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দু মহাজনদের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ সালে জমিদারী হাতে নেওয়ার পর শিলাইদহ যখন গেলেন, তখনই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর সহানুভূতি কোন্ দিকে।

দুই

প্রথম জমিদার হয়ে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ আসেন পুণ্যাহ উৎসবে যোগ দিতে। বন্দুকের আওয়াজ, রোশনচৌকি, হুলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনিতে কাছারি মুখর। ত্রিশ বছরের নতুন বাবুমশাই কাছারিতে এলেন। ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদরে শান্ত সৌম্য মূর্তি। প্রথামত শুরুতে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের প্রার্থনা এবং পরে হিন্দুমতে পূজা। বাবুমশায়ের কপালে পুরোহিত পরিয়ে দিলেন চন্দনের তিলক।

কিন্তু হঠাৎ চিরাচরিত প্রথায় বিঘ্ন, রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত। তিনি আয়োজনস্থলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এভাবে পুণ্যাহ উৎসব চলবে না। পুণ্যাহ মিলনের দিন, বিভেদ ভোলার দিন। কিন্তু এই উৎসবের আয়োজনে দেখা যাচ্ছে বিপরীত ব্যবস্থা।' গোমস্তা নায়েবরা [illegible]। কী ব্যাপার? বাবুমশাই অসন্তুষ্ট কেন? সবিনয়ে জিজ্ঞাসা

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করতেই রবীন্দ্রনাথ জানালেন, আসনের ব্যবস্থায় জাতিভেদ ও ধর্মভেদ কেন? এ তিনি মানবেন না। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটালে এই পুণ্যাহ উৎসব হবে না।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল থেকে সম্ভ্রম, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম অনুযায়ী পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে থাকে বিভিন্ন আসনের বন্দোবস্ত। হিন্দুরা চাদরঢাকা সতরঞ্জির ওপর একধারে। তার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্থান আবার আলাদা। চাদর ছাড়া আলাদা সতরঞ্জির ওপর মুসলমান প্রজারা একেবারে অন্যধারে। সদর ও অন্য কাছারির কর্মচারীরাও নিজ পদমর্যাদামত বসেন আলাদা আলাদা আসনে। আর জমিদারবাবুর জন্যে মখমলমোড়া সিংহাসন।

বরণের পরই রবীন্দ্রনাথের ওই সিংহাসনে বসার কথা। কিন্তু তিনি বসলেন না। সদর নায়েবকে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন, 'নায়েবমশাই, এই উৎসবে এমন আলাদা আলাদা ব্যবস্থা কেন?' এই অভাবিত প্রশ্নে সদর নায়েব বলেন, 'বরাবরই তো এই নিয়ম চলে আসছে।'

রবীন্দ্রনাথ একটু ক্রুদ্ধ স্বরে বলেন, 'না, এই শুভ অনুষ্ঠানে এ জিনিস চলবে না। সব আসন তুলে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল—সবাইকে একই ধরনের আসনে বসার ব্যবস্থা করতে হবে।'

নায়েব প্রথার দাস। তিনি বলেন, 'এই আনুষ্ঠানিক দরবারে পুরনো রীতি বদলাবার অধিকার কারও নেই।'

রবীন্দ্রনাথ আরও রুষ্ট হয়ে জবাব দেন, 'আমি বলছি, এই পুরনো রীতি তুলে দিতেই হবে। এ রাজদরবার নয়, মিলনানুষ্ঠান।'

সদর নায়েবের সেই একই জবাব—'অসম্ভব। নিয়ম ভাঙা চলবে না।'

উপস্থিত সকলে বিস্মিত, স্তম্ভিত। রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন, আসনের জাতিভেদ তুলে না দিলে তিনি কিছুতেই বসবেন না। তিনি সদর নায়েবকে স্পষ্টভাষায় বলে দিলেন, 'প্রাচীন প্রথা আমি বুঝি না। সবার জন্যে একাসন করতে হবে। জমিদার হিসাবে এই আমার প্রথম হুকুম।'

জমিদারি সম্ভ্রম ও প্রাচীন প্রথায় আস্থাবান সদর নায়েব ও অন্যান্য হিন্দু আমলারা একসঙ্গে হঠাৎ ঘোষণা করে বসলেন, প্রথার পরিবর্তন ঘটালে তাঁরা একযোগে পদত্যাগ করবেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অবিচলিত। তিনি উপস্থিত প্রজামণ্ডলীকে বললেন, 'এই মিলন উৎসবে পরস্পরে ভে[illegible] করে [illegible] সম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়া চলবে না। আমার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রিয় প্রজারা, তোমরা সব আলাদা আসন আলাদা ব্যবস্থা—সব সরিয়ে দিয়ে একসঙ্গে বস। আমিও তোমাদের সঙ্গেই বসব। আমি তোমাদেরি লোক।'

অপমানিত নায়েব-গোমস্তার দল দেখলেন, রবীন্দ্রনাথের ডাকে হিন্দু-মুসলমান প্রজারা প্রকাণ্ড হলঘরের সব চাদর ও সব চেয়ার সরিয়ে দিয়ে ঢালাও ফরাশের ওপর বসে পড়লেন। মাঝখানে বসলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রজারা মুগ্ধ হয়ে দেখল তাদের নতুন বাবুমশাইকে।

আরও অবাক কাণ্ড, রবীন্দ্রনাথ সেদিনই তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে ঘোষণা করলেন, 'সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাতে হবে। এটাই আমার সর্বপ্রধান কাজ।'

'সাহা' বলতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোনও জাতি বা সম্প্রদায়কে বোঝাননি। শেখ বলতেও তা নয়। যেহেতু তাঁর জমিদারীতে অধিকাংশ মহাজনই সাহা সম্প্রদায়ের হিন্দু, সেই জন্যেই 'মহাজন' অর্থে তিনি 'সাহা' শব্দের ব্যবহার করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে অধিকাংশ প্রজাই দরিদ্র মুসলমান। তাই 'শেখ' বলতে তিনি ওই দরিদ্র প্রজাদেরই বুঝিয়েছেন। ওই দরিদ্র মুসলমান প্রজাদের জন্যে রবীন্দ্রনাথ কল্যাণমূলক 'যা যা' করেছেন, তা কোনও জমিদারই কল্পনা করতে পারেন না।

শিলাইদহে শেষবার তিনি যান ১৯২২ সালে। শিলাইদহ প্রজাবৃন্দের পক্ষে প্রার্থনা জানান, 'একান্ত অনুগত ক্ষুদ্র প্রজা শ্রীজেহেরালী বিশ্বাস, সাং চর কালোয়া'। তিনি বলেন, 'আজ আমাদের আনন্দের দিন... সমস্ত প্রকৃতি যেন আজ শতবেণুরবে গাইছে... ধন্য হয়েছি মোরা তব আগমনে।'

শিলাইদহের জমিদারি তখন চলে গেছে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে সুরেন্দ্রনাথের দখলে। সাজাদপুর গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্রদের এবং একমাত্র রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগণা রবীন্দ্রনাথের সম্পত্তি। কালীগ্রাম পরগণার পতিসরে সদর কাছারি। ১৯৩৭-এ তিনি শেষবার যান রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগণার সদর পতিসরে। সেখানকার শতকরা ৮০ জন প্রজাই মুসলমান ও চাষী। কাছারিতে সংবর্ধনা সভায় কালীগ্রাম পরগণার রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের পক্ষে মহঃ কফিলুদ্দিন আকন্দ রাতোয়াল 'সেই সভায়' মহামান্য দেশবরেণ্য দেবতুল্য জমিদার শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের পরগণায় শুভাগমন উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন এই বলে—'প্রভুরূপে হেথা আস নাই, তুমি/দেবরূপে এসে দিলে দেখা/দেবতার দান অক্ষয় হউক/হৃদিপটে থাক স্মৃতিরেখা।'

রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তরে বলেন, 'তোমাদের কাছে অনেক পেয়েছি, কিন্তু কিছু দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবির কথা শুনে একজন বৃদ্ধ মুসলমান শ্রদ্ধা সেলাম করে বললেন, 'আমরা তো হুজুর বুড়ো হয়েছি, আমরাও চলতি পথে। বড়ই দুঃখ হয় প্রজা-মনিবের এমন সম্বন্ধের ধারা বুঝি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়।' রবীন্দ্রনাথও বিচলিত। তিনি বললেন, 'তোমরা আমার বড় আপনজন, তোমরা সুখে থাকো। তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারিনি। ইচ্ছা ছিল মান সম্মান সম্ভ্রম সব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের মতই সহজ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেব। কী করে বাঁচতে হবে তোমাদের সঙ্গে মিলেমিশে সেই সাধনা করব। কিন্তু আমার এই বয়েসে তা' হবার নয়। আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। এই নিয়ে দুঃখ করে কী করব? তোমাদের সবার উন্নতি হোক—এই কামনা নিয়ে আমি পরলোকে চলে যাব।'

তিন

মুসলমান সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কতটা সহানুভূতিশীল ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রধানত 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে।

'গোরা' উপন্যাসে নায়ক সত্যিকার গ্রাম দেখতে যখন বেরলেন, তখন দেখতে পেলেন মুসলমানরা দরিদ্র, কতটা নিপীড়িত।

এক জায়গায় আছে—'ভদ্র সমাজ শিক্ষিত সমাজ ও কলিকাতা সমাজের বাইরে আমাদের দেশটা যে কী রূপ, গোরা তাহা এই প্রথম দেখিল। এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সঙ্কীর্ণ, কত দুর্বল—সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন—প্রত্যেক পাঁচ-সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত—পৃথিবীর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত—তুচ্ছতাকে যে সে কতই বড় করিয়া জানে এবং সংস্কারমাত্রেই যে তাদের কাছে কিরূপ নিশ্চলভাবে কঠিন—তাহার মন যে কতই সুপ্ত, প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ—তাহা গোরা গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন করিয়া বাস না করিলে কোনোমতেই কল্পনা করিতে পারিত না।'

গোরা গ্রাম ভ্রমণে বের হয়ে দেখল, একটি গ্রামে বৃদ্ধ নাপিত ও তার স্ত্রী একটি মুসলমানের ছেলেকে পালন করছে। ছেলেটির বাবা ফরু সর্দার লাঠিয়াল। নীলকুঠির সাহেব ম্যানেজার প্রজার ধান লুট করার সময় ফরু লাঠির ঘায়ে সাহেবদের হাত ভেঙে দেয়। সে হাজতে যাওয়ার পর, তার বালকপুত্র তমিজকে তার গ্রাম সম্পর্কের মাসি আশ্রয় দেয়। এই ঘটনা সম্পর্কেই গোরার অভিজ্ঞতা হল—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কি ভয়ঙ্কর অধর্ম করিতেছি? উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে, তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে, আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানদের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে? যাই হোক, এই আচার-বিচারের ভালমন্দর কথা পরে ভাবিব, কিন্তু এখন তো পারিলাম না।"

'গোরা' উপন্যাসের শেষদিকে, নিজের জাত ও নিজের ধর্ম সম্পর্কে গোরার মোহভঙ্গ হল। সে বলল, 'আমার কথা কি আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন? আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম, অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান কোনও সমাজের কোনও বিরোধ নেই।'

নিখিলেশ সমদর্শী জমিদার। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। এই নিখিলেশের আচার আচরণে জমিদার রবীন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। নিখিলেশ বলছেন—

'এদেশে মহিষও দুধ দেয়, মহিষেও চাষ করে। কিন্তু তার কাটামুণ্ডু মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই, তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসে। কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয়, তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।'

নিখিলেশের আত্মকথায় আমরা আরও পাচ্ছি মুসলমান সম্পর্কে তাঁর মতামত। নিখিলেশ আসলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই। জমিদার হিসেবে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় নিখিলেশের চরিত্রে।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের এক জায়গায় আছে—

আর একটু পরে এসে সব ঠিক করা যাবে, এই বলে বাইরে এসে দেখি সেখানে পুলিস ইনস্পেক্টর উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলুম, কিছু সন্ধান পেলেন?

সন্দেহ তো করছি।

কাকে?

ওই কাসেম সর্দারকে।

সে কি কথা! ওই তো [illegible] হয়েছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জখম কিছু নয়। পায়ের চামড়া থেঁতো হয়ে একটুখানি রক্ত পড়েছে। সে ওর নিজেরই কীর্তি।

কাসেমকে আমি কোনোমতেই সন্দেহ করতে পারিনে, ও বিশ্বাসী।

বিশ্বাসী সে কথা মানতে রাজি আছি, কিন্তু তাই বলেই যে চুরি করতে পারে না, তা বলা যায় না। এ'ও দেখেছি পঁচিশ বৎসর যে লোক বিশ্বাস রক্ষা করে আসছে, সে'ও একদিন হঠাৎ—

তা যদি হয়, আমি ওকে জেলে দিতে পারব না।

আপনি দেবেন কেন? যার হাতে দেবার ভার সেই দেবে।

কাসেম ছ' হাজার টাকা নিয়ে বাকি টাকাটা ফেলে রাখল কেন?

ওই ধোঁকাটা মনে জন্ম দেবার জন্যেই। আপনি যাই বলুন, লোকটা পাকা। ও আপনাদের কাছারিতে পাহারা দেয়, এদিকে কাছাকাছি এ অঞ্চলে যত চুরি ডাকাতি হয়েছে নিশ্চয় তার মূলে ও আছে।

লাঠিয়ালরা পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি সেরে এক রাত্রেই কেমন করে ফিরে এসে মনিবের কাছারিতে হাজিরা লেখাতে পারে, ইনস্পেক্টর তার অনেক দৃষ্টান্ত দেখালেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কাসেমকে এনেছেন?

তিনি বললেন, না, সে থানায় আছে, এখনই ডেপুটিবাবু তদন্ত করে আসবেন।

আমি বললুম, আমি তাকে দেখতে চাই।

কাসেমের সঙ্গে দেখা হবামাত্র সে আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে, খোদার কসম, মহারাজ, আমি এ কাজ করিনি।

আমি বললুম, কাসেম, আমি তোমাকে সন্দেহ করিনে, ভয় নেই তোমার। বিনা দোষে তোমার শাস্তি ঘটতে দেব না।

চার

'কালান্তর' গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সেইসব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদার দৃষ্টি ও সহনশীলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৯২২ সালে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লেখা প্রবন্ধ আকারে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মত। অর্থাৎ তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়—অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের ননভায়োলেন্ট নন-কোঅপারেশন। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরও কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার করে মুসলমানদের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়। হিন্দুর সে পথও সঙ্কীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফত উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু। সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারির কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের একপ্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মত মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু ও মুসলমানদের মত দুই জাত একত্র হয়েছে। ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল। আচারে মুসলমানদের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল।"

ওই একই বইয়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর মৃত্যু "শোকাবহ" বর্ণনা করেও বলেছেন—

"ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ—হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গলপ্রচেষ্টা সফল হবে, তাহলে বড়ই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতে পারে, কিন্তু ছাদ রক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়।"

১৯২৬ সালে দিল্লিতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে এক মুসলমান যুবক রিভলভার দিয়ে হত্যা করে। সেই হত্যাকাণ্ড সারাদেশে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ সবে ইউরোপ সফর সেরে শান্তিনিকেতনে ফিরেছেন। ফেরার পরই বহুলোক সেদিন রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য শোনার জন্যে উপস্থিত হন। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই সমদর্শী লোক, তবু স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মত পূজনীয় ব্যক্তির হত্যায় তিনিও ব্যথিত। তিনি সেদিন বলেন, "হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ভেদবুদ্ধি জেগেছে, তার জন্যে হিন্দুসমাজ মুখ্যত দায়ী কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। মুসলমান সমাজ ঈশ্বরের নামে সহধর্মীদের ডাক দিলে সব মুসলমান সাড়া দেয়, সমবেত হয়, প্রতিকারের জন্যে প্রাণ দেয়। কিন্তু হিন্দু যখন ডাকে—হিন্দু এসো—তখন কেউ আসে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৩১ সালে লেখা 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধের কারণগুলো বিশ্লেষণ করে বলেছেন,—"হিন্দু-মুসলমানে মন-কষাকষিকে অত্যন্ত বেশিদূর এগোতে দেওয়া শত্রুপক্ষের আনন্দবর্ধনের প্রধান উপায়।"

রবীন্দ্রনাথ একই প্রবন্ধে আরও বলেছেন,—"ধর্মমত ও সমাজরীতির সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, একথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও ভালরকম করে মেলা চাই।"

শান্তিনিকেতনে মুসলমান ছাত্রদের পড়াশোনা ও খাওয়াদাওয়ার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও উদারমনা ছিলেন। শান্তিনিকেতনে পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, একসঙ্গে থেকে, একসঙ্গে খেয়ে এবং একসঙ্গে পড়াশোনা করে আমার মনে, আমার কেন, কোনও ছাত্রেরই মনে সামান্য কোন ভেদাভেদ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে আরও স্পষ্টভাষায় বলেছেন—"শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কোনও প্রভেদ অনুভব করিনি এবং সখ্য ও স্নেহ সম্বন্ধ স্থাপনে লেশমাত্র বাধা ঘটেনি। যে সকল গ্রামের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ, তার মধ্যে মুসলমান-গ্রাম আছে। যখন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দূতসহযোগে কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে চলেছে, তখন বোলপুর অঞ্চলে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করা হয়েছিল যে, হিন্দুরা মসজিদ ভেঙে দেবার সঙ্কল্প করছে। এইসঙ্গে কলকাতা থেকে গুণ্ডার আমদানিও হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় মুসলমানদের শান্ত রাখতে আমাদের কোনও কষ্ট পেতে হয়নি। কেননা তারা নিশ্চিত জানত, আমরা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু।"

রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' গ্রন্থে 'হিন্দু-মুসলমান' নামক প্রবন্ধে আরও লিখেছেন—"আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোরবানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল, তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সঙ্গত মনে করিনি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা এমনভাবে যেন সম্পন্ন করা হয়, যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে, তারা তখনি তা মেনে নিলে। আমাদের এখানে এ পর্যন্ত কোনও উপদ্রব ঘটেনি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।"

মুসলমান সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কী ধারণা ছিল, তা স্পষ্ট করে জানা যায় তাঁর একটি মন্তব্যে। তিনি ১৯৩৩ সালে এম এ আজান ও পরে আলতাফ চৌধুরীকে কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "আমার স্বভাবে এবং ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নেই। দুই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সেরকম উপদ্রবকে সমস্ত দেশেরই অগৌরব মনে করে থাকি।" (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৬)

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইটহুড ফিরিয়ে দিলেন ইংরেজ সরকারের কাছে। ঠিক তারই পরে কংগ্রেসের যে বৈঠক বসে, তাতে সভাপতিত্ব করেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। সেই বৈঠকে অন্যান্য মান্যগণ্যদের মধ্যে ছিলেন জওহরলাল নেহরু ও মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। জিন্নাহ্ তখনও কংগ্রেসের পয়লা সারির নেতা।

অমল হোম সেই সময় লাহোর থেকে প্রকাশিত 'দি ট্রিবিউন' কাগজের সাংবাদিক। তিনিও সেদিন ওই বৈঠকের রিপোর্ট নিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জওহরলালকে অনুরোধ করেন, রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ নিয়ে যেন একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। অনেক পীড়াপীড়িতে জওহরলাল তাঁর বাবার কাছে একটি চিরকুট পাঠালেন। মোতিলাল চিরকুটটি পড়ে তাঁর চশমার খাপের নিচে চাপা দিয়ে রাখলেন। ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন সভাপতিমশাই কোন প্রস্তাব তুললেন না, তখন আবার জওহরলালকে দিয়ে আর একটি চিরকুট পাঠালেন অমল হোম, এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব তোলার জন্যে। মোতিলাল দ্বিতীয় চিরকুটটি পেয়ে আবার তাঁর চশমার খাপের নিচে চাপা দিলেন। সভা শেষ হয়ে গেল। প্রস্তাবটি আর উঠল না। জিন্নাহ্ সাহেব কাছে বসেই এই চিরকুট চালাচালি দেখছিলেন। তিনি সভার পর অমল হোমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছিল অমল?' অমল হোম ব্যাপারটা বলতেই জিন্নাহ্ রেগেমেগে বললেন, 'ওই জওহরলালকে দিয়ে চিরকুট পাঠিয়ে কী ভুলই না করেছ। আমাকে দিলে না কেন? আমি তাহলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তাবটা পাশ করাতাম।' অমল হোম পরে বলেছেন, 'জিন্নাহ্কে না বলে আমারই ভুল হয়েছিল।'

১৯২০ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রথম বার্ষিক স্মরণসভায় আবার আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য জিন্নাহ্ সাহেবকে বোম্বাইয়ে লিখে পাঠান। পাঞ্জাবের মিলিটারি শাসন ও হত্যালীলার বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষ ও নেতারা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ফলে সরকার একটি তদন্ত কমিটি বসান।

জিন্নাহ্ সাহেবের অনুরোধেই রবীন্দ্রনাথ ওই চিঠিটি পাঠান। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' তৃতীয় খণ্ডে জিন্নাহ্কে লেখা কবির দীর্ঘ চিঠির বাংলা অনুবাদ রয়েছে। কবি জিন্নাহ্কে লেখেন—"আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে পাঞ্জাবে একটি মহাপাপাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত এই পাপের এইরকম ভীষণ আকস্মিক প্রকাশ তাদের পশ্চাতে রেখে যায় আদর্শের

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভগ্নস্তূপের ও ভস্মাবশেষের আবর্জনা। চার বছর ধরে যে দানবীয় সংগ্রাম বিধাতার সৃষ্ট এই জগৎকে আগুনে দগ্ধ ও বিষে কলঙ্কিত করেছে, তারই আসুরিক ঔরস্য হল এই জালিয়ানওয়ালাবাগ।”

অতি দীর্ঘ পত্রের মাত্র প্রথম অনুচ্ছেদ এই অংশটি। অমল হোম মশাই একটি পুরানো ইংরেজি পত্রিকা থেকে কবির এই মূল্যবান ভাষণটি উদ্ধার করেন। ইংরেজি থেকে এই দীর্ঘ অমূল্য ভাষণটি বাংলায় অনুবাদ করেন অমল হোম নিজেই।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে বিশ্বভারতীর প্রথম মুসলমান ছাত্র সৈয়দ মুজতবা আলি। ১৯২০ সালে তিনি বিশ্বভারতী কোর্সে ভর্তি হন। সিলেটে ১৯১৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার আগে তিনি সরকারি স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন তুচ্ছ একটি কারণে। সেই বছরই রবীন্দ্রনাথ যান সিলেটে। সেখানে ‘আকাঙ্ক্ষা’ নাম দিয়ে একটি ভাষণ দেন ছাত্রদের উদ্দেশ করে। এই বক্তৃতা শুনে আলোড়িত হয় তাঁর মন। তিনি স্থির করেন বিশ্বভারতী কোর্সে পড়তে শান্তিনিকেতন যাবেন এবং গেলেনও। তখন ব্রিটিশ সরকারের অধীন স্কুল-কলেজের অন্তিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও শান্তিনিকেতনে আলাদা বিশ্বভারতী কোর্সে ভর্তি হওয়া যেত।

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী শান্তিনিকেতন যান। রবীন্দ্রনাথ তখন আশ্রমে ছিলেন না। সেই সময় একটি জরুরি পরামর্শের জন্যে সেকালের আলি-ভ্রাতাদের একজন সৌকত আলি শান্তিনিকেতনে যান। সেদিনই তিনি পরামর্শ সেরে চলে আসেন। কিন্তু দুপুরে তাঁর খাওয়া দাওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। তখনও কোনও অহিন্দু জেনারেল কিচেনে খাননি। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনিই সৌকত আলিকে কিচেনে নিয়ে খাওয়ান। সেই প্রথম শান্তিনিকেতনে একটি সনাতন রীতি ভাঙা হল। রবীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায়। দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ তাঁকে এক চিঠিতে এই প্রসঙ্গে লেখেন, 'So now in this kitchen we have no Brahmin lines, for no one cares a pin about it, at last.'

মজার ব্যাপার হল, শান্তিনিকেতনের কিচেনে জাতপাত তুলে দেওয়ার জন্যে কয়েকজন রক্ষণশীল হিন্দু অভিভাবক তাঁদের ছাত্রদের আশ্রম থেকে সরিয়ে নেন।

তারপর বহু মুসলমান ছাত্র ও অধ্যাপক একই কিচেনে খাওয়াদাওয়া করেছেন। চল্লিশের দশকে আমি যখন ছাত্র হয়ে শান্তিনিকেতনে যাই, তখন কলেজ হস্টেলে ছিলেন অনেক মুসলমান ছাত্র। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আশরাফ সিদ্দিকি, মুস্তাকিম চৌধুরী, সুলতান আলম, মকবুলার রহমান, শেখ সাজ্জাদ আলি, মহম্মদ মহসিন প্রমুখ বহু ছাত্র। একসঙ্গে ওঠাবসা, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া। কোনও তফাত আমরা বুঝিনি। এই রীতি চলছে আজও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক ছিলেন আদমউদ্দিন সাহেব। আরবীর অধ্যাপক। তিনি অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে একইসঙ্গে থাকতেন। তাছাড়া ছিলেন পাঞ্জাবের মৌলানা জিয়াউদ্দিন—যাঁর অকালমৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ 'নবজাতক' গ্রন্থে লেখেন সেই বিখ্যাত কবিতা, যার শেষ চার পঙক্তি হচ্ছে—

আকাশে আকাশে বাতাসে তাহারা
আমাদের চারিপাশে
তোমার বিরহ ছড়ায়ে চলেছে
সৌরভ নিঃশ্বাসে।

কোরানে-পুরাণে অনবরত বিবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সবসময় চিন্তিত ছিলেন। যখনই সুযোগ পেয়েছেন তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন সাহেবের 'হারামণি' বইটির ভূমিকায়ও রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা জোর গলায় বলেছেন। তিনি লেখেন—"আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন, তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনে নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন।... বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে, অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি।... এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়। বিবাদে বিরোধে বর্বরতা।"

১৯২৬ সালে বাংলার রাজনীতি ভাষা ও সাহিত্যে প্রবলভাবে প্রবেশ করে। মুসলমানদের মধ্যে একদল বললেন, উর্দুই তাঁদের জাতীয় ভাষা। রবীন্দ্রনাথ সিউড়ি শহরে প্রসঙ্গটি তুলে বলেন, "চীনে মুসলমানের সংখ্যা যথেষ্ট। কিন্তু সেখানে আজ পর্যন্ত কেউ এমন কথা বলেননি যে চীনা ভাষা না ছাড়লে তাঁদের মুসলমানত্ব খর্ব হবে।... হিন্দু মুসলমানকে যাঁরা কৃত্রিম বেড়া তুলে আলাদা রাখার চেষ্টা করছেন, তাঁরা মুসলমানেরও বন্ধু নন।"

ঠিক এই সময়ই কবি প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন—"হিন্দু মুসলমান সমস্যার কূল পাওয়া যায় না। লাঠালাঠির দ্বারা কোন জিনিসের সমাধান হয় না।" কয়েকদিন পরে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "আমরা নাকি ধর্মপ্রাণ জাতি। তাই তো আজ দেখছি, ধর্মের নামে পশুত্ব দেশজুড়ে বসেছে।"

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথের গল্প বা উপন্যাসে মুসলমান চরিত্র কমই এসেছে। তার কারণও আছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কয়েকজন মুসলমান বুদ্ধিজীবী প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওদের সমাজ নিয়ে কেন আরও গল্প উপন্যাস লেখেন না। শরৎচন্দ্র জবাবে বলেন, মহেশ গল্পে গফুর নামে একটি চরিত্র আছে বটে, কিন্তু আসল নায়ক মহেশই। তাছাড়া কোন সমাজ নিয়ে লিখতে গেলে তার ভাল-মন্দ—দুটো দিকই দেখাতে হয়। শুধু ভাল দেখালে চলে না। মুসলমান সমাজের কোন দিকের সমালোচনা করলে সেই সমাজের লোকেরা তাঁকে কখনও ক্ষমা করবে না।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অনেক প্রবন্ধে ও স্মৃতিচারণে মুসলমান সমাজের কথা বলেছেন। 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তাদের সম্বন্ধে যেসব শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল উক্তি আছে তার কারণ ধর্মীয় নয়, অর্থনৈতিক। তারা বঞ্চিত, তারা নিপীড়িত। সেই জন্যেই দরিদ্র মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

শুধু তাই নয়, গল্পগুচ্ছে 'সমস্যাপূরণ' নামে একটি অসাধারণ গল্পও আছে। আমার মতে 'সমস্যাপূরণ' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পের একটি। জমিদার কৃষ্ণগোপাল নিজের জমিদারি ছেলে বিপিনবিহারীর হাতে তুলে দিয়ে কাশী চলে গেলেন। ছেলে বাবার মত নয়। অন্যভাবে সে জমিদারি চালাতে চায়—"অনেক মকদ্দমা মামলা হাঙ্গামা করিয়া বিপিনবিহারী সমস্তই প্রায় মনের মত গুছাইয়া লইলেন। অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মির্জা বিবির পুত্র অছিমদ্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।"

বাগ না মানার কারণ আছে। সেটা বিপিনবিহারী জানতেন না, জানতেন অছিমদ্দির মা মির্জা বিবি। তিনি গিয়েছিলেন জমিদার বাড়িতে নিজের ছেলের জন্যে কাকুতি-মিনতি করতে—যেন মামলা না করেন জমিদারবাবু, যেন তাদের নিজস্ব জমিটুকু হাতছাড়া না হয়। নতুন জমিদার সে কথায় কান দেননি।

মামলার রায় যেদিন বের হওয়ার কথা, এবং বিপিনবিহারী জয় সম্পর্কে যেখানে স্থিরনিশ্চয়, সেদিন তাঁর বৃদ্ধ পিতা কাশী থেকে এসে জানালেন, "অছিমদ্দি তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।" বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "যবনীর গর্ভে?" কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "হ্যাঁ বাপু।"

'কাবুলিওয়ালা' গল্পের রহমৎ খাঁ চরিত্রটি সকলেরই জানা। বহুপঠিত 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিতে মুসলমান চরিত্র আছে। পরম মমতায় তাঁদের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর একটি গল্প আছে—'দালিয়া'। জুলিখা, আমিনা ইত্যাদি চরিত্র গল্পটিকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্প—'মুসলমানির গল্প'। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত 'ঋতুপত্র' নামক পত্রিকায়। গল্পটি খসড়া মাত্র। মাতৃপিতৃহীন কমলার বিয়ে হল। বিয়ের সময় ডাকাতের দল এসে

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁকে নিয়ে যায়। ডাকাতের সর্দার হাবিব খাঁর হাতে বন্দী বিয়ের কনে কমলা। হাবিব খাঁ বলেছে—"তুমি আমার কন্যা। তোমার কোনও ভয় নেই। এখন এই বিপদের জায়গা থেকে চল আমাদের ঘরে।" কমলা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। হাবিব বললে, "বুঝেছি তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে। মুসলমানের ঘরে যেতে সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে। আমার ঘরে তুমি হিন্দু বাড়ির মেয়ের মতই থাকবে।"

কমলা চলে যায় হাবিব খাঁর বাড়িতে। হাবিব খাঁ বলে, "তোমার মহলে আমার ছেলেরা কেউ আসবে না। এই বুড়ো ব্রাহ্মণকে নিয়ে তোমার পুজো-আর্চা চলতে পারবে।" কমলা তাদের কাছে যা পেল, তা সে নিজের বাড়িতে কোনদিন পেত না। তারপর যৌবনের আবেগ এল তার দেহে। বাড়ির একটি ছেলে আনাগোনা শুরু করল কমলার মহলে। তার সঙ্গে সে মনে মনে বাঁধা পড়ে গেল। সে হাবিব খাঁকে বলল, "বাবা, আমার ধর্ম নেই। আমি যাকে ভালবাসি, সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম।" কমলা আরও বলল, "যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, সেই ভালবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পুজো করি, তিনিই আমার দেবতা। তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি। আমার ধর্মকর্ম ওরই সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে। তাতে আমার আপত্তি হবে না। আমার না হয় দুই ধর্মই থাকল।"

ছয়

প্রধানত মুসলমান অধ্যুষিত দেশ ইরান ও ইরাকে আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইন্দোনেশিয়ার কথা অবশ্য আলাদা। ধর্মে মুসলমান হলেও ঐ দেশ সংস্কৃতিতে হিন্দুভাবাপন্ন। ১৯৩২ সালের ১১ এপ্রিল কবি ইরানের রাজার আমন্ত্রণে কে এল এম বিমানে তেহরান যাত্রা করেন, সেই দ্বিতীয় বার কবির বিমানযাত্রা। যোধপুর ও করাচি হয়ে তিনি বুশোয়ার শহরের জাঙ্ক বিমানক্ষেত্রে নামেন। ইরানের গবর্নর কবিকে অভ্যর্থনা জানান। বুশেয়ার থেকে সিরাজ। এই দীর্ঘপথের মাঝখানে খাজরুনের গবর্নরের প্রাসাদে কবির বিশ্রাম ও রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হয়। শিরাজ শহরে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সেদিন যে অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করা হয় তা ছিল মোটামুটি এইরকম—

শিরাজ শহর দুটি চিরজীবী মানুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁদের চিত্তের পরিমণ্ডল আপনার চিত্তের কাছাকাছি। যে উৎস থেকে আপনার বাণী উৎসারিত, সেই উৎসধারাতেই এখানকার দুই কবিজীবনের পুষ্পকানন অভিষিক্ত। যে সাদির দেহ

~ www.amarboi.com ~
এখানকার একটি পবিত্র ভূখণ্ডতলে বহু শতাব্দীকাল চিরবিশ্রামে শয়ান, তাঁর আত্মা আজ এই মুহূর্তে এই কাননের আকাশে ঊর্ধ্বে উত্থিত এবং এখন কবি হাফেজের পরিতৃপ্ত হাস্য তাঁর স্বদেশবাসীর আনন্দের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

এই সংবর্ধনার জবাবে কবি ইংরেজি ভাষায় তাঁর ছোট্ট ভাষণে বলেন—

যথোচিতভাবে আপনাদের সৌজন্যের প্রতিযোগিতা করি, এমন সম্ভাবনা নেই। কারণ আপনারা যে ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন, সে আপনাদের নিজের। আমার এই ভাষা ধার করা। জমার খাতায় আমার তরফে একটিমাত্র অঙ্ক উঠল, সে হচ্ছে এই যে, আমি সশরীরে এখানে উপস্থিত। বঙ্গাধিপতি একদা কবি হাফেজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি যেতে পারেননি। বাংলার কবি পারস্যাধীপের নিমন্ত্রণ পেলে, সে নিমন্ত্রণ রক্ষাও করলে এবং পারস্যকে তার প্রীতি ও শুভকামনা প্রত্যক্ষ জানিয়ে কৃতার্থ হল।

সেইদিনই শিরাজের গবর্নরের প্রাসাদভবনে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়। বিকেলে সাদির সমাধিপ্রাঙ্গণে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তার পরদিন কবি হাফেজের সমাধিমন্দির তিনি পরিদর্শন করেন। কবি বলেন—

আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।

ইরানের রাজা রেজা শাহ পহলবীর সঙ্গে রাজপ্রাসাদে কবির সাক্ষাৎ হয়। এমন রাজসম্মান কবি তার আগে কোথাও পাননি। ওই তেহরানেই সেবার পড়ে পঁচিশে বৈশাখ। অসাধারণ জাঁকজমকের সঙ্গে কবির জন্মোৎসব পালিত হয়। উৎসবের শেষে ইরানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে যে কবিতা পাঠ করেন কবি, তার প্রথম স্তবক হচ্ছে এই রকম—

ইরান তোমার যত বুলবুল,
তোমার কাননে বসন্তফুল
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে আনি
শুনালো তাহারে অভিনন্দনবাণী।

ইরান থেকে ইরাক। রাজা ফয়জলের আমন্ত্রণে তেহরান থেকে বাগদাদ থামা। সেখানে কবি ও সাহিত্যিকেরা সংবর্ধনা জানান এক বিশাল সভায়। তাতে কবি একটি ভাষণ দেন। রাজা ফয়জলও একদিন তাঁর বাগানবাড়িতে কবিকে আমন্ত্রণ জানান এবং দোভাষীর মারফত দুজনে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। তার মধ্যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটি ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার। কবি বলেন, "এই দ্বন্দ্ব-বিরোধ সাময়িক। অবস্থা স্বাভাবিক হলে আবার সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হবে।"

কবি আধুনিক তুরস্কের জনক কামাল পাশার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন অনেক জায়গায়। কামালের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব ও অন্যদিকে তুরস্কের মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অভিযান—এই দুটো দিকই কবিকে আকৃষ্ট করেছিল।

১৯৩৮ সালে তুরস্কের নায়ক কামাল পাশার মৃত্যুর খবর এলে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজকর্ম বন্ধ করে দেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮ নভেম্বর আয়োজিত এক শোকসভায় বলেন—"তিনি তুর্কিকে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়, তিনি তুর্কিকে তার আত্মনিহিত বিপন্নতা থেকে মুক্ত করেছেন। মুসলমান ধর্মের প্রচণ্ড আবর্ত-মধ্যে দাঁড়িয়ে ধর্মের অন্ধতাকে প্রবলভাবে তিনি অস্বীকার করেছেন।... বুদ্ধির গৌরবে অন্ধতাকে দমন করা তাঁর সবচেয়ে বড় মহত্ত্ব, বড় দৃষ্টান্ত।... তুর্কিকে স্বাধীন করেছেন বলে নয়, মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র দিয়েছেন বলেই কামালের অভাবে আজ সমগ্র এশিয়ার শোক।" তুরস্ক মুসলমান দেশ বলে নয়, সে আধুনিকতাকে আশ্রয় দিয়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসা।

ইরান ও ইরাক সফরের আগে রবীন্দ্রনাথ মিশর দেশে যান। সেখানে বেশ কয়েকদিন ছিলেন রাজকীয় সম্মানে। ১৯২৬ সালে ইউরোপ থেকে দেশে ফেরার পথে তিনি মিশর যান। আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে তিনি অতিথি হন বিখ্যাত কবি সোয়ারেসের। তারপর যান কায়রো। রেলগাড়িতে। সেদিন বিকেলেই আরবি কবি আহমদ সৌকির বাড়িতে ছিল চায়ের নেমন্তন্ন। সেখানে ওই দেশের রাষ্ট্রনায়করা উপস্থিত ছিলেন। বিকেল পাঁচটায় মিশরী পার্লামেন্ট বসার কথা। কিন্তু সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সম্মানে একঘণ্টা সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ ২৯ নভেম্বর দেখতে যান বিচিত্র শিল্পসম্ভারে সমৃদ্ধ কায়রোর জাদুঘর। 'পথে ও পথের প্রান্তে' নামক বইয়ে তিনি লিখেছেন—"এইসব কীর্তি দেখে মনে মনে ভাবি যে, বাইরে মানুষ সাড়ে তিন হাত, কিন্তু ভিতরে সে কত প্রকাণ্ড।" মিশরের রাজা ফুয়াদের সঙ্গেও কবির সাক্ষাৎ হয়। রাজা শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে প্রচুর মূল্যবান আরবি ও ফারসি বই উপহার দেন।

রবীন্দ্রনাথের ছিল আধুনিক মন, গান্ধীজীর সঙ্গে তাই সঙ্ঘাত হয়েছে বারবার। গান্ধীজীর মত 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম' বলে তিনি রোজ প্রার্থনাসভা করেননি, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু ভাবতে পেরেছিলেন এবং করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে লোকে জমিদার বলেই জানে, তবে তিনি অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক জমিদার

~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশে তখন আর কেউ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর জমিদারি পরিচালনার সময়টা ছিল অজ্ঞাতবাস। তাই ১৯২৮ সালে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে তিনি লিখছেন—"আমার সেই সময়কার অজ্ঞাতবাসের কথা কেহই ঠিকমত জানিবে না। তখন আমি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত ছিলাম বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। আজ আমি জনতার মধ্যে নিরাশ্রয়—আমার বাসা ভাঙিয়াছে।"

তা ভাঙুক, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই। তাঁর সেই 'অজ্ঞাতবাসের' কথা আমরা জানতাম না, এখন জেনেছি এবং আরও জেনেছি সেই সময়ে তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিলেন মুসলমান চাষীরা। আগেই বলেছি, অর্থনৈতিক কারণে এঁরা ছিলেন সবচেয়ে পিছিয়ে। সেই পিছিয়ে পড়া লোকদের কিছু ভাল করার জন্যেই তিনি পণ করেছিলেন। তাছাড়া ওই যে তিনি বলেছিলেন 'আমার ধর্ম বিশ্বজনিনতা', তার জন্যই তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখতে পেরেছিলেন, এবং সেখানেই অন্যদের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের জিৎ।

ভাবতে অবাক লাগে হজরত মহম্মদ ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে কথাগুলো তিনি বলেছিলেন, তা যেমন শ্রদ্ধাশীল, তেমনি তাঁর অনুগামীদের সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। সেই কারণেই হজরত মহম্মদের অনুগামী বাংলাদেশের ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেটের মুসলমান সমাজের অধিকাংশ লোক—বিশেষ করে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ রবীন্দ্রচর্চা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁরা পান একটি অসাম্প্রদায়িক চেহারা—যা মানবের মুক্তির গান গায়, সে 'গোরা' উপন্যাসের গোরা চরিত্রের মত বলতে পারেন—"আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান কোনও সমাজের কোন বিরোধ নেই।"

ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ নেমেছিলেন। পরে সরে গেলেও তিনি নিরাসক্ত ছিলেন না। হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা নিয়ে বারবার বিবৃতি দিয়েছেন এবং তাঁদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক করার কথাও বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশবিভাগ তাঁকে দেখতে হয়নি, তার আগেই তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। দেশবিভাগের পরেও স্থানে স্থানে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার কোনও দুঃসংবাদ তাঁকে পেতে হয়নি। শুধু তাই নয়, তাঁকে দেখতে হয়নি পতিসর, শিলাইদা ও সাজাদপুর সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অন্য দেশ হয়ে গেছে। তাঁর প্রিয় মুসলমান চাষীর বংশধরেরা আজ অন্য দেশের নাগরিক। এখন শিলাইদা বা পতিসর যেতে গেলে তাঁর দরকার পাসপোর্ট এবং ভিসা। তার আগে রবীন্দ্রনাথের বিদায় ভালই হয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমানসমাজ একটি ভূমিকা

আনিসুজ্জামান

কাজী আবদুল ওদুদের একটি প্রবন্ধে পড়েছি, মুসলমানের জন্যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কী করেছেন, এমন প্রশ্নের উত্তরে কাজী আনোয়ারুল কাদীর নাকি পালটা প্রশ্ন করেছিলেন, মুসলমানের জন্যে সূর্য বিশেষ কী করেছে? সূর্য আমাদের থেকে অনেক দূরে, রবীন্দ্রনাথ কাছাকাছি। সুতরাং কাজী আনোয়ারুল কাদিরের পালটা প্রশ্ন মূল প্রশ্ন-উত্থাপনকারীদের নিশ্চয় সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

পারেনি যে, তার প্রমাণ আমরা পাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মুসলমান সমাজে উত্থাপিত নানাবিধ অভিযোগ ও মন্তব্য থেকে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে; বলা হয়েছে, প্রতিবেশী সমাজের কোনো ছবি তাঁর সাহিত্যে নেই; যেটুকু আছে, তাও নিন্দাসূচক। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারলাভের পরে মাসিক *মোহাম্মদী* লিখেছিল যে, আরবি-ফারসির দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরাও *গীতাঞ্জলির* চেয়ে উন্নতমানের কবিতা রচনা করতে সমর্থ। রবীন্দ্রকাব্যের আরবি-ফারসি অনুবাদের সংবাদে তাঁরা ওসব সাহিত্যিকারদের ঔদার্যের পরিচয় পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যোৎকর্ষের সন্ধান লাভ করেননি।

কিন্তু একই মুসলমান সমাজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহীর অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত বহু বালবৃদ্ধবনিতার পত্র এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবিদের শ্রদ্ধার্ঘ, বিদ্বজ্জন ও সাধারণ মানুষের অভিনন্দন ও সম্মাননাজ্ঞাপন তারই পরিচয় বহন করে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রেও তাঁরা পিছিয়ে ছিলেন না। এক্‌রামউদ্দীনের *রবীন্দ্র-প্রতিভা* (এর প্রকাশকাল যে ১৯১৪, তাতে সন্দেহ নেই—আলী আহমদ-সংকলিত *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জীতে* (ঢাকা, ১৯৮৫) তার অভ্রান্ত প্রমাণ আছে) এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি *বিসর্জন* নাটকের রসোপলব্ধি। *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* গোলাম মোস্তফা 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ' নামে যে-প্রবন্ধ লেখেন, তাতে তিনি বলেন যে, শুধু *গীতাঞ্জলির* মধ্যেই

~ www.amarboi.com ~

ইসলামের মর্মবাণীর সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। এতে পত্রিকা-সম্পাদককে পত্র লিখে রবীন্দ্রনাথ সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদের রবীন্দ্র-সমালোচনাকে কবি নিজেই খুব উচ্চস্থান দিয়েছিলেন, সেকথাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

তবে সমালোচনার ব্যাপারে মুসলমানদের সহনশীলতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ ছিল। পাঠ্যবই ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সেকালে মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে যে-বাগ্‌বিতণ্ডা বিস্তারলাভ করেছিল, তাও রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করেছিল। ইউরোপীয় সাহিত্যের দৃষ্টান্ত টেনে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, অনেক সময়ে সাহিত্যে এমন কিছু কথা এসে যায় যা একটি সম্প্রদায়কে আঘাত করতে পারে, কিন্তু সে-কারণে যা সাহিত্যপদবাচ্য তার পঠনপাঠন বন্ধ হয় না (তিনি *ওথেলো* নাটকেরও উল্লেখ করেছিলেন)। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সম্প্রদায়-বৈরিতার উদাহরণ শোচনীয় মনে করলেও তেমন রচনা নির্বাসিত করার দাবি তিনি অযৌক্তিক ভেবেছিলেন। এই পটভূমিকায় বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের দাবি ও প্রবণতা তিনি অনুমোদনযোগ্য মনে করেননি। আরবি-ফারসি শব্দ, এবং পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক শব্দও, আমাদের সাহিত্যে যেমন স্বাভাবিকভাবে চলে এসেছে, তাতে তাঁর আপত্তি ছিল না—জসীমউদ্‌দীন ও বন্দে আলী মিয়ার গুণগ্রাহিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। কিন্তু অনেকটা স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা থেকে যখন অধিকতর আরবি-ফারসি শব্দপ্রয়োগের দাবি উঠল, তখন রবীন্দ্রনাথ তাতে আপত্তি জানালেন। ইংরেজির ক্ষেত্রে স্কটিশ বা ওয়েলশরা এমন দাবি করেনি, একথা তিনি একাধিকবার বলেছেন। মুসলমানদের নিত্যব্যবহার্য শব্দব্যবহারের দাবির মতো ইউরেশীয়রাও যদি বাংলা ভাষায় তাদের নিত্যব্যবহার্য শব্দপ্রয়োগের দাবি তোলে, তাহলে ভাষার চেহারা কেমন হবে, সেকথাও তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন। এই প্রসঙ্গেই 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহারে তাঁর আপত্তির কথা বলেছেন কবি, যদিও 'খুন-খারাবি'তে তাঁর আপত্তি নেই। আমরা জানি, 'খুন' সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য নজরুল ইসলামকে লক্ষ্য করে কথিত বলে নজরুল স্বয়ং মনে করেছিলেন, তবে কথাটা ঠিক নয়।

বঙ্গবিভাগের মতো ভাষাবিভাগের একটা আশঙ্কা তাঁর মনে কাজ করছিল প্রথম বঙ্গবিভাগের আগে পাঠ্যপুস্তকরচনা সম্পর্কে গৃহীত সরকারি একটি প্রয়াসের ফলে। তখন 'ভাষাবিচ্ছেদ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে তার প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। ভাষাবিচ্ছেদের ভয় তাঁর রয়ে গিয়েছিল।

রাজনৈতিক বিচ্ছেদকে আরো বেশি ভয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উনিশ শতকের শেষ দশকে জমিদারির কাজে পূর্ববঙ্গে এসে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর একধরনের পরিচয় হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথকে আমরা খুব সক্রিয় দেখতে পাই—তবে তা স্বল্পকালের জন্যে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হিন্দুমুসলমান বিভেদের বিষয়ে খুব অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কথা তিনি বলেছিলেন তাঁর প্রবন্ধে ও ভাষণে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের কালে হিন্দু-মুসলমান বৈরিতার প্রসঙ্গে নেতাদের লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, আমরা যে দেশের মুসলমানদের অথবা সাধারণ মানুষের যথার্থ হিতৈষী, তার পরিচয় আমরা দিইনি; সুতরাং আমাদের আকস্মিক হিতৈষিতায় যদি তারা সন্দেহ করে, তবে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। তিনি আরো বলেছিলেন যে, হিন্দুমুসলমান-সম্বন্ধের মধ্যে একটা পাপ আছে, অভ্যস্ত পাপের সম্পর্কে চেতনা থাকে না। হিন্দুত্বের গৌরববোধের প্রকাশ মুসলমানের মুসলমানিত্ব উশকে দিয়েছে, এমন কথাও তিনি বলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, ধর্মের দ্বারা মানবসমাজকে বিভক্ত করার প্রবৃত্তি দূর করতে না পারলে প্রকৃত মৈত্রী গড়ে উঠতে পারে না। পরস্পরকে জানার এবং মৈত্রীবন্ধনের কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে তিনি অনুরোধ করেছিলেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য, ধর্মীয় বিভাজনকে কেন্দ্র করে যে-রাজনীতি, শেষ পর্যন্ত সেটাই প্রবল হলো। ইংরেজ সরকারের কিছু কিছু ব্যবস্থাও তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গায় ইংরেজের ভেদ ও শাসননীতির কথা বলেছেন। সেইসঙ্গে এ-কথাও বলেছেন যে, হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ছিল বলেই ইংরেজের পক্ষে ভেদনীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হয়েছে। ব্যাপারটা এমন নয় যে, আমাদের মধ্যে কোনো বৈরিতা ছিল না, ইংরেজরাই তা সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছে। ১৯৩০ সালের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদ করার সময়েও এসব কথা তাঁর মনে ছিল। কিন্তু তাঁর এ-প্রতিবাদকে মুসলমান সমাজের অনেকে সহজে নিতে পারেনি, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের এ-ভূমিকা মুসলমানের স্বার্থবিরোধী বলে গণ্য হয়েছে।

এক্ষেত্রে পক্ষাবলম্বন করা নিয়ে তাঁর মনেও যে কিছুটা দ্বিধা ছিল, তাও জানা যায় তাঁর লেখা পত্র থেকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ

খোন্দকার সিরাজুল হক

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা ভাষার প্রধান সাহিত্যশিল্পী। তিনিই ভারতে এই পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাকে আঞ্চলিকতার গণ্ডী থেকে মুক্ত করে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। আজ এই ভাষাটি বাঙালি জাতির প্রধান গৌরবস্থল। কারণ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পথ বেয়েই পূর্ববঙ্গের বাঙালি সমাজ ১৯৭১ সালে 'বাংলাদেশ' নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র লাভ করেছে। আর মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখার বাসনা থেকেই ১৯৫২ সালের ঐ দিনটিকে অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারিকে জাতিসংঘ ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে আন্তর্জাতিক 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। এ থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাঙালি জাতির গৌরবের কেন্দ্র বাংলা ভাষা এবং এ ভাষারই প্রধান শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে, অন্যতম ধর্ম সম্প্রদায় মুসলমানদের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের কী ধরনের সম্পর্ক ছিল অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের মুসলমান সমাজকে কী চোখে দেখতেন এবং বাঙালি মুসলমান সমাজ রবীন্দ্রনাথের প্রতি কী মনোভাব পোষণ করতেন। প্রশ্নগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে স্থূল মনে হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীসমাজ বিভিন্নসময়ে এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশও দ্বিখণ্ডিত হয়। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত। সুতরাং এই দ্বিতীয় বঙ্গ বিভাগ সম্পর্কে তাঁর অভিমত আমাদের জানবার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশে সংঘটিত বেশ কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তা থেকেই বাঙ্গালি মুসলমানদের প্রতি তাঁর মনোভাব আর অস্পষ্ট থাকেনি। আলোচনার শুরুতেই আমরা জেনে নিই রবীন্দ্রনাথ ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ (স.) (৫৭০-

~ www.amarboi.com ~

৬৩২) প্রতি কি মনোভাব পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ ইসলাম ধর্ম ও হজরত মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে পাঁচটি মন্তব্য উদ্ধৃত করলেই এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(ক) রবীন্দ্রনাথ ১৯০৯ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে মৌখিক ভাষণ দিতেন। সেগুলো সমকালে সতের খণ্ডে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'শান্তিনিকেতন' শিরোনামে দু'খণ্ডে (১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে (৭ পৌষ ১৩১৬) এক মৌখিক ভাষণে বুদ্ধদেব (৫৬৭ খ্রি পূ.-৪৮৭ খ্রি. পূ.), যিশু খ্রিষ্ট (আনু. খ্রি. পূ. ৪-৩০ খ্রিস্টাব্দ ও হজরত মোহাম্মদ (দ.)-কে পৃথিবীর তিনজন প্রধান ধর্ম প্রবর্তক মহামানব হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রসঙ্গত হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে বলেছেন "মুহাম্মদকেও সেই কাজ করতে হয়েছিল। মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাকে তিনি অন্তরের দিকে, অখণ্ডের দিকে, অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেন নি; এর জন্যে সমস্তজীবন তাঁকে মৃত্যুসংকুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, চারিদিকের শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য তাকেই, স্পষ্ট অনুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যেই যাঁরা সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন তাঁদেরকেই প্রয়োজন হয়। মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিনজন মহাপুরুষ সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্মকে দেশগত জাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্যের আলোকের মতো, মেঘের বারি বর্ষণের মতো, সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁদের নাম করেছি। ধর্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে যে কোন বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। এই কথাটি তাঁরা সর্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিখে গেছেন।"[১]

(খ) ১৯৩৩ সালের ২৬ নভেম্বর তারিখে 'নবীদিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে বোম্বাইয়ে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। এ-সভায় মির্জা আলী আকবর খান সভাপতিত্ব করেন। 'নবীদিবস' উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত বাণীটি উক্ত সভায় পাঠ করেছিলেন সে কালের প্রখ্যাত কংগ্রেস-নেত্রী সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) "জগতে যে সামান্য কয়েকটি মহান ধর্ম আছে, ইসলাম ধর্ম তাদেরই অন্যতম। মহান এই ধর্মমতের অনুগামীদের দায়িত্ব তাই বিপুল। ইসলামপন্থীদের মনে রাখা দরকার, ধর্মবিশ্বাসের মহত্ত্ব আর গভীরতা যেন তাঁদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ওপরও ছাপ রেখে যায়। তাঁরা যেন এই দুর্ভাগা দেশের অধিবাসী দুটি

~ www.amarboi.com ~
সম্প্রদায়ের বোঝাপড়া শুধু তো জাতীয় স্বার্থের সপ্রতিভ উপলব্ধির উপর নির্ভর করেনা; সত্যদ্রষ্টাদের বাণী নিঃসৃত শাশ্বত প্রেরণার ওপরও তার নির্ভরতা। সত্য ও শাশ্বতকে যাঁরা জেনেছেন ও জানিয়েছেন, তারা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র। এবং মানুষকেও তাঁরা চিরকাল ভালবেসে এসেছেন।"[২]

(গ) ১৯৩৪ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন সফরসঙ্গী নিয়ে শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন। শ্রীলঙ্কায় অবস্থানকালে কলকাতার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার স্যার আবদুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দীর (১৮৭০-১৯৩৫) অনুরোধে; ফাতেহা দোয়াজদাহম' (হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস) উপলক্ষে একটি বাণী লিখে তাঁর কাছে পাঠান। বাণীটি ২৫ জুন তারিখে (১০ আষাঢ় ১৩৪১) কলকাতা বেতার থেকে সম্প্রচার করা হয়। উক্ত বাণীতে তিনি লিখেছিলেন ইসলাম পৃথিবীর মহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি। এই কারণে ইহার অনুবর্তীগণের দায়িত্ব অসীম, সেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। ভারতে যে সকল বিভিন্ন ধর্মসমাজ আছে তাহাদের পরস্পরের প্রতি সভ্যজাতিযোগ্য মনোভাব উদ্‌ভাবিত করতে হয় তবে কেবল মাত্র রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইবে না, তবে আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে সেই অনুপ্রেরণার প্রতি, যাহা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ও মানবের বন্ধু সত্যদূতদিগের অমর জীবন চির উৎসারিত। অদ্যকার এই পূণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে মস্লেম ভ্রাতাদের সহিত একযোগে ইসলামের মহাঋষির উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি উপহার অর্পণ করিয়া উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁহার আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি।"[৩]

(ঘ) দিল্লীর জামে মসজিদ থেকে প্রকাশিত 'দি পেশওয়া'-র 'নবী সংখ্যা'র জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে হজরত মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে একটি শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন।

"যিনি বিশ্বের মহোত্তমদের অন্যতম, সেই পবিত্র পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (স.)-এর উদ্দেশ্যে আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। মানুষের ইতিহাসে এক নতুন সম্ভাবনাময় জীবনী-শক্তির সঞ্চার করেছিলেন, পয়গম্বর হজরত এনেছিলেন নিখাদ শুদ্ধ ধর্মাচরণের আদর্শ। সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করি, পবিত্র পয়গম্বরের প্রদর্শিত পথ যাঁরা অনুসরণ করেছেন, আধুনিক ভারতবর্ষের সুসভ্য ইতিহাস রচনা করে তাঁরা যেন জীবন সম্পর্কে তাঁদের গভীর আস্থা এবং পয়গম্বরের প্রদত্ত শিক্ষাকে যথাযথ মর্যাদা দেন। তাঁরা যেন এমনভাবে ইতিহাস গড়ে তোলেন যাতে আমাদের জাতীয় জীবনে শান্তি ও পারস্পরিক শুভেচ্ছার বাতাবরণটি অটুট থেকে যায়।"[৪]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

(ঙ) রবীন্দ্রনাথের 'সমাজ' (১৯০৮) শীর্ষক প্রবন্ধ গ্রন্থের 'প্রাচ্যসমাজ' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাধনা' (পৌষ ১২৯৮) পত্রিকায়। প্রবন্ধটি "Nineteenth Centrury" পত্রিকায় (আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ১৮৯১) প্রকাশিত দুটি ইংরেজি রচনার প্রতিক্রিয়ায় রচিত। আগস্ট সংখ্যার লেখক ছিলেন তুরস্কবাসিনী ইংরেজ রমণী। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এই ইংরেজ তাঁর রচনায় সমাজে মুসলমান নারীদের শোচনীয় অবস্থার কথা বিবৃত করছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) পরবর্তী সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ১৮৯১) উক্ত প্রবন্ধের জবাব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র 'অগ্রহায়ণ ১২৯৮' সংখ্যায় ইংরেজ মহিলার রচনার একটি সার-সংক্ষেপ "মুসলমান মহিলা" শিরোনামে প্রকাশ করে 'সাধনা'র পরবর্তী সংখ্যার (পৌষ ১২৯৮) মুদ্রিত "প্রাচ্যসমাজ" প্রবন্ধে সৈয়দ আমির আলীর বক্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরে সমাজে মুসলমান নারীদের অবস্থান সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গত-এ প্রবন্ধে তিনি আরবীয় নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে হজরত মোহাম্মদ (স.)-এর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন।—

"এমন সময়ে মোহাম্মদের আবির্ভাব হইল। মর্ত্যলোকে স্বর্গরাজ্যের আগমন প্রচার করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্থূল বাধাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে-সময়ে আরব সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে বহুবিবাহ, দাসী সংসর্গ ও যথেচ্ছ স্ত্রী-পরিত্যাগের কোনো বাধা ছিল না; তিনি তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া স্ত্রী লোককে অপেক্ষাকৃত মান্য পদবীতে আরোপণ করিলেন। তিনি বারবার বলিয়াছেন, স্ত্রীবর্জন ঈশ্বরের চক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় কার্য। কিন্তু এ প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এই জন্য তিনি একেবারে নিষেধ না করিয়া অনেকগুলি গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিলেন"[৫]

কিন্তু সামাজিক মানুষের চারিত্রিক জাড্যের কারণে ধর্মপ্রবর্তকদের এই সংস্কারকর্ম পরবর্তীকালে বিবর্তন লাভ করতে পারি নি। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি মুসলমান সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উক্ত প্রবন্ধে এ-সম্পর্কে বলেছেন

একজন মহাপুরুষ প্রাচীন প্রথার খোলা ভাঙিয়া যে-নূতন সংস্কার আনয়ন করেন তাহাই আবার দেখিতে দেখিতে শক্ত হইয়া উঠিয়া আমাদিগকে রুদ্ধ করে। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া নিজের যত্নে নিজের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ আমাদের দ্বারা আর হইয়া উঠে না। মোহাম্মদ প্রাচীন আরব কুপ্রথা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়া তাহাদিগকে যেখানে দাঁড় করাইলেন, তাহারা সেখানেই দাঁড়াইল, আর নড়িল না। কোনো সংস্কার কার্য বীজের মতো ক্রমশ অঙ্কুরিত হইয়া যে পরিস্ফুটতা লাভ করিবে, আমাদের সমাজ সেরূপ জীবনপূর্ণ ক্ষেত্র নহে। মনুষ্যত্বের মধ্যে যেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রাণধর্মের অভাব। এইজন্য উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ না করিয়া বিশুদ্ধ আদর্শ ক্রমশই বিকৃতি লাভ করিতে থাকে। যেমন পাখি তা না দিলে ডিম পচিয়া যায়, সেইরূপ কালক্রমে মহাপুরুষের জীবন্ত প্রভাবের উত্তাপ যতই দূরবর্তী হয় ততই আবরণবদ্ধ সমাজের মধ্যে বিকৃতি জমিতে থাকে।"[৬]

দুই

বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসের 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত এবং 'শিবাজী উৎসব'কে কেন্দ্র করে একসময় বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমের আখ্যান রচনা করেছেন। কিন্তু এ উপন্যাসে মুসলমান রাজ্যের ধ্বংসের মধ্যদিয়ে হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গটি সমকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। আর মারাঠী বীর শিবাজী (১৬২৭-৮০)-র যে কীর্তি প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুসমাজে উদ্দীপ্ত করেছিল তা হচ্ছে—মোগল শক্তির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের প্রতি বিপ্লববাদীদের পক্ষপাতিত্বও সমকালের বাঙ্গালি মুসলমান সমাজকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করেছিল। এই সঙ্গীতের কোনো কোনো অংশ একেশ্বরবাদী মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনাকে যে আঘাত করে, একথা সেকালের জাতীয়তাবাদী হিন্দু রাজনীতিবিদরা বোঝার চেষ্টা করে নি। কিন্তু মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসুলভ মানবিক চেতনা থেকেই বিষয়টি গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এ-গানের কোনো কোনো অংশ বর্জন করার কথা বলেছিলেন। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (১৯৬৮) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন "আমার কৈশোরে বঙ্কিমকে খুব কাছে পেয়েছিলাম।" "বন্দে মাতরম" গানটায় আমিই সুর দিয়ে কংগ্রেসে গেয়েছিলাম। এখন কিন্তু মনে একটু সন্দেহ জেগেছে, ওটা কি জাতীয় সঙ্গীত হবার উপযুক্ত? আমাদের দেশে মুসলমানের সংখ্যা কম নয়, তারা দেশকে 'ত্বংই দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিনী' বলে সম্বোধন করবে কি করে?"[৭]

আর একারণেই রবীন্দ্রনাথ এই সংগীতের অংশবিশেষ করার ঘোষণা করলে সেকালের সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজ তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করেছিল। এ ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (১৯১০-৮৮) তাঁর 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ' (১৯৪৪) গ্রন্থে লিখেছেন "তাঁ[illegible] একদিন মাত্র আমি উত্তেজিত হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দেখেছিলাম এ সেই একদিনই। সর্বভারতীয় প্রয়োজনে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের শেষাংশ বর্জন অনুমোদন করেছিলেন তিনি, এই উপলক্ষে কোন কোন মহল তাঁর উদ্দেশ্যে কুৎসিত বিষোদ্গার করেছিলেন। এতেই হয়েছিলেন তিনি অতিশয় বিচলিত।"[৮] বাঙালি মুসলমান সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে এভাবেই রবীন্দ্রনাথ সমকালীন হিন্দুসমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

কি কুক্ষণেই যে রবীন্দ্রনাথ "শিবাজী-উৎসব" কবিতাটি রচনা করেছিলেন। এই একটি কবিতাই তাঁর অনেক অর্জনকে ম্লান করে দিয়েছিল। কোনো সমাজেই ক্ষুদ্রআত্মাসম্পন্ন সংকীর্ণ চেতা মানুষের অভাব নেই। বাঙালি মুসলমান সমাজেও এ ধরনের মানুষ যথেষ্ট আছে। এই ক্ষুদ্র আত্মার লোকজনই বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথকে মুসলমান সমাজের শত্রু প্রমাণ করার জন্য এই কবিতাটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে।—

"মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজী'।
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এ সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পুরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"[৯]

বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য এ-কবিতা রচনার পটভূমি তুলে ধরা প্রয়োজন। ১৮৯৭ সালের দিকে 'শিবাজী উৎসব' একটি জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। ১৯০৪ সাল পর্যন্ত ভারতের অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০)-এর 'শিবাজী-উৎসব আন্দোলন' মহারাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯০৪ সালের জুলাই মাসে (আষাঢ় ১৩১১) কলকাতার 'শিবাজী-উৎসব সমিতি' উদ্যমী মারাঠী যুবক সখারাম গনেশ দেউস্করের (১৮৬৯-১৯১২) 'শিবাজী-মহত্ত্ব' শিরোনামের বিশ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা মুদ্রিত করে বিনামূল্যে বিতরণ করে। এ বছরেই দেউস্কর "শিবাজীর দীক্ষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব পরিচিত এই মারাঠী যুবকের অনুরোধে ২৭ আগস্ট (১১ ভাদ্র ১৩১১) তারিখে ভূমিকা হিসেবে "শিবাজী-উৎসব" কবিতাটি লিখে দেন। "শিবাজীর দীক্ষা" ১৯০৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথের উক্ত ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। এর কয়েকদিন পরেই ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২৫) সভাপতিত্বে কলকাতায় পালিত হয় "শিবাজী-উৎসব"। এ-সভায় পুস্তিকাটি বিনামূল্যে বিতরণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করা হয়। এছাড়াও 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভারতী' (আশ্বিন ১৩১১) পত্রিকায় কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়।[১০] "শিবাজী-উৎসব" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ সখারাম গনেশ দেউস্করের অনুরোধে এবং "বৈদ্যুৎ তাড়নায়" লিখেছিলেন।[১১] কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, অনুরোধে 'ঢেকি গেলা' তাঁর উচিত হয় নি। কবিতাটি বাঙালি মুসলমান সমাজের অনুভূতিকে আঘাত করতে পারে। তাই তিনি কবিতাটি প্রকারান্তরে বর্জন করেন।[১২] 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫) বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন 'শিবাজী উৎসব' আন্দোলন হিন্দু জাতীয়তাবোধ হইতে উদ্ভুত। শিবাজী মহারাজ মুগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। সুতরাং শিবাজী সম্বন্ধে গৌরববোধ হিন্দুদের হওয়া সম্ভব, মুসলমানদের নহে। সুতরাং বিংশ শতাব্দীতে এই শ্রেণীর কোন বীরকে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা সম্ভব কিনা তৎসম্বন্ধে কালে দ্বিধাগ্রস্ত হন; এবং বোধহয় সে জন্যেই এই কবিতাটির দুর্বলতা কোন্‌খানে তাহা আবিষ্কার করিয়া উহাকে তাঁহার কাব্যগন্থে স্থান দেন নাই।"[১৩]

ফলত কবিতাটি বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্দ্ররচনাবলীতে সংকলিত হয়নি। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত শত বার্ষিক "রবীন্দ্ররচনাবলী"র তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে এবং "সঞ্চয়িতা" গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কোনো দুর্বল মুহূর্তে রচিত একটি কবিতা কখনো রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, এ বোধ প্রত্যেক মুক্তবুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন মানুষেরই থাকার কথা।

তিন

বাঙালি মুসলমানদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতিশীলতার প্রমাণ মেলে বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন অন্যান্য ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ায় প্রদত্ত ভাষণ ও লিখিত রচনায়।—

(ক) ১৯০৮ সালে 'প্রবাসী' (শ্রাবণ ১৩১৫)-তে প্রকাশিত "সদুপায়" শীর্ষক এক প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণ ব্যক্ত করে বলেছেন "কখনও যাহাদের মঙ্গল চিন্তা ও মঙ্গল চেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপনলোক বলিয়া কখনও কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি। ক্ষতি স্বীকার করাইবার বেলায় তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।... ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনোদিন দিই নাই। অতএব তাঁহারা আমাদের হিতৈষিতার সন্দেহ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া যাকে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া একজন খামকা আসিয়া দাঁড়াইলে যে অমনি তখনই যে তাঁহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতরো ঘটে না। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোক জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরিক আমাদের ব্যবহারে এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।"[১৪]

(খ) ১৯১১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ড. রাসবিহারী ঘোসের (১৮৪৫-১৯২১) সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলে 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য একটি জনসভা ডাকা হয়। এ সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতার কারণে উক্ত সভায় তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি। পরে 'প্রবাসী' (অগ্রহায়ণ ১৩১৮)-তে 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

বঙ্গভঙ্গের কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজ তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সময় থেকেই পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজে সমৃদ্ধির সূচনা হয়। এ-সমৃদ্ধিই তাদের স্বাতন্ত্র্যচেতনাকে ক্রমশ তীব্রতর করে তোলে। তারা প্রতিবেশী বাঙালি হিন্দুসমাজের অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের পশ্চাদপদতার তুলনা করে দ্বিগুণ উৎসাহে নিজেদের গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে মুসলমান সমাজের এই সচেতনতা স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। এবং একেই তিনি পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের প্রকৃত উপায় বলে মনে করেছেন। "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথে এই মানসিকতারই সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে।—

"আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। ধনী না হইলে দান করা কষ্টকর, মানুষ যখন আপনাকে বড় করে তখনি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে। যতদিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা ততদিনই তাহার ঈর্ষা ও বিরোধী। ততদিন যদি যে আর কাহারো সঙ্গে মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে তবে—সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোট বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ, বড় হইয়া আত্মবিসর্জন করাটাই শ্রেয়।

আধুনিককালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দুর চেয়ে বেশী দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিৎ। পদ-মান-শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।”[১৫]

চার

বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ কতটা আন্তরিক ছিল তার আরেকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে উদীয়মান কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ থেকে। নজরুলই বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রথম সাহিত্যশিল্পী যিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) অব্যবহিত পরেই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে নজরুলের আবির্ভাব ঘটে। করাচীর সেনা ছাউনীতে অবস্থানকালেই তাঁর “বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী” নামে একটি গদ্যরচনা ১৯১৯ সালের মে মাসে মাসিক ‘সওগাত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটিই নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা। কিন্তু ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশের মাধ্যমেই নজরুল সমগ্র বাঙালি সমাজে কবি স্বীকৃতি লাভ করেন। কমরেড মুজফ্ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) তাঁর স্মৃতিকথা’য় লিখেছেন “কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে পড়ে শোনানোর পরে তিনি নজরুলকে বুকে চেপে ধরেছিলেন।”[১৬]

“বিদ্রোহী” কবিতার রচনাকাল ১৩২৮ বঙ্গাব্দের পৌষমাস (ডিসেম্বর ১৯২১)। কবিতাটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২২ পৌষ তারিখে সাপ্তাহিক ‘বিজলী’ পত্রিকায়। মুজফ্ফর আহমদের ধারণা ‘বিজলী’ পত্রিকার মাধ্যমে কবিতাটি দেড়লক্ষ থেকে দুলক্ষ লোক পড়েছিলেন।[১৭] নজরুল এভাবেই স্বসম্প্রদায়ের গণ্ডীর সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতাকেও অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এতদিন বাঙালি লেখকের কাছে তেমন কোনো গুরুত্ব পায় নি। নজরুল তাঁর রচনায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকেও প্রাধান্য দিয়ে বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে এ সমস্যাগুলোকে তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন। এভাবে নজরুলই প্রথম জগত ও জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে বাংলা কবিতাকে একটি নতুন যুগে উত্তরণে সহায়তা করলেন। বিশ্বখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ উদীয়মান কবি নজরুলের প্রতিভার গুরুত্ব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে (কার্তিক ১৩২৯) নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নিবীণা’ প্রকাশিত হলে তিনি নজরুলের কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং তাঁকে যথার্থ স্বীকৃতি জানিয়ে ১৯২৩ সালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
প্রকাশিত তাঁর গীতিনাট্য 'বসন্ত' উৎসব করেন। রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন

শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম/স্নেহভাজনেষু/১০ ফাল্গুন/১৩২৯"।[১৮] এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স বাষট্টি এবং নজরুল চব্বিশ বছরের যুবক মাত্র। এ-ঘটনার কথা উল্লেখ করে নজরুল-সুহৃদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪) লিখেছেন "নজরুল তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ। আমি প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমার সঙ্গে নজরুলের নিয়মিত যোগাযোগের খবর নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছেছিল, নইলে মধুরামের গলির মেসে স্নেহভাজন বুলা মহলানবীশকে পাঠিয়ে আমাকে জোড়াসাঁকোয় নিতেন না গুরুদেব।" সেখানে অনুচর, তথা ভক্তজন পরিবৃত হয়ে কবিগুরু আসীন। আমাকে দেখে প্রথমে কুশল প্রশ্ন করে নজরুলের খবর জানতে চাইলেন... বললেন, জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি তাকেই উৎসর্গ করেছি। সেখানা নিজের হাতে তাকে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু আমি যখন নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারছিনা আমার হয়েই তুমি বইখানা ওকে দিও। কবি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বিদগ্ধ বাগবিন্যাসের যেমন মূল্য আছে, সহজ সরল তীব্র ও ঋজু বাক্যের মূল্যও কিছু কম নয়।... কে যেন দু কপি 'বসন্ত' এনে দিল কবির হাতে। তিনি একখানা নিজের নাম দস্তখত করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তাকে বলো, আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না করে। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর বলো কবিতা লেখা যেন কোনো কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা যোগাবার কবিও তো চাই।"[১৯]

নজরুলের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে কতটা স্নেহশীল ছিলেন তার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে কারাগারে বন্দী অবস্থায় অনশনরত নজরুলকে টেলিগ্রাফ পাঠানোর ঘটনা থেকে। নজরুল সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' বাংলা সাময়িকপত্র জগতের একটি স্মরণীয় পত্রিকা। এ-পত্রিকার প্রকাশলগ্নে নজরুল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী কামনা করেছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত আশীর্বাণী শিরে ধারণ করেই 'ধূমকেতু'র প্রকাশ ঘটেছিল ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট (২৬ শ্রাবণ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) তারিখে।

"কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।
২৪শে শ্রাবণ/১৩২৯

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"[২০]

প্রথম থেকে নজরুল 'ধূমকেতু' পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে তৎকালীন ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর ও দুঃসাহসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজ সরকারও নজরুলকে দণ্ডিত করে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীকে স্তব্ধ করে দেবার সুযোগ খুঁজেছিল। 'ধূমকেতুর' দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২) প্রকাশিত নজরুলের কবিতায় রচিত সম্পাদকীয় "আনন্দময়ীর আগমনে" এবং পঞ্চদশ সংখ্যায় (২০ অক্টোবর ১৯২২) প্রকাশিত লীলা মিত্রের "বিদ্রোহের কৈফিয়ত" শীর্ষক গদ্যরচনার জন্য সম্পাদক নজরুল এবং প্রকাশক আফজালুল হকের (১৮৯১-১৯৭০) নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়। নজরুল ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর তারিখে কুমিল্লায় গ্রেফতার হন এবং ১৯২৩ সালের জানুয়ারী তারিখে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রথমে নজরুলকে আলীপুর জেলে রাখা হয়। পরে ১৪ এপ্রিল তারিখে তাঁকে হুগলী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এই হুগলী জেলে অবস্থানকালেই নানা রকম অব্যবস্থা ও বর্বরোচিত আচরণের প্রতিবাদে কয়েকজন বন্দীসহ অনশন শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্রামের জন্য শিলং যাত্রা করেন, এর কয়েকদিন পরেই ২৬ এপ্রিল তারিখে।[২১] ১৫ মে তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে নজরুলের অনশন থেকে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রকাশিত হয়

"কাজী নজরুল ইসলাম, মৌলবি সিরাজউদ্দীন এবং গোপালচন্দ্র সেন প্রায় একমাস পূর্বে প্রায়োপবেশন করিতেছেন এবং অদ্যাপি সেই অবস্থায় আছেন।... কয়েকদিন পর গোপাল বাবুকে নাকের ভিতর দিয়ে খাওয়ানো হইয়াছিল; কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম কোনো খাদ্যই গ্রহণ করেন নাই। ২৪ এপ্রিল হইতে কাজী সাহেবের জ্বর হইতে আরম্ভ করে। এই জ্বর অবস্থায় এতদিন অনাহারে থাকিয়া তাঁহার শরীরের ওজন ১৩ সের কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে তাঁহার অবস্থা এতদূর খারাপ যে-কোন রূপ দুঃসংবাদ আসিতে পারে।" সম্ভবত এই খবর শিলঙে রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছেছিল। তিনি আর স্থির থাকতে পারেন নি। শিলং থেকে নজরুলকে টেলিগ্রাম

~ www.amarboi.com ~

করে অনশন ভঙ্গ করতে বলেন Give up hunger strike, Our literature claims you"[২২] ইংরেজি এই বাক্যটি থেকেই উপলব্ধি করতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে বাংলা সাহিত্যের জন্য কতটা অপরিহার্য জ্ঞান করতেন।

রবীন্দ্রনাথ-নজরুল এ-সম্পর্ক একমুখী ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যেমন অনুজ কবির প্রতি স্নেহধারা বর্ষণ করেছিলেন নজরুলও তেমনি অগ্রজ কবির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সারির গীতিকার নজরুল কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী ছিলেন। কিশোরকালের এই রবীন্দ্রভক্তির কথা নজরুল তাঁর একটি রচনায় নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করেছেন "...বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয় মন দিয়ে যেমন করে ভক্ত তার ইষ্টদেবতাকে পূজা করে। ছেলেবেলো থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধধূপ ফুল চন্দন দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এনিয়ে কত লোকে কত ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে। এমনকি আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্রবিদ্বেষী কোনো একজনের মাথার চাঁদিতে আজও অক্ষয় হয়ে লেখা আছে। এবং এই ভক্তির বিচারের ভার একদিন আদালতের ধর্মাধিকরণের ওপরেই পড়েছিল।"[২৩]

রবীন্দ্রনাথ যেমন স্নেহের নিদর্শন হিসেবে নজরুলকে 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছিলেন, তেমনি নজরুলও ১৯২৮ সালে তাঁর জনপ্রিয় কাব্যসংকলন 'সঞ্চিতা' রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। 'বিশ্বকবি সম্রাট/শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/শ্রী শ্রী চরণারবিন্দেষু'। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮) নজরুলের অন্তরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। কলকাতার বেতারকেন্দ্র ঐ দিন রবীন্দ্রনাথের অন্তিমযাত্রার ধারাবিবরণীর যেমন ব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনি নজরুলকে তাঁর রচিত শোক কবিতা পাঠেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে রচিত "রবি-হারা" শিরোনামের সেই কবিতায় নজরুলের গভীর বেদনার প্রকাশ ঘটেছে

> "বাঙালি ছাড়া কী হারাল বাঙালি কেহ বুঝিবেনা আর,
> বাংলা ছাড়া এ পৃথিবীতে এত উঠিবে না হাহাকার।
> মোদের আশার রবি চলে গেলে নিরাশা-আঁধার ফেলে,
> বাঙলার বুকে নিত্য তোমার শ্মশানের চিতা জ্বেলে।
> ভূ-ভারত জুড়ে হিংসা করেছে এই বাঙলার তরে—
> আকাশের রবি কেমনে আসিল বাঙলার কুঁড়ে-ঘরে।
> এত বড়, এত মহৎ বিশ্ববিজয়ী মহামানব
> বাঙলার দীনহীন আঙিনায় এত পরমোৎসব
> স্বপ্নেও আর পাইব কি মোরা? তাই আজি অসহায়
> বাঙলার নর-নারী, কবি-গুরু, সান্ত্বনা নাহি পায়।"[২৪]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেতারে কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে নজরুল অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। কবিতাটি শেষ করতে সহায়তা করেন তাঁর বন্ধু বিশিষ্ট সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫-৬৩)। রবীন্দ্র প্রয়াণ উপলক্ষে তাঁর রচিত একটি গানও একজন মহিলা শিল্পীর কণ্ঠসহযোগে কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল

"ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে, জাগায়ো না জাগায়ো না,
সারা জীবন যে আলো দিল, ডেকে তার ঘুম ভাঙায়ো না।
যে সহস্র করে রূপরস দিয়া,
জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া
তাঁহারে শান্তি-চন্দন দাও, ক্রন্দনে রাঙায়ো না।..."[২৫]

উল্লিখিত কবিতা ও গান ছাড়া নজরুল রবীন্দ্র প্রয়াণ উপলক্ষে "সালাম অস্ত রবি" শিরোনামে আরেকটি কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাটি 'মাসিক মোহাম্মদী'র 'ভাদ্র ১৩৪৮' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।—

"ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, খৈয়াম, হাফিজ ও রুমী
আরবের ইমরুল কায়েস যে ছিলে এক সাথে তুমি!
সকল দেশের সকল কালের সকল কবিরে ভাঙি
তাঁহাদের রূপেরসে রাঙাইয়া, বুঝি কত যুগজাগি
তোমারে রচিল রসিক বিধাতা, অপরূপ সে বিলাস,
এর রূপে গুণে ছিল যে পরম সুন্দরের আভাস।
এ সে রবির আলোকে তিমির-ভীত এ ভারতবাসী
ভুলেছিল পরাধীনতা-পীড়ন দুঃখ দৈন্যরাশি।
যেন ঊর্ধ্বের বরাভয় তুমি আল্লাহর রহমত,
নিত্য দিয়াছ মৃত এ জাতিরে অমৃত শরবত,
সকল দেশের সকল জাতির সকল লোকের তুমি
অর্ঘ্য আনিয়া ধন্য করিলে ভারত-বঙ্গভূমি।" [২৬]

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথের জীবনের আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করলেই মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর মনোভাবের স্বরূপটি আরো স্পষ্ট হবে। এর একটি ঘটে ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের তিরিশ বছর বয়সে, যখন তিনি জমিদার হিসেবে আসেন শিলাইদহে পুণ্যাহ-উৎসবে যোগ দিতে। শিলাইদহে এসেই আয়োজন স্থলে বিভিন্ন ধরনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আসনের ব্যবস্থা দেখে তিনি বিরক্ত হলেন। এ ঘটনার কথা উল্লেখ করে শিলাইদহের ঠাকুর এ স্টেটের দীর্ঘদিনের কর্মচারী শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী (১৮৯৭-১৯৭৯) তাঁর 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছেন "পুণ্যাহ-সভায় প্রজাদের সম্ভ্রম ও জাতিবর্ণ হিসেবে বিভিন্ন রকমে আসনের বন্দোবস্ত থাকত। হিন্দুরা একধারে তার মধ্যে ব্রাহ্মণের পৃথকভাবে, মুসলমানেরা অন্যধারে পৃথক পৃথকভাবে পৃথক আসনে, সম্ভ্রান্ত প্রজারা আর সদর ও মফস্বল কাছারির কর্মচারীরাও নিজ নিজ আধিপত্য ও পদমর্যাদা রক্ষা করে পৃথক পৃথক আসনে বসতেন। আচার্য, রাজপুরোহিত, গ্রহাচার্য, পুণ্যাহ-পাত্রদের জন্য পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট আসন থাকত।

সেবারে তরুণ জমিদার রবীন্দ্রনাথ প্রকাণ্ড পালকি থেকে নেমে বিরাট সমারোহ আর জয়ধ্বনির মধ্যে সুসজ্জিত পুণ্যাহ সভায় প্রবেশ করেই আসন গ্রহণ না করে স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভেলভেট-মোরা সিংহাসনের কাছেও গেলেন না। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে চারদিকে চাইতে লাগলেন। সভায় যে যার আসনে বসেছে। প্রকাণ্ড হলঘরখানা বহু লোকের সমাগমে গমগম করছে। সকলেই তাঁর বসবার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু কী আশ্চর্য কয়েক মিনিট চলে গেল তরুণ জমিদার বাবু সভায় না বসে চুপ করে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।... সদর নায়েব (তখন ম্যানেজারকে সদর নায়েব বলা হত) রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে এসে করজোড়ে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ এইবারে পুণ্যাহ-সভা থেকে মুখ ফিরিয়ে সদর নায়েব মশাইকে বললেন "নায়েব মশাই, ব্যাপার কি? পুণ্যাহ-সভায় এমনি হরেক রকম বসবার ব্যবস্থা কেন? মানুষের বসবার জন্য এত বিভিন্ন রকম আয়োজন কেন? রবীন্দ্রনাথের এই প্রশ্নে অবাক হয়ে সদর নায়েব বললেন, 'এখানে পুণ্যাহ আয়োজনে এরকম ব্যবস্থাই তো চিরকাল চলে আসছে। মহর্ষিদেবের আমল থেকে এই রকম প্রথাই চলে আসছে যে, আপনার জমিদারীর নায়েব, সদর ও মফস্বলের কর্মচারী, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, শূদ্র, চাষি, সদগোপ, চাঁড়াল—সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ প্রজা—এদের জাতি ও পদমর্যাদা হিসেবে বসবার ব্যবস্থা থাকবে। এই হচ্ছে এখানকার সভায় বসবার চির প্রচলিত প্রথা। নূতন কিছুই করা হয়নি।"[২৭] কিন্তু মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ নায়েবের এই কুযুক্তি মানতে রাজী নন। তিনি জানিয়ে দিলেন, উচ্চ-নীচ ও হিন্দু-মুসলমানের এই বিভেদ দূর না করলে তিনি এই পুণ্যাহ-অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন না। এবং কিছুটা উগ্রমূর্তি ধারণ করে বললেন, "সবার আসন এক করে দিন—এই আমার হুকুম।" কিছুক্ষণের মধ্যেই হলঘরের সমস্ত চেয়ার ও চৌকি অপসারণ করে সেখানে ফরাস পাতা হলো। রবীন্দ্রনাথ সে ফরাসের মাঝে বসলেন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর সকল প্রজা তাঁকে ঘিরে বসলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯২৬ সালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (১৮৫৫-১৯২৬) জনৈক সাম্প্রদায়িক মুসলমান আততায়ীর হাতে নিহত হলে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (মাঘ ১৩৩৩) 'প্রবাসী' পত্রিকায় "স্বামী শ্রদ্ধানন্দ" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি শিলাইদহে সংঘটিত এধরনের আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন "আমি যখন আমার জমিদারী সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানার জাজিম খানিকটা তুলে রেখেছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেম, 'কেন', তখন জবাব পেলেম, যে সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোষে বসতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেকদিন ধরে চলে এসছে। অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে। হিন্দুও মেনে এসেছে। জাজিম-তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম-পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তারপর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, 'আমরা ভাই', তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে। তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়। বাধা ঐ জাজিম-তোলা আসনে বহুদিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোটো নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বক্তৃতা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না।"[২৮]

এই বক্তব্যের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বুঝাতে চেয়েছেন যে, মুসলমান সমাজকে অবজ্ঞা করে কখনো হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব নয়। মুসলমান সমাজের প্রতি এই নির্দিষ্ট আচরণের কারণেই বঙ্গভঙ্গের সময়ে হিন্দু নেতারা তাদেরকে পাশে পায় নি।

প্রসঙ্গত আরেকটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। ১৯৩১ সালে 'কোরবানি' নিয়ে যখন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটে এবং নানা স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়, সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' (শ্রাবণ ১৩৩৮) পত্রিকায় 'হিন্দু-মুসলমান' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে কোরবানি সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, তাঁর সঙ্গে মুসলমান প্রজাদের সহজ ও সুন্দর সম্পর্ক থাকায় বিষয়টি নিয়ে কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় নি।

"আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোরবানি নিয়ে যখন দেশে একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করি নি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে, তারা তখনই তা মেনে নিলো। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সেখানে এ পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটেনি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান করণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।"[২৯]

ছয়

রবীন্দ্রনাথ একজন প্রতিভাবান বাঙালি হয়ে এবং দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বাস করেও তাঁর প্রতিবেশী মুসলমান সম্প্রদায়কে তাঁর সাহিত্যে যথাযথভাবে স্থান দেন নি—এ ধরনের অভিযোগ বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজ করছে। বলা যায়, বাঙালি মুসলমান সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হলেও এ অভিযোগ থেকে রবীন্দ্রনাথ আজো অব্যাহতি পান নি। মনে হয়, এ অভিযোগ থেকে রবীন্দ্রনাথকে মুক্ত করার তাগিদেই কিছু গবেষক 'রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলিম প্রসঙ্গ'—বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু এভাবে নঞর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এ বিতর্কের সুরাহা সম্ভব নয়। এ বিষয়ের আলোচনায় প্রথমেই বিচার্য—রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীতে আগমন ঘটেছিল উনিশ শতকের খ্যাতিমান ব্রাহ্মনেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) অন্যতম সন্তান হিসেবে। ব্রাহ্মপরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি হিন্দু ধর্ম ও ইসলামধর্মকে নিরাপদ দূরত্ব থেকে অবলোকন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণাটি 'চারিত্রপূজা' (১৯০৭) গ্রন্থের "মহাপুরুষ" শীর্ষক প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে "মহাপুরুষেরা ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া যান আর আমরা তাহার মধ্য হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্মটা লইনা। কারণ, বিধাতার বিধানে ধর্ম জিনিসটাকে নিজের স্বাধীন শক্তির দ্বারাই পাইতে হয়, অন্যের কাছ হইতে আরামে ভিক্ষা মাগিয়া পাইবার জো নাই। কোনো সত্য পদার্থই আমরা আর কাহারও কাছ হইতে কেবল হাত পাতিয়া চাহিয়া পাইতে পারিনা। যেখানে সহজ রাস্তা ধরিয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছি সেখানেই ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তেমন করিয়া যাহা পাইয়াছি তাহাতে আত্মার পেট ভরে নাই, কিন্তু আত্মার জাত গিয়াছে। তবে ধর্মসম্প্রদায় ব্যাপারটাকে আমরা কি চোখে দেখিব? তাহাকে এই বলিয়াই জানিতে হইবে যে, তাহা তৃষ্ণা মিটাইবার জল নহে, তাহা জল খাইবার পাত্র। সত্যকার তৃষ্ণা যাহার আছে সে জলের জন্যই ব্যাকুল হইয়া ফিরে, সে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে গণ্ডুষে করিয়াই পিপাসা নিবৃত্তি করে। কিন্তু যাহার পিপাসা নাই সে পাত্রটাকেই সবচেয়ে দামি বলিয়া জানে। সেই জন্যই জল কোথায় পড়িয়া থাকে তাহার ঠিক নাই, পাত্র লইয়াই পৃথিবীতে বিষম মারামারি লাগিয়া যায়। তখন যে ধর্ম বিষয়বুদ্ধির ফাঁস আলগা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল তাহা জগতে একটা নূতনতর বৈষয়িকতার সূক্ষ্মতর জাল সৃষ্টি করিয়া বসে; সে জাল কাটানো শক্ত।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অতএব শাস্ত্রীয় ধর্মমত ও আনুষ্ঠানিক ধর্মসমাজ স্থাপনের দিক হইতে পৃথিবীর ধর্মগুরুদিগকে দেখা তাঁহাদিগকে ছোটো করিয়া দেখা। এমন করিয়া কেবল দলের লোকেরাই দেখিতে পারে এবং তাহাতে করিয়া কেবল দলাদলিকেই বাড়াইয়া তোলা হয়। তাহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটি দেখিবার আছে যাহা লইয়া সকল দেশে সকল মানুষকেই আহবান করা যায়। যাহা প্রদীপমাত্র নহে, যাহা আলো।"[৩০]

উদ্ধৃত এই মন্তব্য থেকেই ধর্ম, ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মগুরু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

রবীন্দ্রনাথ সকল ধর্মের উর্ধ্বে মানবধর্ম ও হৃদয়ধর্মকে স্থান দিতেন। তাঁর এই মানসিকতার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ২০ কার্তিক তারিখে লিখিত কাব্যনাট্য 'সতী'তে।[৩১] 'সতী' একটি মারাঠি গাথা অবলম্বনে রচিত। বিনায়ক রাও-এর কন্যা অমাবাই-এর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল জীবাজি নামের এক হিন্দু যুবকের সঙ্গে। কিন্তু বিজাপুর রাজ্যের এক মুসলমান সভাসদ কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বিয়ের আসর থেকে অমাবাইকে হরণ করে নিয়ে যায় এবং বিয়ে করে। অমাবাই এই মুসলমান যুবকের কাছ থেকে স্ত্রীর যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করে এবং যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তানের জননী হয়। এভাবে অমাবাইকে অপহরণ করায় বিনায়করাও ও জীবাজি অপমানিত বোধ করে এবং সেই বিয়ের হোমাগ্নি স্পর্শ করে শপথ করে যে, সেই মুসলমান যুবককে হত্যা করে তারা এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে। একদিন সুযোগও এসে যায়। এক নৈশযুদ্ধে বিনায়ক রাও অমাবাই-এর স্বামীকে বধ করে। কিন্তু উক্ত যুদ্ধে জীবাজিও নিহত। এই যুদ্ধক্ষেত্রেই অমাবাই-এর সঙ্গে তার পিতা বিনায়ক রাও-এর দেখা হয়। আর এখানে 'সতী' নাটকের যবনিকার উন্মোচন ঘটে। পিতা বিনায়ক রাও-এর প্রতি কন্যা অমাবাই-এর উক্তি

> অন্যায় সমরে জিনি
> স্বহস্তে বধিলে তুমি পতিবে আমার,
> হায় পিতা, তবু তুমি পিতা!...
> তুমি পিতা, আমি কন্যা, বহুদিন পরে
> হয়েছে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-অঙ্গনে।
> দারুণ নিশীথে। পিতঃ প্রণামি চরণে
> পদধূলি তুলি শিরে লইব বিদায়।
> আজ যদি নাহি পারো ক্ষমিতে কন্যায়
> আমি তবে ভিক্ষা মাগি বিধাতার ক্ষমা
> [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বিনায়ক রাও কন্যাকে স্বামীর আবাসস্থল ও পুত্রকে ত্যাগ করে গঙ্গাতীরবর্তী তীর্থে অবস্থান করে গঙ্গাস্নান ও শিবনাম জপের মাধ্যমে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু অমাবাই মনে করে সে কোনো পাপ করে নি। তার স্বামী মুসলমান হলেও সে তার স্বামীরই প্রকৃত স্ত্রী, সেবাদাসী নয়।—

"তব ধর্ম-কাছে
পতিত হয়েছি, তবু মম ধর্ম আছে
সমুজ্জ্বল। পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী।
বরামাল্যে বরেছিনু তাঁরে ভালবাসি।
শ্রদ্ধাভরে; ধরেছিলো পতির সন্তান
গর্ভে মোর, বলে করি নাই আত্মদান।...
যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়।
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে।"

প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে অমাবাই-এর এই বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। কাহিনীর পরিণতিতে লক্ষ্য করি, অমাবাই-এর পিতা বিনায়ক রাও সন্তান স্নেহে আপ্লুত হয়ে ক্ষুদ্র সংস্কারধর্মকে উপেক্ষা করে বলতে বাধ্য হয়েছেন

"আয় বৎসে! বৃথা আচার বিচার।
পুত্রে লয়ে মোর সাথে আয় মোর মেয়ে
আমার আপন বন। সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন।"

ধর্ম সম্পর্কে বিনায়ক রাও-এর এই উপলব্ধিই প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথেরও উপলব্ধি। এধরনের মুক্তচিন্তার একজন সাহিত্যশিল্পী কখনোই কোনো বিশেষধর্ম ও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতসুলভ আচরণের পরিচয় দিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহুভঙ্গিম উল্লেখ আর্টের দাবী এসেছে, যেমন এসেছে মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) অমর সৃষ্টি 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১)-তে প্রাচীন ইসলামী সভ্যতাও সংস্কৃতির উল্লেখ। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এধরনের উল্লেখ বিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর জীবনঘনিষ্ঠতার কারণেই হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুললে লেখকের প্রতি অবিচারই করা হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) হিন্দুধর্মের প্রতি কোনো আকর্ষণ

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুভব না করেও এবং বাস্তব কারণে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েও আর্টের দাবি মেটাতেই তাঁর সাহিত্যকর্মে অবারিতভাবে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে ব্যবহার করেছেন। মাদ্রাজ প্রবাসকালে তিনি ইংরেজিতে 'রিজিয়া' নাট্যকাব্য লিখেছিলেন এবং বাংলা 'রিজিয়া' নাট্যকাব্য রচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা অসম্পূর্ণই থেকে যায়।[৩২] এমনকি কারবালার কাহিনীর ট্র্যাজিক উপাদানকে মহৎ শিল্প সৃষ্টির উপযোগী বলে বিশ্বাস করতেন।[৩৩] এসবই প্রতিভাবান শিল্পীমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য। এজন্য রবীন্দ্রনাথকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো চলে না। সম্ভবত এধরনের অভিযোগের কথা স্মরণ করেই প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও মননশীল লেখক কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে লিখিত "রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ" শিরোনামের প্রবন্ধে বলেছিলেন "রবীন্দ্রনাথের নিজের ভিতরে সত্যের জন্য এই যে সহজাত তৃষ্ণা ছিল এই জন্যই হিন্দু-মুসলমানের-খৃষ্টান সব সমাজেরই সত্যকার সত্যকার ধর্ম জিজ্ঞাসুদের তিনি পরম বন্ধু তা তিনি সেই সমস্ত ধর্মের বিশেষ আলোচনা ও অনুশীলন করুন আর নাই করুন। যে সমস্ত মুসলমান সমালোচক এই প্রশ্নের অবতারণা করেন—রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের জন্য কি করেছেন, তাঁদের নিজেদের প্রথমে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত মুসলমান কে, এবং কি সে চায়। যদি মুসলমানীর অর্থ এই হয় যে তা বিশেষ কতকগুলি অনড় মতবাদের সমষ্টি তবে সে মুসলমানীর জন্য রবীন্দ্রনাথ কিছুই করেন নি।... কিন্তু মুসলমানীর অর্থ যদি হয় সত্যপ্রীতি, কাণ্ডজ্ঞান-প্রীতি, জগৎপ্রীতি, ন্যায়ের সমর্থন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ, তবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় মুসলমান এ যুগে আর কেউ জন্মেছেন কিনা সে-কথা এই সব সমালোচকদের গভীর বিচার-বিশ্লেষণের বিষয় হওয়া উচিৎ।"[৩৪]

সাত

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের প্রধান সুর মানবতাবাদ। তাই বাংলাদেশের মুসলমান সমাজকেও তিনি সবসময় মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করেছেন, কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে আলাদা চোখে দেখেন নি। তিনি বাঙালী মুসলমান সমাজের পশ্চাদপদতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং সর্বদাই কামনা করেছেন তারা যেন হিন্দু সমাজের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, এটাই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রধান উপায়। মুসলমান সমাজের স্বাতন্ত্র্য চেতনার কারণও তিনি জীবন-সায়াহ্নে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সে কথা তাঁর বিভিন্ন রচনায় অকপটে ব্যক্ত করেছেন। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুসলমান সমাজের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সহজ ও হৃদ্যতাপূর্ণ।

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুতরাং মুসলমানদেরও উচিত সংশয়মুক্ত হয়ে সবধরনের অপপ্রচারের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই অনন্য সাধারণ শিল্পীকে আপন করে নেয়া এবং রবীন্দ্রসাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলা। বাঙালি জাতির পরম সৌভাগ্য, রবীন্দ্রনাথের মতো একজন অতি উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদেরই সমাজে। এই অনন্যসাধারণ প্রতিভার যথার্থ পরিচয় দিতে গিয়ে প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্য-সমালোচক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯০৩-৯৮) একদা (১৯৩৪) বলেছিলেন "রবীন্দ্রনাথ বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। শুধু বাংলাদেশের কেন, তিনি সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম। ১৯১৩ সালে সাহিত্য চর্চার প্রধান পুরস্কার নোবেল প্রাইজ পাইয়া তিনি বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উন্নীত করেন। ১৯০১ সালে নোবেল বৃত্তির স্থাপনা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। বৃত্তিধারীদের ইতিহাস যিনি লিখিয়াছেন, তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রেরণা সর্বাপেক্ষা সর্বজনীন ও প্রাদেশিকতা দোষ বিবর্জিত।"[৩৫]

বরেণ্য পণ্ডিত সুবোধ সেনগুপ্তের মন্তব্যটি স্মরণে রেখে বলা যায়, মানবতার ধর্ম ইসলামের অনুসারী বাঙ্গালি মুসলমান সমাজ রবীন্দ্রনাথের মতো বহুমাত্রিক শিল্পীর প্রতি কী আচরণ করবে, তা তারাই নির্ণয় করুক। রবীন্দ্রআলোকে জীবনকে আলোকিত করতে পারলে মনুষ্যজীবন অনেক ঐশ্বর্যময় ও মধুময় হয়ে ওঠে—এ-সত্যের উপলব্ধির জন্য বাংলাদেশের মুসলমান সমাজকে আরো অপেক্ষা করতে হবে।

তথ্যনির্দেশ :

১. "ভক্ত" 'শান্তিনিকেতন'—দ্বিতীয় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬, পৃ. ১০-১১

২. শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত। দ্রষ্টব্য, অমিতাভ চৌধুরী, 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ', কলিকাতা মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪০০, পৃ. ২-৩

৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী'—তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্বভারতী, ১৩৯৭, পৃ. ৫৪০-৪১

৪. শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত। দ্র. অমিতাভ চৌধুরী, 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

৫-৬. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' দ্বাদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা বিশ্বভারতী, ১৩৬৭, পৃ. ৪৫৮ ও ৪৬০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৭. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রস্মৃতি", গ্রন্থালয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৮৪, পৃ. ২৩

৮. 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ', ওরিয়েন্ট সংস্করণ, কলিকাতা ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৯৫৮, পরিশিষ্ট, পৃ. ১১৮

৯. 'সঞ্চয়িতা', পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা বিশ্বভারতী, ১৩৬২, পৃ. ৪৮০-৮১

১০. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী'—পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃ. ২০২-০৩

১১. ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১৩ ভাদ্র তারিখে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে দীনেশচন্দ্র সেনকে (১৮৬৬-১৯৩১) লিখেছিলেন "আজ দেউস্কর মহাশয়ের বৈদ্যত তাড়নায় শিবাজী উৎসব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইলাম। যদি সুবিধা পান তবে তাহার এক কপি শৈলেশের কাছ হইতে লইয়া দেখিবেন।"—'চিঠিপত্র' দশম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্বভারতী, ১৩৭৪, পৃ. ২৮

১২. কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ', কলিকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৩, পৃ. ১৭৬

১৩. 'রবীন্দ্রজীবনী'—দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৯৫, পৃ. ১৪৯

১৪. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'—অষ্টাদশ খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬১, পৃ. ৪৭৫

১৫. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'—দশম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৫, পৃ. ৪২৫-২৬

১৬. 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' তৃতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৯, পৃ. ২৪০

১৭. ঐ, পৃ. ২৪১

১৮. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'—পঞ্চদশ খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৭০, পৃ. ৩৩৯

১৯. 'কবি স্বীকৃতি' (১৩৭৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ), দ্র. অরুণকুমার বসু, 'নজরুল জীবনী', কলিকাতা পশ্চিম বাংলা আকাদেমিক, ২০০০, পৃ. ১০৩-০৪

২০. 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯

২১. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী'—নবম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮০৪, পৃ. ৪

২২. ঐ, পৃ. ৮

২৩. "বড়ই পিরীতি বালির বাঁধ" 'নজরুল-রচনাবলী'—চতুর্থ খণ্ড, নতুন সংস্করণ, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৪. "রবীন্দ্রহারা"—'নজরুল রচনাবলী'—তৃতীয় খণ্ড, নতুন সংস্করণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৫৪২-৪৩

২৫. 'বুলবুল'—দ্বিতীয় খণ্ড, 'নজরুল-রচনাবলী'—তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, ২৩০

২৬. 'নজরুল-রচনাবলী'—তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, ৪৪২

২৭. 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ', কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪, পৃ. ৩৩৯-৪১

২৮. রবীন্দ্র-রচনাবলী'—চতুর্বিংশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৫, পৃ. ৪৩৪

২৯. ঐ, পৃ. ৪৫১

৩০. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'—চতুর্থ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৪, পৃ. ৫৩৬-৩৭

৩১. 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'—পঞ্চম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৭০, পৃ. ৯৭-১০৬

৩২. ক্ষেত্র গুপ্ত, 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী', কলিকাতা : গ্রন্থনিলয়, ১৩৭০, পৃ. ১৯৪

৩৩. ঐ, পৃ. ১৫৩

৩৪. কাজী আবদুল ওদুদ, 'শাশ্বত বঙ্গ', কলিকাতা কাজী খুরশীদ বখত, ১৩৫৮, পৃ. ৬২

৩৫. 'রবীন্দ্রনাথ', তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, এস. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিমিটেড, ১৯৫২, পৃ. ১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ

আসাদ চৌধুরী

ক. মধুময় পৃথিবীর ধূলি

আমরা পরাধীন ছিলাম। পরাধীনতার গ্লানি এতটা প্রবল ছিল যে, কেহ সাহেব হত্যা করিলে আমরা মনে মনে খুশী হইতাম। ফ্রান্স কিম্বা জর্মন ইংরেজকে কসিয়া শিক্ষা দিলে বৈঠকখানার আড্ডার জন্য আরেক প্রস্থ চায়ের ব্যবস্থা করিতাম, এমনকি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব বা মোহনবাগান কোনক্রমে একটি গোল দিতে পারিলে ছাতি ভাঙ্গিয়া, জুতা উড়াইয়া, পার্শ্ববর্তী দর্শকের পৃষ্ঠে সজোরে আঘাত করিয়া সমস্ত শক্তি কণ্ঠে নিয়োগ করিয়া 'গো-অ-ল' বলিয়া গোল করিতাম এবং উল্লাস জ্ঞাপন করিতাম। এই সময় বিদেশে দিবার ধন ছিল উপনিষদ, বৌদ্ধধর্ম, তাজমহল, মোগল আর্ট অর্থাৎ যাহা আমাদের কালের এবং আমাদের মনীষার ফসল নয় অথবা পাট, চা, তুলা, এইসব অর্থাৎ যাহা আমাদের মস্তিষ্কের ফসলও নয়। সুতরাং সেই সময়ে একটি নেটিব ভাষায় রচিত কবিতাপুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ, আবার সায়েবের ভূমিকা সম্বলিত; ইউরোপের হৈ হৈ বাজারে নোবেল পুরস্কার পাইয়া বসিল—তখনো ঐ গোলের মতই নিজেরাও হৈ চৈ করিয়া লইলাম। তবে ছাতিও ভাঙ্গিল না, জুতাও হারাইতে হইল না। বলিলাম, 'না, টাগোর লিখেছে খাসা।' ঐ পর্যন্ত, পড়িয়াও দেখিলাম না, ঠাকুর, কি লিখিলেন!

তখন ইংরেজি রাষ্ট্রভাষার পূর্ণচন্দ্র, বর্তমানে 'আ-মরি বাংলা ভাষা' অর্ধচন্দ্রের সম্মান পাইতেছে। তখন পরাধীন ছিলাম—এখন, বলিয়া লাভ কি পাঠকই উত্তম জ্ঞাত। এখনও রবীন্দ্রনাথ পড়িতেছি না, কারণ... থাক আর সঙ্কোচ করিব না, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু বলিয়া, বোধকরি শুনিতে বড় ভাল লাগিতেছে না। আমরা হঠাৎ এমন কি এক মহান কারণে রবীন্দ্রনাথচর্চায় বিরত অথবা অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠি—তাহাও তলাইয়া দেখিতে হইবে। আমাদের কৃতজ্ঞতার অকৃজ্ঞতার প্রশ্ন উঠিতেছে না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে মধ্যযুগের অন্ধকার হইতে একালে আনিয়াছেন, সংগীত-

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাটকাদির আদর্শ এখনো রবীন্দ্রনাথ, নব শিল্পান্দোলনের তিনিই হোতা, রাজনীতি ও দর্শনের ব্যাপারে দামী দামী কথা বলিয়াছেন, তবু রবীন্দ্রনাথে ইসলামের কথাবার্তা খুঁজিতে হইবে (তিনি হিন্দু হইলেও মাফ করিব না), পাকিস্তানের কথাবার্তা আছে কিনা তাহাও বাহির করিতে হইবে (পাকিস্তান নাই বা হইল লাহোর রেজুলেশন তো হইয়া গিয়াছে)। ইহার পর যদি বা টিকিয়া গেল পাসপোর্ট-ভিসার দরকার হইবে না, ঠাকুর, আপনার টুপি, যাহা বিদেশে এবং স্বদেশে ব্যবহার করিতেন, খুশি হইয়া তাহাতে আতরও মাখিব।

কিন্তু এইসবও তো এক রাউণ্ড হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে ভারতের নয়, পূর্ব পাকিস্তানেরই পত্রিকা 'সমকাল'-এ এসব বিষয়ে বিচারক মিঃ এস.এম. মুরশেদ, বৈজ্ঞানিক কুদরাত-ই-খুদা, পণ্ডিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রচুর লিখিয়াছিলেন। আমরা অনেকেই পড়িয়াছি এবং পড়িয়া ভুলিয়া গিয়াছি। অথবা পড়ি নাই নিতান্ত অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়াই। যাঁহারা ভুলিয়া যাইতে সহজেই অভ্যস্ত এবং যাঁহারা পড়েনও নাই—তাঁহাদের জন্যই এই প্রবন্ধ—সংকলনও বলা যাইতে পারে, আর যাঁহারা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া পড়েন নাই—আমার অমৃত সমান কথা তাহাদের কানে পশিবে না—মরমে তো নাই-ই।

আততাগোর ফালসফাতুল হিন্দু?[১]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ব্রাহ্মসমাজকে প্রতিষ্ঠা করলেন। এই আপোসহীন একেশ্বরবাদী তীব্রভাবে মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেন। রবীন্দ্রনাথের একেশ্বরবাদও তাঁর পিতার পথই অনুসরণ করেছে। ঠাকুর পরিবার ও গোঁড়া হিন্দুসমাজের সম্পর্ক ছিল তীব্রভাবে পরস্পরবিরোধী। এই পরিবার (পীরালি পীর এবং আলী) অর্থাৎ হিন্দু সমাজবহির্ভূত ও মুসলমানদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে পরিচিত ছিল। সুফিবাদের ভাষায় পীর মানে হচ্ছে প্রধান ঋষি বা দরবেশ। প্রথমাবস্থায় কোন গোঁড়া ব্রাহ্মণ তাঁদের সাথে আহার বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত না এবং কার্যত তাঁদের মুসলমান বলে গণ্য করত।[২]

"(ঠাকুর)বাড়ীর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। আমি যখন প্রথম এ বাড়ী দেখতে যাই তখন দেখলাম সারা বাড়ী ঘিরে রয়েছে একটা নিষ্কলঙ্ক প্রাণময় শুভ্রতা। যেন ইন্দো-পারস্যের শিল্প গৌরব নিয়ে আযোধ্যার কোন ভূস্বামীর গৃহ শিল্পরুচির পূর্ণ উৎকর্ষতায় বিরাজমান।"[৩]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"সুফীবাদের শুচিস্নিগ্ধ প্রেমাবিষ্ট ভাবটিই এসেছিল ঠাকুরবাড়ীর সংস্কৃতিতে।...

"বৈষ্ণবধর্মের প্রেম ও ভক্তির আবিলতা, বা তথাকথিত রসের 'ঢলাঢলি' সম্বন্ধে ব্রাহ্মরা ছিলেন শুচিবায়ুগ্রস্ত। সুফীদের ঈশ্বরপ্রেম স্বভাবতই ব্রাহ্মদের কাছে বেশ রুচিসম্মত ঠেকেছিল রাধাকৃষ্ণ এবং আনুষঙ্গিক ভাবধারার তুলনায়।"[৪]

"পোশাক-পরিচ্ছদে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সাহেবীয়ানার চেয়ে নবাবীয়ানা বেশী ছিল। ফরাস বেলোয়াড়ি, ঝাড়লণ্ঠন আলবোলা, গোলাবপাশ... আজকের দিনে ঐ বেশবাস, ঐ ভাবে ওড়না অলঙ্কারের ব্যবহার কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।... কেশশয্যাও লক্ষ্য করার মত। সবচেয়ে চোখে পড়ে ঠাকুরবাড়ির বধূ ও কন্যাদের পায়ে জুতো।

"যে সঙ্গীত দরবারে মজলিশে সে যুগে বিলাসের আবর্ত সৃষ্টি করত এবং সাধারণের চোখে তাই দূষণীয় হয়ে উঠেছিল সেই সঙ্গীতকেই আবার ব্রহ্মনাম গানের উপযোগী করে নিয়েছিল ঠাকুরবাড়ির প্রতিভা।"[৫]

"অবনীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রচ্ছদ যেখানে তিনি সচেতনভাবে বাংলা অক্ষরকে আরবীরূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।"[৬]

সৌদামিনী দেবীর পিতৃস্মৃতিচারণ—পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে আছেন দেবেন্দ্রনাথ, হাতে ফুলের তোড়া—মাঝে মাঝে তাই শুঁকছেন এবং হাফিজের বয়েৎ আওড়াচ্ছেন আপন মনে।"[৭]

"পোশাক-পরিচ্ছদেও তিনি সাধারণ বাঙ্গালীত্বের ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাঁকে দেখলে মনে হ'ত এক জবরদস্ত মওলানা বলে।"[৮]

আরো উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব, কিন্তু অনাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত এবং ব্রাহ্মসমাজ বর্তমানে প্রায় হিন্দুসমাজই। কিন্তু একদা ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল চিন্তাধারা, বিশ্ব-সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গি অনেকেরই পছন্দ হইত না। লিবারেল শরৎচন্দ্র পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ক্ষয়িষ্ণুধারাকে আঘাত করিয়াছিলেন।[৯] বলিতেছিলাম যে, সমাজে ও যে পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ বাস করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব তাঁহার শিল্পে অনিবার্যভাবেই পড়িবে—কিন্তু... লক্ষণীয় যে, "ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে (১৮৯১-১৮৯৮) রচিত... গল্পগুলিতে মুসলিম চরিত্র কোথাও হীনমানের বা হীনমর্যাদার নয়, উনিশ শতকী হিন্দুজাতীয়তাবাদী লেখকদের মত হিন্দুগৌরব বৃদ্ধির অভিলাষে মুসলমানকে হীনবর্ণে চিত্রিত করার কোন প্রয়াস নেই রবীন্দ্র-মানসে।"[১০] এমন কি রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস পর্যালোচনায় দিলদরাজ, মুসলমান বাদশাহের প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব করিয়াছিলেন তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। "রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় চিন্তায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইসলামের সুফীবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। কিন্তু সবচাইতে বড় কথা ধর্ম অর্থে রবীন্দ্রনাথ নিষ্কলুষ মনুষ্যত্বকে বুঝতেন।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ ধর্মের অবিবেকী আচার-অনুষ্ঠানকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং উদ্যোগীদের 'বৃদ্ধশিশুদল' বলিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।[১২] বিসর্জিত প্রতিমা দেখিয়া বলিয়াছিলেন 'গেছে পাপ'।[১৩]

রবীন্দ্রনাথের যা ধর্মবোধ ও ধর্মের যা ধারণা তা ত কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত ভাবাবেগের দ্বারা লাভ হতে পারে না তাই ধর্মোন্মত্ততাকে কবি কখনো ধর্ম সাধনা বলে মনে করেননি। তাঁর ধর্ম তথা মনুষ্যত্বসচেতন সাধনার দ্বারাই লভ্য। তাঁর লক্ষ্য শান্তি কল্যাণ ও আনন্দ।[১৪] রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম ও সভ্যতা সমার্থক—

"The Sanskrit word dharma is the nearest synonym in our own language, that occurs to me, for the word civilization, In fact, we have no other word except perhaps some newly-coined one, lifeless and devoid of atmosphere. The specific meaning of dahrma is that principle which holds us firm together and lands us to our best welfare. The general meaning of this word is the essential faculty of a thing. ['Talks in China'.][১৫]

ইসলামের প্রধান ভূমিই হইল ফিৎরাৎ—বা স্বভাব-ধর্ম। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল সুরও কি তাহাই নহে?[১৬]

হে অতীত, তুমি কথা কও

"মুসলমানের আমলে হিন্দুসমাজের যে কোন ক্ষতি হয় নাই তাহার কারণ, সে আমলে ভারতবর্ষের আর্থিক পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের টাকা ভারতবর্ষেই থাকিত, বাহিরের দিকে তাহার টান না পড়াতে আমাদের অন্নের স্বচ্ছলতা ছিল।"[১৭]

"ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিলেন, তাহার পরে একটি কোম্পানী বসিয়াছিল, এখন একটি জাতি বসিয়াছে, আগে ছিল এক, এখন হইয়াছে আরেক।"[১৮]

"দিলদরাজ মোগল সম্রাটদের আমলে দিল্লীতে দরবার জমিত। আজ সে দিল নাই, সে দিল্লী নাই তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে।...

"পূর্বেকার দরবারে সম্রাটেরা যে নিজের প্রতাপ জাহির করিতেন তাহা নহে, সে সকল দরবার কাহারো কাছে তারস্বরে কিছু প্রমাণ করিবার জন্য ছিল না, তাহা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিক। সে সকল উৎসব বাদশাহ নবাবদের ঔদার্যের উদ্বেলিত প্রবাহস্বরূপ ছিল, সে প্রবাহ বদান্যতা বহন করিত, তাহাতে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিত, দীনের অভাব দূর হইত, তাহাতে আশা এবং আনন্দ দূর দূরান্তরে বিকীর্ণ হইয়া যাইত।

"তাই বলিতেছিলাম আগামী দিল্লীর দরবার পাশ্চাত্য অত্যুক্তি তাহা মেকি অত্যুক্তি। এদিকে হিসাবকিতাব এবং দোকানদারিটুকু আছে—ওদিকে প্রাচ্য সম্রাজের নকলটুকু না করিলে নয়।

"এই যে সম্রাটের প্রতিনিধি রাজাদিগকে (দেশীয় রাজ্যের সেলাম দিবার জন্য ডাকিয়াছেন ইনি নিজের দানের দ্বারা কোথায় দীঘি খনন করাইয়াছেন, কোথায় পান্থশালা নির্মাণ করিয়াছেন, কোথায় দেশের বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্পচর্চাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন? সেকালের বাদশারা নবাবরা রাজকর্মচারিগণও এই সকল মঙ্গলকার্যের দ্বারা প্রজাদের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ রাখিতেন।"[১৯]

"প্রথম শিক্ষাকালে ইংরেজদের গ্রন্থ আমরা বেদবাক্যস্বরূপ গ্রহণ করিতাম। তাহা আমাদিগকে যতই ব্যথিত করুক—তাহার যে প্রতিবাদ সম্ভবপর, তাহার যে প্রমাণ আলোচনা আমাদের আয়ত্তগত একথা আমাদের বিশ্বাস হইত না। নীরবে নতশিরে আপনাদের প্রতি ধিক্কার সহকারে সমস্ত লাঞ্ছনাকে সম্পূর্ণ সত্য জ্ঞানে বহন করিতে হইত।

"এ সব অবস্থায় আমাদের দেশের যে কোন কৃতী-গুণী-ক্ষমতাশালী লেখক এই মানসিক বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন—যিনি আমাদের অন্ধ অনুবৃত্তি হইতে মুক্তিলাভের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছেন তিনি আমাদের দেশের কৃতজ্ঞতাপাত্র।"[২০]

ভারতবর্ষে মুসলমান প্রবেশের অনতিপূর্বে খ্রিস্ট-শতাব্দীর আরম্ভকালে ভারত ইতিহাসে এক রোমাঞ্চকর মহাশূন্যতা দেখা যায়। দীর্ঘ দিবসের অবসানের পর একটা যেন চেতনাহীন সুষুপ্তির অন্ধকার সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল—সেটুকু সময়ের কোন জাগ্রত সাক্ষী, কোন প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া যায় না।

"এ দিকে অনতিপূর্বে ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বহুতর খণ্ডবিচ্ছিন্ন জাতি মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচণ্ড আকর্ষণবলে একীভূত হইয়া মুসলমান নামক এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। তাহারা যেন ভিন্ন ভিন্ন দুর্গম মরুময় গিরিশখরের উপরে খণ্ডতুষারের ন্যায় নিজের নিকট অপ্রবুদ্ধ এবং বাহিরের নিকটে অজ্ঞাত হইয়া বিরাজ করিতেছিল। কখনও প্রচণ্ড সূর্যের উদয় হইল এবং দেখিতে দেখিতে নানা শিকর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তুষার-স্রুত বন্যা একবার একত্রে স্ফীত হইয়া সহস্রধারায় জগৎকে চতুর্দিকে আক্রমণ করিতে বাহির হইল।"[২১]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর প্রতি এবং তাঁহার অনুসারীদের প্রতি যে শ্রদ্ধা কবির ভাষায় পুষ্পিত, তেমনটি কই বাংলা ভাষায় তো আর পড়ি নাই।[২২]

"কোন বিজিত জাতির লেখকের মধ্যে বিজেতা জাতির প্রতি এমনি উদার এবং শ্রদ্ধাশীল মনোভাব আর কোথাও দেখা গেছে বলে জানি না।"[২৩]

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আরো সন্নিবেশিত হইতে পারিত, কিন্তু 'আকলমন্দ রা ইশারা বস্ অস্ত্।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব ইংরেজের পলিটিক্যাল ফিলসফির কোটরে ঢোকে না। সেখানে রাষ্ট্র আছে, তাই স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি স্বদেশী সমাজের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে, তাঁর সমাজতত্ত্ব নিতান্তই অর্গ্যানিক, অধিকারসর্বস্ব নয় ত্যাগধর্ম। এই হিসেবে তিনি বহু স্বদেশী নেতার চেয়ে স্বদেশী—কারণ আমাদের সমাজটাই ঐ ধরনের—অতএব, তিনি ঢের বেশী রিয়ালিষ্টিক। লোকে তাঁকে যখন আদর্শবাদী বলে তখন তারা আইডিয়ালিষ্ট কথাটির অনুবাদই করে, তাঁর সম্বন্ধে সত্য ধারণার প্রমাণ দেয় না।

"আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে দুটি মারাত্মক দুর্বলতা এসেছিল—ভিক্ষাবৃত্তি ও আবেদন-নিবেদনের পালা এবং সর্বসাধারণের জীবন থেকে বিচ্যুতি, পলায়নও বলতে পারেন।...

"শিক্ষিত সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত হলেন—তাঁদের চেঁচামেচির নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে সামাজিক চিন্তা। বলাবাহুল্য এটা অবাস্তব, রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনের মতন। তবে এর কুফল বেশী—কারণ জনসাধারণকে বাদ দিয়ে তাদের তাগিদকে ব্যবহার না করে, সমাজসংস্কার করতে যাওয়ার অর্থই হল জীবনকে প্রত্যাখ্যান।[২৪]

এখন রবীন্দ্রনাথও এ সম্বন্ধে লিখতে শুরু করেই দুটি কথা বললেন—ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়ো এবং সমাজের সঙ্গে যুক্ত হও। অবশ্য তেমন সমাজ নয়, স্বদেশী সমাজ, পল্লীসমাজ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শাসিত সমাজ নয় সকল সৃষ্টির বীজ-ক্ষেত্র সমাজ। ভিক্ষাবৃত্তির ওপর তাঁর কষাঘাত এতই তীব্র যে তার জ্বলুনি কেবল মডারেটদের গায়েই ধরেনি, সরকারবাহাদুরেরও সর্বাঙ্গে লেগেছিল। আমাদের ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথকে সাহেবেরা extremist বলতেন। কিন্তু যারা তাঁর কর্মজীবন লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, শান্তিনিকেতনে বসবাস, জমিদারিতে সমবায় সমিতি, পাঠশালা-হাসপাতাল খোলা, পুকুর কাটানো, গাছ বসানো, পল্লীসংস্কার, শ্রীনকেতন স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্য, National Council of Education-এ যোগদান—তাঁর প্রত্যেকটি কাজের একটি গূঢ় অর্থ ছিল। সেটি হল এই—ভিক্ষার

ঝুলি ফেলে দেশ যেন নিজের পায়ে দাঁড়ায় ও জনগণের সমবেত শক্তি যেন জাগ্রত হয়, মিথ্যাভাব ত্যাগ করে কর্মীরা যেন প্রকৃত মাটির মানুষ হয়।[২৫]

রবীন্দ্রনাথ গণমানসকে[২৬] বুঝিতে চাহিয়াছিলেন গভীর গহ্বর হইতেই, উপর হইতে নয় এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই আমরা 'বঙ্গভঙ্গ' উপলক্ষে কিম্বা অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমান সম্পর্কে তাঁহার মূল্যবান মতামতগুলি পাইয়াছি। বলাবাহুল্য সে সময় মুহম্মদ আলী জিন্নাহ Forerunner of Hindu-Muslim Unity[২৭]—অন্যান্যের মুগ্ধতাবোধের কথা তো অবান্তরই। এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে আরেকটি কথা বলা আবশ্যক—তখন রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাহারা সমাজে সাধারণত ছিল শ্রমজীবী। খানসামা, আর্দালি, চাপরাশি, গাড়োয়ান-দরজি ইত্যাদি[২৮]—অথবা নবাবজাদা রইস—সাধারণ মধ্যবিত্ত মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁহার ধারণা থাকার কথা ছিল না। বিস্ময়ের ব্যাপার নিঃসন্দেহে মীর মশাররফ হোসেন, কিংবা কাজী নজরুল ইসলাম তৎকালীন মুসলিম লীগের আন্দোলনগুলির আশেপাশেও ছিলেন না। কাজীর হিন্দু স্ত্রীর কারণটি কোন কোন পণ্ডিত উল্লেখ করিতে পারেন, কিন্তু স্বতন্ত্রপন্থি লেখক ইসমাইল হোসেন সিরাজীও তো মুসলিম লীগ সম্পর্কে সম্প্রদায়কে বড় একটা কিছু বলিয়া গেলেন না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরই কাজী অসুস্থ হন। বলাবাহুল্য এঁরা সবাই সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখের কথাটি বলিয়াছিলেন এবং ইঁহারা সকলেই মুসলিম লীগের সবুজ পতাকা হইতে দূরেই ছিলেন। এঁদের পাণ্ডিত্যের তারিফ করিব না—কিন্তু যাঁহাদের পাণ্ডিত্যের তারিফ সকলেই করেন, সেই ব্যারিস্টার এ. রসুল মওলানা আকরাম খাঁ প্রচণ্ড রবীন্দ্র-বিরোধী (খাঁ সম্পাদিত ১৯৬১-র আজাদ পত্রিকা নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কময় সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন) ইঁহারা সকলেই সেদিন বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। আন্দোলনের নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী পড়িলে এই ধারণা আরো স্পষ্ট হইয়া উঠে। অথচ কল্যাণ ও সুন্দরের কবি—সত্যসন্ধ রবীন্দ্রনাথ জানিতেন জনগণের সংহতি বাধাপ্রাপ্ত, দুষ্ট ক্যানসারের মত সাম্প্রদায়িকতা স্বাধীনতা সংগ্রামকে বারবার বিপন্ন করিতেছে, এইটি দূর না হইলে স্বাধীনতাও অর্থহীন হইবে।[২৯]

রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য সেই সাম্প্রদায়িকতার গতিকে অস্বীকার করিয়া রাজনৈতিক দলগুলি যখন বিভিন্ন আন্দোলনে লিপ্ত তখন সাবধানী রবীন্দ্রনাথ এই দিকটির প্রতি বারংবার অঙ্গুলি সংকেত করিয়াছিলেন বলিয়া দেশবাসীর এবং স্ব-সম্প্রদায়ের যে খুব প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন বলা যায় না—তবে সেকালের শুভবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান সম্বলিত পূজনীয়দের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ১৯৬৭ পর্যন্ত পাক-ভারতে অনুষ্ঠিত অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলির [illegible] বীভৎস রূপ[৩০] উভয় দেশের সংখ্যালঘুর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নীরব আর্তনাদ এবং উপায়হীন উদ্বাস্তু সমস্যা আমাদের কাছে যতই পীড়াদায়ক হইতেছে ততই কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে রাজনীতি শিক্ষার আগ্রহ বাড়িতেছে। আবুল ফজল ঠিকই বলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম ও সভ্যতা সমার্থক। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলিয়াছিলেন, তিনি কবি এবং রজনীতিবিদ। ১৯০০ হইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত পাক-ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির ইতিহাসে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিগত সেপ্টেম্বর (১৯৬৫) যুদ্ধের অন্য কারণ জানি না কেননা তাহার একদিকের বক্তব্য আমাদের কাছে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। সত্য ইতিহাস যাহাই হোক, উহা যে আমাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সহিত জড়িত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

শান্তির ললিত বাণী

"আমাদের আরেকটি প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যতঃ আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমা নির্দেশ করছে। সে ধর্মই তাদের মানব-বিশ্বকে সাদা-কালো ছক কেটে দুই সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করছে—" 'আত্ম ও পর'।[৩১]

"ধর্মমত সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয় বিরোধ পর্যন্ত আছে—একথা মানতেই হবে।... আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানদের ত্রুটি বিচারটা থাক—আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্য যেন লজ্জা স্বীকার করি।"[৩২]

"এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক-পারসিক-শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো সে হিন্দু যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দু যুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ—এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল।"[৩৩]

"...হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার ক'রে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেশা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সঙ্কীর্ণ। আচারে-ব্যবহারে মুসলমান অন্য সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খেলাফৎ উপলক্ষেও সে নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই হিন্দু পদে পদে নিজের বেড়া তুলে রেখেছে।"[৩৪]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আমাদের দেশে এমন অসংখ্য লোক আছে, মুসলমান কুয়ো থেকে জল তুলতে এলে মুসলমানকে মেরে খুন করতে যারা কুণ্ঠিত হবে না।"[৩৫]

"আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোরবানী নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করিনি।"[৩৬]

"নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যার আয়োজন করলেই নরহত্যার আয়োজন করতে থাকব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোন নাম দেওয়া যায় না।"[৩৭]

"ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা সফল হবে তাহলে বড়ই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকী তিনটি কড়িকে মানবই না এটা বিরক্তির কথা হতে পারে, কিন্তু ছাদ-রক্ষার ক্ষেত্রে সুবুদ্ধির কথা নয়। আমাদের সবচেয়ে বড়ো অমঙ্গল বড়ো দুর্গতি ঘটে যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে অথচ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নেই অথবা সেই সম্বন্ধ বিকৃত।

"এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে অথচ পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতা সম্বন্ধ থাকবে না, হয়তো বা প্রয়োজনের থাকতে পারে—সেইখানে যে ছিদ্র, ছিদ্র নয়, কলির সিংহদ্বার। দুই প্রতিবেশীদের মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানে আকাশ ভেদ করে ওঠে অমঙ্গলের জয়তোরণ।"[৩৮]

"আমরা গোড়া হইতে ইংরাজের স্কুলে বেশী মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্ত করিয়াছি বলিয়া গভর্ণমেন্টের চাকুরী ও সম্মানের ভাগ মুসলমান প্রজাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশী পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না। আমাদের মাঝখানে একটা অসুয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন, তবে অবস্থার অসামান্যবশতঃ জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানের ভাগে পড়ুক ইহা যেন আমরা সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।"[৩৯]

"মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এ তথ্যটাই ভাবিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই—আজ যদি না করে তো কাল করিবে। এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে, অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়ে নিজেকে ধিক্কার দিতে

হইবে। হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে, এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনমতেই নিস্কৃতি নাই। আর মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন নাই এবং আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।...

"মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশের ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতি রক্ষা করিতে হইবে পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে।"[৪০]

"ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া একজন খামাকা আসিয়া দাঁড়াইলে অমনি যে কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতর ঘটে না। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরুক, আমাদের ব্যবহারে এখনো তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।"[৪১]

"অল্পদিন হইল আমাদের একটি শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। যে কারণেই হোক সেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল, সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে আত্মীয় বলিয়া ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম, সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলাম, যেন সেটা নিতান্তই ওদের শয়তানী। একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল, কিন্তু সত্য ছিল না।"[৪২]

"এত বড় আবেগ শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, মুসলমানকে স্পর্শ করল না। সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয়নি। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা গভীর করে রেখেছি, সেটাকে রক্ষা করেও লাফ দিয়ে সেটা পার হতে হবে, এমন আবদার চলে না।"[৪৩]

"ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে খোঁচাতে শুরু করল। আমরাও মসজিদের সামনে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময়ে অতিরিক্ত জিদের সঙ্গে ঢাকে কাটি দিলুম, অপর পক্ষেও কোরবানীর উৎসাহ পূর্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুলল, সেটা আপন আপন ধর্মের দাবী মেটাবার খাতির নিয়ে নয়, পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধা নিয়ে।"[৪৪]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অংশ বেশী হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশী হইবে কি-না মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের একথা বলা অসংগত নহে যে, আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড় হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।... একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুশী হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানিত্ব মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমান রূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।

"আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাততঃ আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়।

"এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে কি করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইবে—কিন্তু কি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ সেখানে কোনপ্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়—সেটা সহজ নহে, কিন্তু যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে; পরিণামের দিকে চাহিলেও দেখা যায় যেটা কঠিন, সেটাই সহজ মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে—এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।"[৪৫]

১৯১১তে প্রকাশিত বক্তব্যের সহিত ১৯৪০, ২৩শে মার্চের লাহোর প্রস্তাব এবং ১৯৪২, ১১ এপ্রিলের নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের সমগুণময়তা দেখিয়া অবাক হই—

"নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তথা এদেশের কয়েক কোটি মুসলমান দাবী করিতেছে যে, যেসব এলাকা একান্তভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যেমন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল, প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানার রদবদল করিয়া ঐ সকল এলাকাকে ভৌগোলিক দিক দিয়া এরূপভাবে পুনর্গঠিত করা হউক যাহাতে উহারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অঙ্গ-রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহণ করিয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিটদ্বয় সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদালাভ করিতে পারে।"

"নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন উপরোক্ত মূল আদর্শের ভিত্তিতে লীগ কার্যকরী সংসদকে শাসনতন্ত্রের একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করিতেছে—উক্ত শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনাটি এরূপভাবে প্রণীত হইতে হইবে যাহাতে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশরক্ষা, যোগাযোগ' শুল্ক এবং প্রয়োজনবোধে অন্য যে-কোন দফ্‌তরের দায়িত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে।"[৪৬]

"পঁচিশ বছর ধরে দু'টি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন স্থাপন করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে, মুসলমানরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে বৃটিশ সরকারের খসড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী এই দুটি প্রধান জাতিকে এক অখণ্ড ভারত রাষ্ট্র গঠন করতে বাধ্য করা তাদের পারস্পরিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল নহে... মুসলিম লীগের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতকে বিভক্ত ক'রে স্বতন্ত্র অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করাই ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায়। পরিকল্পনায় যে সমস্ত শর্ত রয়েছে সেগুলির যেমন একদিকে ব্যর্থ হতে বাধ্য তেমনি অপরদিকে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে তিক্ততা ও বিদ্বেষ সৃষ্টিতেও সহায়তা করতে পারে।"[৪৭]

পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যখন ছাত্র অথবা গোঁড়া কংগ্রেসী রবীন্দ্রনাথ সেই সময় এই প্রসঙ্গে কতই না প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ জনশক্তির রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।[৪৮] কল্যাণ ও শান্তিকামী ভারতীয় দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন তেমনটি কোন বাঙালি মুসলমান দিতে পারেন নাই। এমনকি, স্বয়ং মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ও নন, অন্তত সে সময় তো নয়ই। সে পরিমাণে কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি এখনো ভারতীয় নাগরিক, যিনি ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানদের স্বার্থের ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে উদাসীন তাঁহাকে লইয়া আমাদের সহৃদয় মমত্ববোধের কারণ বোধ করি তিনি মুসলমান। রবীন্দ্রবর্জনের উৎসাহী সাহিত্য ও সমাজসেবক এই বিচারে তেমন আগ্রহী নন। নজরুলের প্রতি অসম্মানজ্ঞাপন বা ভুল তথ্য পরিবেশনের দায়িত্ব না নিয়াও আমরা বলিব রবীন্দ্রনাথের প্রতি বোধ করি এতদিন সুবিচার করি নাই। বিশ বছরের জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও যদি আমাদের মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না হয়,—সে দোষ 'সাম্প্রদায়িক' রবীন্দ্রনাথের নয়।

বর্তমান প্রবন্ধ সাহিত্যবিষয়ক নহে, সংগীতবিষয়কও নহে—নিতান্তই গরজের লেখা। আব্বাসউদ্দীন মোহামেডানে খেলিয়া কয়টা গোল দিয়াছিলেন, কায়েদে আজম ক্রিকেট ক্যাপ্টেন ছিলেন না কেন—এ তর্কে আমরা প্রবৃত্ত হই না; আমরা প্রবৃত্ত হই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ গাল্পিক, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, চিন্তাবিদ—রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের জন্য কি করিয়াছেন তাহা লইয়া। দুইটা যে দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিকের রাস্তা সে প্রশ্নটা বেমালুম ভুলিয়া যাইতে আমরা এতটা অভ্যস্ত যে কেউ রবীন্দ্রসংগীত পছন্দ করিলে তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে দ্বিধাবোধ করি না।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা প্রবন্ধটি শেষ করি—"বিশ্বনবী (সঃ) বলেছেন—কলিমাতুল হিকমতে দাল্লাতুল হকীমে হয়সু ওজদাহা ফাহুওয়া আককু বিহা—জ্ঞানীর বাক্য জ্ঞানীর হারান ধন, যেখানেই কেউ তাকে পাবে সেই তার হকদার হবে। আমরা পাকিস্তানীরা রবীন্দ্রনাথের উচ্চভাবধারাকেও আমাদেরই জিনিস বলে মনে করতে পারি। আজও পৃথিবীর মুসলমান সমাজ গ্রীসের ফিসাহুঁরাস (Phythagoras) আফলাতুন (Plato) সুকরাত (Socrates) আরস্তু (Aristole) বুকরাত (Hypecrates) জালিনুস (Gelen) বতালিমুস (Ptolemy) এবং উকলিদস (Euclid)-কে সসম্ভ্রমে স্মরণ করে।... আমরাও আজ গ্রীসের প্রাচীন মনীষীদের মধ্যে পাক-ভারতের এই মনীষীকে উপযুক্ত সম্মানজনক স্থান দিব এবং তাঁর শাশ্বত সত্য বাণীকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করব। মনে রাখতে হবে, যে দেশে গুণীর সমাদর নেই সে দেশে গুণী জন্মাতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ অমর। মানবীয় প্রেমে তাঁর হৃদয় ছিল ভরপুর।

হাফিজ বলেছেন—

'হার গিজন মীরদ আঁকে
দিল্‌শ জিন্দহ্‌ শুদ ব-ইশ্‌ক্‌।
সবতস্ত্‌ বর্‌ জরীদ এ 'জরীদ এ 'আলম
দওয়ামে মা।'

হিয়াটি যার প্রেম-জীবিত মরণ নাইক তাহার
ভবের খাতায় অমর কোঠায় দেখ লেখন মোদের।
রবীন্দ্রনাথ যিন্দহ্‌বাদ।
পাকিস্তান যিন্দ্‌হবাদ।"[৪৯]

তথ্যনির্দেশ—

১. 'ভারতীয় দার্শনিক ঠাকুর'—ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ রচিত 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের উদ্ধৃতি হইতে লওয়া হইয়াছে।

'সমকাল', রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৬২৮ (সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর), ঢাকা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২. রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী কেন্দ্রীয় কমিটির অনুষ্ঠানে সভাপতি মিঃ জাষ্টিস এস.এম. মুরশেদের ভাষণ, ঐ, পৃ. ৭১১

৩. ঐ, ঐ।

৪. ঠাকুরপরিবার ও মুসলিম সংস্কৃতি, গৌরী আইয়ুব, 'নবজাতক', দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা ১৩৭৩, কলিকাতা, (সম্পাদিকা—মৈত্রেয়ী দেবী), পৃ. ৮৮।

৫. ঐ, পৃ. ৮৯।

৬. ঐ পৃ. ৯০।

৭. ঐ, পৃ. ৮৮।

৮. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'সমকাল', র. স., পৃ. ৬২৫।

৯. 'দত্তা' (উপন্যাস), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১-৩।

১০. গল্পগুচ্ছের মুসলিম চরিত্র, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'সমকাল', র. স., পৃ. ৬৯১।

১১. রবীন্দ্রনাথ ও ধর্ম, আবুল ফজল, 'সমকাল', র. স., পৃ. ৬৩০।

১২. মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারা বেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজা খেলা
মুগ্ধ ভাবভোগে, সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুত্তল। ('নৈবেদ্য', ৫০) তুলনীয়—

তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায়
আমার গুরুতে মুরশেদে।
তোর দুয়ারেই নানান তালা
পুরাণ কোরান তসবিসলো
ভেক পথই তো প্রধান জ্বালা
কাইন্দা মদন মরে খেদে ॥

—শেখ মদন বাউল

উদ্ধৃত, 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য', ড. আনিসুজ্জামান, ১৯৬৪ ঢাকা, পৃ. ২১১।

১৩. 'বিসর্জন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৪. আবুল ফজল, ঐ, পৃ. ৬৩১।

১৫. প্রাগুক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৩০।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৬. ড. আহমদ শরীফের পদাবলী প্রসঙ্গে প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্রিকা', ঢাকা।

১৭. সম্পাদকীয় প্রবন্ধের, রবীন্দনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃতি, 'নবজাতক', রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৩৭৩।

১৮. রাজা-প্রজা, রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১০৬।

১৯. অত্যুক্তি, রাজা-প্রজা, রবীন্দ্রনাথ, ১৯১২ দিল্লীর দরবার উপলক্ষে রচিত।

২০. গ্রন্থ-সমালোচনা, 'ভারতী', শ্রাবণ ১৩০৫, রবীন্দ্রনাথ।

২১. 'ভারতী', শ্রাবণ ১৩০৫, রবীন্দ্রনাথ।

২২. 'বিশ্বনবী, গোলাম মোস্তফা রচিত—গ্রন্থটি ইতিহাস নয় জীবনচরিতও নয়, ধর্মীয় গ্রন্থ।

২৩. 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক', মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, 'সমকাল' পৃ. ৬৪৩।

২৪. 'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'সূর্যাবর্ত', অনিল কুমার সিংহ সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৬১, পৃ. ৭৭।

২৫. ঐ, পৃ. ৭৬।

২৬. ঐ, পৃ. ৭৬।

২৭. অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া মার্কসবাদী পণ্ডিতগণ 'পরিচয়' পত্রিকায় নিয়মিত রবীন্দ্র-সমালোচনা করিতেন। তাঁহাদের রবীন্দ্র-সমালোচনা এখানে শেষ হয় নাই। এখানে পণ্ডিতবর্গের মতামত তুলিয়া দিলাম—'রবীন্দ্রনাথ বর্জন করলে আজকের দিনের বাংলা সংস্কৃতির শুধু অঙ্গহানি হয় না—তার প্রাণ পর্যন্ত বাদ পড়ে।'—অমিত সেন, সূর্যাবর্ত, সুবীর রায় চৌধুরীর "মার্কসবাদী রবীন্দ্র সমালোচনার ইতিহাস" প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃ. ১৪৯।

'এদেশে ধর্মগত ও সমাজজগত যে সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, রবীন্দ্রনাথ সেই সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা থেকে প্রায় সর্বাংশে মুক্ত।... রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক বলা একটা মিথ্যা প্রচার (Slander)।'

—গোপাল হালদার, ঐ, পৃ. ১৫৩।

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য ১৯২১ জুলাই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ জমিয়ত ওলামায়ে হিন্দ। রবীন্দ্রনাথ এরও অনেক আগে জাগ্রতশক্তিকে আহ্বান করেন।

২৮. Mohammed Ali Jinnah, 'An Ambassador of Unity His Speeches and Writings, 1912-1917 with biographical appreciation by Sarojini Naidu (Gannesh-Madras).

Jinnah. H. B. P P 228

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৯. জমিরুদ্দিন খান, 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী', সত্যেন সেন, ঢাকা ১৯৫৮, পৃ. ৯৩।

৩০. "অন্য ইতিহাসের নকল করে নিজের দেশের ইতিহাস রচনা করা যায় না।—মনের আক্ষেপ উত্তেজনা এবং হাঁকডাক ব্যাপারটা খুব প্রচণ্ড হতে পারে কিন্তু দেশের অবস্থার সঙ্গে উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য সাধন সে উপায়ে সিদ্ধ হয় না। 'দেশে আগুন লেগেছে অতএব ইত্যাদি' একথা কিছুকাল থেকে শুনচি—এ আগুন বহু বহু শতাব্দী থেকেই লেগেচে—কিন্তু 'আড়ি আড়ি, আড়ি, আড়ি' বলে চীৎকার করবার জন্যে ছেলেরা লেখাপড়া এবং বুড়োরা কাজকর্ম ছেড়ে দিলেই এ আগুন নিববে একথা বিশ্বাস করিনে। চরকা চালিয়ে খদ্দর পরে, এই আগুন নিববে এটা এতবড় একটা ছেলেভোলানো কথা যে এ কথায় দেশশুদ্ধ লোক ভুলেচে দেখে হতবুদ্ধি ও হতাশ হতে হয়। সন্ন্যাসী বলচে তামাকে সোনা করবার একটা সহজ প্রক্রিয়া আমি জানি আমি বলচি সোনা করবার একটা সহজ প্রক্রিয়া আমি জানি আমি বলচি সোনা যথানিয়মে উপার্জন করতে হবে অন্য কোন প্রক্রিয়া নেই—তখন তুমি যদি আমার উপর রাগ কর তাতে এই প্রকাশ হয় যে উপার্জন করার মত উদ্যম তোমার নেই অথচ সোনা পাবার লোভ তোমার পুরো মাত্রায়—এমন মানুষকে বিধাতা পুরস্কার দেন না। চরকা চালিয়ে কোন ফল হয় না এ কথা কেউ বলে না, তার যেটুকু ফল তাই হয়, তার বেশী হয় না। কুইনিন্ খেলে ম্যালেরিয়া সারে, ম্যালেরিয়া সারলে দেশের পরম উপকার ঘটে, কিন্তু কুইনিন্ খেলে স্বরাজ হয় একথা কুইনিন্ বিক্রির মহাজনও বলে না।" (চিঠিপত্র ৭, পৃ. ১০৯, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। "ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করতে হবে কিম্বা ভারতবর্ষ কোন দিন স্বাধীন হবার চেষ্টা করবে না এমন কথা বলিনি। মহাত্মাজি বলেচেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আমরা থাক্‌ব এবং সে রকম থাকবার ইচ্ছা না করা "Religiously wrong" অর্থাৎ ধর্মবিরুদ্ধ। আমি বলি, স্বাধীনতা বাইরের কোন একটা ঘটনার উপর নির্ভর করে না; দেশের যে অবস্থা ঘটলে স্বাধীনতার মূলপত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয় সে অবস্থা ঘটবার জন্য চেষ্টা করাই আমাদের বর্তমান কর্ত্তব্য। সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না—তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন ও বিচিত্র—তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়। যে সব কাজে মনের সমস্ত শক্তির জাগরণ ও দীর্ঘকালের প্রাত্যহিক ত্যাগ স্বীকার চাই সে কাজে যখন আমাদের ছেলেদের কোনো উৎসাহ দেখিনে যখন দেখি তারা নিরন্তর তীব্র হৃদয়াবেগের নেশায় মেতে থাকতে চায় "তদা না সংশে বিজয়ায় সঞ্জয়।"—ঐ পৃ. ১০৭। "আমি গুরু না, রাষ্ট্রনেতা না—আমি কবি, সৃষ্টির বিচিত্র খেলায় নানা ছন্দে গড়া খেলনা জোগাই; এই আমার কাজ। তাতে মানুষের যেটুকু আনন্দ সেইটুকুতেই আমার সার্থকতা এই আমার স্বধর্ম, আর সেই স্বধর্ম রক্ষার দায়িত্বই আমার। আমার কাছ থেকে রাষ্ট্রনৈতিক সুবুদ্ধি কর্মনৈতিক নৈপুণ্য যারা আশা করেছে তারা নিজে ভুল করেছে; অথচ আশাভঙ্গের দুঃখের জন্যে আমাকেই দায়ী করেছে।"—পৃ. ১১৮।

~ www.amarboi.com ~

৩১. পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশরণ সিং জাতিসঙ্ঘের রিপোর্ট স্মর্তব্য। এবং 'While Memory Serves', Sir F. Thuker (Cessel, 1950).

৩২. সমস্যা, কালান্তর, 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩৩০, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৩. 'প্রবাসী', ১৩৩৮ শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৪. ড. কালিদাস নাগকে লিখিত পত্র, 'শান্তিনিকেতন' (পত্রিকা), ১৩২৯ শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৫. চরকা, 'সবুজপত্র' (প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত), ১৩৩২ ভাদ্র।

৩৬. হিন্দু-মুসলমান, 'প্রবাসী', ১৩৩৮ শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তুলনীয়—

এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়।
সকলেরি এক রক্ত, এক ঘরে আশ্রয় ॥...
মালা পৈতা একজন ধরে,
কেউ বা সুন্নত করে।
তবে ভায়ে ভায়ে মারামারি করে
যাচ্ছিস কেন সব গোল্লায়।

—কবি পাগলা কানাই, 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য', উদ্ধৃত, পৃ. ২১১।

৩৭. ছোট ও বড়, কালান্তর, 'প্রবাসী', ১৩২৪ অগ্রহায়ণ, ঐ।

৩৮. স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, 'প্রবাসী', ১৩৩৩ মাঘ, ঐ, স্মর্তব্য 'You cannot clap With one hand', লিয়াকত আলী খান।

৩৯. সভাপতির অভিভাষণ, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী ১৩১৪ (১৯০৭), রবীন্দ্রনাথ।

৪০. ব্যাধি ও প্রতিকার, 'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩১৪, ঐ।

৪১. সদুপায়, 'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩১৫, ঐ।

৪২. লোকহিত, কালান্তর, 'সবুজপত্র', ১৩২১ ভাদ্র, ঐ।

৪৩. স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, 'প্রবাসী', ১৩৩৩, ঐ।

৪৪. হিন্দু-মুসলমান, 'প্রবাসী', ১৩৩৮ শ্রাবণ, ঐ।

৪৫. পরিচয়, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩১৮ (১৯১১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৬. লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০, ২৩শে মার্চ।

৪৭. Resolution, All India Muslim League, Working Committee, 11th April 1942, New Delhi.

৪৮. পরিচয়, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩১৮, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৪৯. জালিয়ানওয়ালাবাগের (১৯১৯) পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইটহুড বর্জন করেন। লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে লিখিত চিঠিতে জানান—'The helplessness of our position as British subject in India' (ড. আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্যে' উদ্ধৃত, ১০৭ পৃ.) এবং এরপর রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া সফরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মনে রাখা দরকার গণশক্তির কথাটি রবীন্দ্রনাথের আগে তেমন করিয়া আর কেহ বলেন নাই।

৫০. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, 'সমকাল', রবীন্দ্র সংখ্যা, পৃ. ৬৭৩।

সাফাই

সৈয়দ মুজতবা আলীর কোন্ গল্পে যেন পড়িয়াছিলাম—'এ সাবান বিককিরির না', উক্ত দোকানদারের মত বলিতে সাধ হইলেও বলিতে পারিতেছি কই—এই প্রবন্ধ পণ্ডিতজনের জন্য নয়।—হইলে প্রথমেই একটা ভূমিকা থাকিত।—এইখানে? মাথা চুলকাইয়া, রেওয়াজ ভাঙ্গিয়া অবশেষে এবং সর্বশেষে 'সাফাই'। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছিলাম, ইহাকে প্রবন্ধ সংকলনও বলা যাইতে পারে,—নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক রচনা। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সাধারণ-অসাধারণ পাঠকের যে মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছি সেই বেদনাদায়ক অনুভূতির প্রতিক্রিয়াই 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ'; তা-ও গোটা পৃথিবীর নয়, রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাময় আফ্রো-এশিয়ার নয়, নিতান্তই পূর্ব পাকিস্তানের, তখন পরাধীন ছিলাম বলিয়া বড়জোর পাক-ভারতেরও (ভারতবর্ষের)। আমি আমার সাধ্যমত আলোকপাত করিলাম। আলোটা ধার করা, এমনকি সম্পাতের কায়দাটা পর্যন্ত আমার নমস্য অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সাহেবের। ধার করা বটে এবং অন্যেরই বটে—কিন্তু অনুরাগটা আমার, আমার বিশ্বাস দানে আলোকের ক্ষতি তো হয়ই না বরং বাড়ে এবং অধিক আলোকিত হয়। ছাত্রাবস্থায় অধ্যাপক চৌধুরীর কাছে নানাভাবে ঋণী ছিলাম, লেখার ব্যাপারেও তাঁহারই প্রবন্ধ (নামটাও লক্ষ্য করুন—'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক') হইতে দুই হাতেই লইয়াছি। নির্লজ্জ স্বীকারোক্তির কারণ পরিশোধের সাধ্য ও ইচ্ছা, কোনটাই আমার নাই। মুসলমান সমাজের শিক্ষা, জ্ঞানবিস্তার, সংগীত, নৃত্যকলা, ভাস্কর্য, বিজ্ঞানচর্চা—অর্থাৎ মুসলিম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রাবদান আলোচনার সীমানার মধ্যে পড়িলেও ঐ বিশাল বিষয়ের আলোচনায় মোটেই উৎসাহিত হই নাই—সাহস হইল না।

জনাব সিকান্‌দার আবু জাফর ও শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 'সমকাল' রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা এবং কয়েকটি সংখ্যা '[illegible]জাতক' হাতের কাছে না থাকিলে বড় বিপদ হইত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ

ভূঁইয়া ইকবাল

বাংলা সাহিত্যের মহত্তম শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে মুসলমান সমাজ একান্ত আপনজন বলে গ্রহণ করেছেন; তার একটি প্রমাণ তাঁর সম্পর্ক আমাদের অনুযোগ—রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলমান সমাজের কথা প্রতিফলিত হয় নি। কবির কাছে মুসলমান সমাজের এই প্রত্যাশা ও ক্ষোভের ভিত্তি হলো তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা।

যাঁরা সাহিত্যের অনুরাগী সংবেদনশীল পাঠক-ভোক্তা নন, তাঁরাও অভিযোগ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ বড় কবি, মহামানব, বিশ্বপ্রেমিক, কিন্তু বিশেষভাবে তাঁর বাড়ির কাছের মুসলমানদের জন্য তিনি কি করেছেন?[১]

এই সংগত প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রানুরাগী কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর সহযাত্রী লেখক কাজী আনোয়ারুল কাদীরের কথা উদ্ধৃত করছেন 'আকাশের সূর্য মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে কি করেছে?'[২]

এই কথা বলে ওদুদ সাহেব কবি সম্পর্কে মুসলমানদের অনুযোগ এড়িয়ে যেতে চান নি; তিনি বলছেন, যদি কবি রবীন্দ্রনাথের মুসলিম দেশভ্রাতাদের মনে এই অকরুণ প্রশ্ন জেগে থাকে যে তিনি তাঁদের কোন কাজে লেগেছেন, তবে সত্যজিজ্ঞাসুকে সে প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হয়।[৩]

এসব প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধানের প্রয়াস পেয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আবুল ফজল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, গোলাম মোস্তফা, হুমায়ুন আজাদ, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী, গৌরী আইয়ুব প্রমুখ।[৪] এই লেখকেরা মূলত রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গ্রথিত প্রবন্ধ, ছোটগল্প ইত্যাদি সাহিত্যের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্ররচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয় নি এমন কিছু চিঠিপত্র, বাণী, পুস্তক-সমালোচনা, মুসলমান লেখকদের বইয়ের 'ভূমিকা', মন্তব্য আমাদের নজরে এসেছে, যার ভিত্তিতে আমরা রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান-সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

মুসলমান সমাজের সঙ্গে কবির যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার সাহিত্যিক তাৎপর্য থাক-বা না থাক, মুসলমানদের প্রশ্নের কিছু কিছু জবাবের ইঙ্গিত হয়তো আমরা এসব অপরিজ্ঞাত তথ্য থেকে পেতে পারি।

শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন মহাফেজখানা এবং অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা এখানে উদ্ধৃত রচনাংশসমূহ সংগ্রহ করেছি।

এই আলোচনায় কবির পক্ষে ওকালতি বা মুসলমান সমাজ ও রবীন্দ্রভাবনা সম্পর্কে জজিয়তি আমাদের অভিপ্রায় নয়। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যাবলি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজের সম্পর্কের খতিয়ান নির্মাণের চেষ্টা করবো।

আলোচ্য বিষয়ে যেসব অপরিজ্ঞাত টুকরো-টুকরো তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি, তা এখানে পেশ করবো। এসব তথ্যের সিংহভাগই রবীন্দ্ররচনাবলী বা তাঁর বইয়ে গ্রথিত হয় নি। তাই আমি উদ্ধৃতির পরিমাণ বেশ বাড়িয়ে দেব।

ইসলাম ধর্ম ও তার প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে রবীন্দ্রমন্তব্য উল্লেখ করে আলোচনা শুরু করছি।

১৯৩৩ সালে মুম্বাইয়ে নবী দিবস পালন উপলক্ষে এক বাণীতে রবীন্দ্রনাথ বলেন 'Islam is one of the greatest religions of the world...'।[৫]

১৯৩৬ সালে দিল্লির জুমা মসজিদ থেকে প্রকাশিত The Peshwa পত্রিকার নবী দিবস সংখ্যায় প্রেরিত বাণীতে কবি যা বলেছিলেন তাতে হজরতের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার ভাব ফুটে ওঠে '...Holy prophet Mohammad, one of the greatest personalities born in the world, who has brought a new and patent force of life in human history.'[৬]

১৯৩৪-এ স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে কবি হজরত মোহাম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে আকাশবাণীতে প্রচারিত বাণীতে একই কথা বলেন 'ইসলাম পৃথিবীর মহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি।'[৭]

১৯৩৩-এ বিচারপতি মির্জা আলী আকবর খানের সভাপতিত্বে পয়গম্বর দিবসে অনুষ্ঠিত সভায় সরোজিনী নাইডু কবির বাণী পাঠ করেন 'জগতে যে সামান্য কয়েকটি মহান ধর্ম আছে, ইসলাম তাদেরই অন্যতম।'[৮]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম ধর্ম বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ কোনো বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। তবে এই ক্ষুদ্র বাণীসমূহে হজরত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধের প্রকাশ আছে। কবির প্রেরণায় শান্তিনিকেতনের শিক্ষক সন্তোষচন্দ্র মজুমদার 'হজরত মোহাম্মদের জীবনী ও শিক্ষা' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন।[৯]

মুসলমান লেখকদের দুটি বইয়ের পুস্তক-সমালোচনা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একটি সিলেটের অধিবাসী স্কুল ইন্সপেক্টর আবদুল করিম বি.এ. প্রণীত ১৮৯৮-এ প্রকাশিত 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' (প্রথম খণ্ড) আর অন্যটি নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর 'Vernacular Education in Bengal'. প্রথম বইয়ের সমালোচনাটি আসলে ওই বই-সমালোচনা উপলক্ষে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। এই পুস্তক-সমালোচনায় কবি বলেন

> ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বহুতর খণ্ডবিচ্ছিন্ন জাতি মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচণ্ড আকর্ষণ বলে একীভূত হইয়া মুসলমান-নামক এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল।[১০]

আবদুল করিমের 'Islam's Contribution to Science and Civilisation' বইয়ের 'ভূমিকা' লেখেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৫-এ প্রকাশিত এই বইয়ের ক্ষুদ্র ভূমিকায় কবির বক্তব্য

> One of the most potent sources of Hindu-Muslim conflict in India is that we know so little of each other. We live side by side and very often our worlds are entirely different. Such mental aloofness has created immense mischiefs in the past and forebades an evil future. It is only though a sympathetic understanding of each other's culture, social customs and conventions that we can create an atmosphere of peace and goodwill.[১১]

রবীন্দ্রনাথ এই ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, উল্লিখিত লক্ষ্যেই তিনি বিশ্বভারতীতে ইসলামী সংস্কৃতি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হয়েছে।

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন উপলক্ষে উর্দুতে যে ভাষণ দেন, তার ইংরেজি তরজমা প্রকাশিত হয় 'Vernacular Education in Bengal' নামে। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০৭ সনের ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় ওই পুস্তিকার একটি সমালোচনা লেখেন।

বাংলায় অনেক স্থানে মুসলমানের সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক বিশেষভাবে হিন্দু ছাত্রদের উপযোগী করে লেখা হয়—নওয়াব আলী চৌধুরীর এই আক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ সহানুভূতি জানিয়ে ওই পুস্তক-সমালোচনায় বলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> ক্রমশঃ মুসলমান ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ভাল বাংলা লিখিতে পারেন এমন মুসলমান লেখকেরও অভাব নাই। অতএব ছাত্রদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় আসিয়াছে।
>
> স্বধর্ম্মের সদুপদেশ এবং স্বজাতীয়ের সাধু দৃষ্টান্ত মুসলমান বালকের [...] আবশ্যক একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা আরও বলি মুসলমান শাস্ত্র ও সাধু দৃষ্টান্তের সহিত পরিচয় হিন্দু বালকদের শিক্ষার অবশ্য-ধার্য্য অঙ্গ হওয়া উচিত।
>
> বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমান ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, পরস্পরের সুখদুঃখ নানাসূত্রে বিজড়িত, একের গৃহে অগ্নি লাগিলে অন্যকে যখন জল আনিতে ছুটাছুটি করিতে হয় তখন শিশুকাল হইতে সকল বিষয়েই পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিচয় থাকা চাই। বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা তাহারা কেহই আপন জীবনের কর্তব্য ভাল করিয়া পালন করিতে পারিবে না।
>
> হিন্দু ছেলের পাঠ্যপুস্তকে তাহার স্বদেশীয় নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমানদের কোন কথা না থাকা অন্যায় ও অসঙ্গত।

এই পুস্তক-আলোচনায় কবি বলেন যে, মুসলমানদের ইতিহাসের উপকরণ উর্দু ভাষায় লভ্য বলে হিন্দু ঐতিহাসিকদের প্রয়োজন মুসলমান লেখকের সহায়তা গ্রহণ। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, ইংরেজ লেখকদের বইয়ে পরিবেশিত রচনা থেকেই মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে বিকৃত ও অসত্য তথ্য ভারতের হিন্দু ছাত্ররা পড়ে এবং মুসলমান সমাজ সম্পর্কে ভুল ধারণা লাভ করে থাকে।

বঙ্কিমের রচনায় মুসলমান-বিদ্বেষে দুঃখ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন

> মুসলমান সুলেখকগণ যখন বঙ্গ সাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণ প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা কেহই হিন্দু পাঠকদিগকে কোনরূপ ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা আশা করিতে পারি না।[১২]

রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটি কবির কোনো বই বা রচনাবলীতে অসংকলিত; তাই আমরা দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম। 'ভারতী' পত্রিকার ২৪তম বর্ষের সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত।

মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদ ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের দুজনের দুটি বইয়ের 'ভূমিকা' লেখেন রবীন্দ্রনাথ। কাজী আবদুল ওদুদের 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ বিশ্বভারতী প্রকাশ করেন ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' বইটি প্রকাশের আগে কবির সাগ্রহ আমন্ত্রণে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের

তৎকালীন লেকচারার কাজী সাহেব বিশ্বভারতীর 'নিজাম বক্তৃতা' প্রদান করেন ওই বিষয়ে। কবি স্বয়ং ওদুদ সাহেবের বক্তৃতা সভায় হাজির ছিলেন। বইটির ছোট 'ভূমিকায়' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন

> এদেশের হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পাই না, তখন মাঝে মাঝে দূরে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন করে আছে এমন এক একটি সেতু। আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি তাঁর মননশীলতা, তাঁর পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বাংলা ভাষায় তাঁর প্রকাশশক্তির বিশিষ্টতা।...

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি' প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কবির বক্তব্য

> সংখ্যা গণনা করলে দেখা যাবে এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান। সুতরাং দেশকে ভোগ করার অধিকার উভয়েরই সমান। কিন্তু তীব্রতর বিরুদ্ধতা রয়ে গেল ধর্ম নিয়ে। মুসলমান শাসনের আরম্ভকাল থেকেই ভারতে উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই আপন জীবনে ও বাক্যপ্রচারে এই বিরুদ্ধতার সমন্বয় সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন।... যে সব উদার চিত্তে হিন্দুমুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হতে পেরেছে, সেই-সব চিত্তে সেই ধর্মসঙ্গমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানসতীর্থ স্থাপিত হয়েছে।

ওই দীর্ঘ ভূমিকায় কবি উল্লেখ করলেন

> বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি—এ জিনিষ হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই; একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি।... এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দুমুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরানে-পুরাণে ঝগড়া বাধে নি। বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল, কলেজের অগোচরে আপনা আপনি কিরকম কাজ করে এসেচে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেচে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।[১৩]

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-সম্পাদিত 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার ১৩৪৩-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'খালেদ' ছদ্মনামে জনৈক লেখক "প্রবেশিকা বাংলা পাঠ্য' কি পাঠ্য হইবার যোগ্য?"—এই শিরোনামে একটি আক্রমণাত্মক সমালোচনা প্রকাশ করেন। ('মোহাম্মদী'র এই সংখ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বইয়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযোগ জানিয়ে স্বনামে প্রবন্ধ লেখেন সম্পাদক স্বয়ং; নূরী ছদ্মনামে লেখেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। মওলানা সাহেব ছাড়া অন্য সব লেখকই ছদ্মনামে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লিখেছিলেন।) রবীন্দ্রনাথ ওই সংখ্যার খালেদ ছদ্মনামীর রচনাটি পাঠ করে তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায়। ৪ জুন ১৯৩৬ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকা 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা প্রবেশিকা পাঠ্য' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ-নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

পাঠ্যবইয়ে সংকলিত রবীন্দ্র-রচনার বিরুদ্ধে 'মোহাম্মদী'র বেনামী লেখকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কবির মন্তব্য লক্ষযোগ্য

> আমার কোনো কবিতায় ব্যক্তিগতভাবে অরঙ্গজেবের সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ পেয়েছিল। বলেছিলেম অরঙ্গজেব ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করেছিলেন। পাঠ্য নির্বাচনের মুসলমান সভ্য এটাকে সমস্ত মুসলমানের নিন্দা বলেই গণ্য করেছিলেন, নইলে এ লাইনটাকেও বর্জ্জন করতে আদেশ দিতেন না। তাই স্পষ্ট করে বলে রাখি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি মোহাম্মদীর প্রবন্ধ-লেখকের অদ্ভুত উক্তি নিয়ে যে আলোচনা করেছি সেটাও একজনের সম্বন্ধে। সেটাতে সমগ্র বা অধিকাংশ মুসলমানের বিচারবুদ্ধির প্রতি লক্ষ করা হয়েছে, এ দুর্দ্দিনে এত বড় নিন্দার কথা কেউ যেন কল্পনা না করেন। আমি অনেক মুসলমানকে জানি, তাঁদের শ্রদ্ধা করি। অনেকেই তাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা রসজ্ঞ, তাঁরা উদার, তাঁরা মননশীল, নানান ভাষার সাহিত্যে তাঁরা অভিজ্ঞ, অপক্ষপাত সদ্বিবেচনায় তাঁরা কোনো সম্প্রদায়ের কোনো সদাশয় ব্যক্তির চেয়ে কোনো অংশেই ন্যূন নন। তাঁরা হিন্দু কি মুসলমান এ তর্ক মনে ওঠেই না, জানি তাঁরা মানুষের মত মানুষ।[১৪]

মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দুদের অজ্ঞতা ও অপরিচয়ের বাধা সাহিত্যের মাধ্যমে দূর হতে পারে, একথা রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বলেছেন।

আবুল ফজলের 'চৌচির' উপন্যাসিকা পড়ে কবি তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মৃত্যুর বছর খানেক আগে ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ তারিখে লেখককে ব্যক্তিগত পত্রে বলেন

> আধুনিক মুসলমান সমাজের সমস্যা ঐ সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই জানতে হবে—এই প্রয়োজন আমি বিশেষ করেই অনুভব করি।... চাঁদের এক পৃষ্ঠায় আলো পড়ে না সে আমাদের অগোচর, তেমনি দুর্দৈবক্রমে বাংলাদেশের আধখানায় সাহিত্যের আলো যদি না পড়ে তা হলে আমরা বাংলাদেশকে চিনতে পারব না, না পারলে তার সঙ্গে ব্যবহারে ভুল ঘটতে থাকবে।... শক্তিমান মুসলমান লেখকরা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেন নি, এ অভাব সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব। এই জীবনযাত্রার যথোচিত পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক।[১৫]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯১৯-এ আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এক চিঠিতে উপন্যাসখানিতে মুসলমান চাষীগৃহস্থের যে সরলজীবনের ছবিখানি অঙ্কিত হয়েছে তার প্রশংসা করেছিলেন। ১৯৩৩-এ কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' প্রকাশিত হলে কাজী আবদুল ওদুদকে ১৯৩৫ সালের ১১ জানুয়ারি এক পত্রে কবি বলেন, এই বই থেকে মুসলমানদের ঘরের খবর জানা গেল।

বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেও এসব শব্দের সহজ ও স্বাভাবিক ব্যবহার অনুমোদন করেন। এম এ আজম ও আবুল ফজলকে লেখা কবির দুটি চিঠি থেকে প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধৃতি দিলে এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১১ চৈত্র এম এ আজমকে লেখা চিঠিটি কবি নিজেই ১৩৪২-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন

> ভাষা মাত্রেরই একটি মজ্জাগত স্বভাব আছে, তাকে না মানলে চলে না।...
>
> বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসী আরবী শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোন লক্ষণ নেই। কিন্তু যেসব পারসী আরবী শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত অথবা হয়তো কোন এক শ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ, তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলে নি, তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল।...[১৬]

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবনের চিত্র অংকনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহারের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আবুল ফজলের বক্তব্যের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ ১৯৪০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে প্রেরিত ব্যক্তিগত পত্রে বলেছিলেন

> ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।... তথাপি ভাষার নমনীয়তার একটা সীমা আছে। ভাষার যেটা মূল স্বভাব তার অত্যন্ত প্রতিকূলতা করলে ভাব প্রকাশের বাহনকে অকর্মণ্য করে ফেলা হয়। প্রয়োজনের তাগিদে ভাষা বহুকাল থেকে বিস্তর নতুন কথা আমদানী করে এসেছে। বাংলা ভাষায় পারসী আরবী শব্দের সংখ্যা কম নয় কিন্তু তারা সহজেই স্থান পেয়েছে। প্রতিদিন একটা দুটো করে ইংরেজী শব্দও আমাদের ব্যবহারের মধ্যে প্রবেশ করচে। ভাষার মূল প্রকৃতির মধ্যে একটা বিধান আছে যার দ্বারা নতুন শব্দের যাচাই হতে থাকে, গায়ের জোরে সেই বিধান না মানলে জারজ শব্দ কিছুতেই জাতে ওঠে না।... খুনখারাবি শব্দটা ভাষা সহজে মেনে নিয়েছে, আমরা তাকে যদি না মানি তবে তাকে বলব গোঁড়ামি। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন শব্দকে স্বীকার করে নি, কোনো বিশেষ পরিবারে বা

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্প্রদায়ে ঐ অর্থই অভ্যস্ত হতে পারে তবু সাধারণ বাংলা ভাষায় ঐ অর্থ চালাতে গেলে ভাষা বিমুখ হবে।... মুসলমান সমাজের নিত্য ব্যবহৃত শব্দ যদি ভাষায় স্বতই প্রবেশ লাভ করে তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে না বরং বলবৃদ্ধি হবে, বাংলা ভাষার অভিব্যক্তির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে।[১৭]

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সমালোচনা করে ১৩৪১-এ এক পত্রে 'রূপরেখা' ও 'বর্ষবাণী'র প্রকাশক আলতাফ চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন

> আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করবার যে চেষ্টা চলছে তার মতো বর্বরতা আর হতে পারে না। এ যেন ভাইয়ের উপর রাগ করে পারিবারিক বাস্তুঘরে আগুন লাগানো।...
>
> এমনতর নির্মম অন্ধতা বাংলা প্রদেশেই এতবড় স্পর্ধার সঙ্গে আজ দেখা দিয়েছে বলে আমি লজ্জাবোধ করি। বাংলাদেশের মুসলমানকে যদি বাঙ্গালী বলে গণ্য না করতুম তাহলে সাহিত্যিক এই অদ্ভুত কদাচার সম্বন্ধে তাঁদের কঠিন নিন্দা ঘোষণা করে সান্ত্বনা পেতে পারতুম।[১৮]

শামসুন্নাহার মাহমুদ ও হবীবুল্লাহ বাহার সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩-এর ৭ নভেম্বর শামসুন্নাহারকে যে চিঠি পাঠান তার অংশ উদ্ধৃত করছি

> আত্মবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃবিদ্বেষে দেশের হাওয়া যখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে সেই পরম দুর্যোগের দিনে নিষেধের বাণী যে কোথাও ধ্বনিত হতে পারল একে আমি শুভ লক্ষণ বলে মনে করি। আপনার বিনাশ যখন আপনিই ঘটাতে বসি তখন মহতী বিনষ্টি। বাইরের আঘাত থেকে দেহের পরিত্রাণ অসাধ্য নয়, কিন্তু দেহ যখন সাংঘাতিক মারীকে মর্ম্মস্থানে পোষণ করে, আপনার মৃত্যুবিষ আপনার মধ্য থেকেই উদ্ভাবিত করে তোলে তখনি পরম শোকের দিন উপস্থিত হয়। সেই শোচনীয় দশা আমাদের।... সর্বনাশের মদমত্ততায় আত্মবিস্মৃত দেশের উন্মত্ত কোলাহলের মাঝখানে তোমরা শুভবুদ্ধির আহবান নির্ভয়ে ঘোষণা করো, ঈশ্বরের প্রসন্নতা তোমাদের উদ্যোগকে গৌরবান্বিত করবে।

১৯৩০/৩১ সালে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক বিবৃতিতে বলেন

> ...আমরা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান একই দেশ-মাতৃকার সন্তান। চিরকাল পাশাপাশি বাস করিয়া এক সম্মিলিত রাজতন্ত্র গড়িয়া তুলিব, জয় পরাজয়ের সমান অংশ সমভাবে বাঁটিয়া লইব। এই নিদারুণ সঙ্কট মুহূর্তে আমাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সমস্ত সাধু মুসলমানগণকে তাঁহাদের মহান ধর্মের নামে, তাঁহাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> নামে ও বিপন্ন মানবসমাজের নামে আমি আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া, যে পাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া আমাদিগের উন্নতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় ডুবাইয়া দিয়া সমগ্র জগতের চক্ষে আমাদিগকে হীন ও উপহাসপদ প্রতিপন্ন করিয়া ফেলিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে উহার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিতেছি।[১৯]

১৯৩৬ সালে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বিষয়ে কবির এক বন্ধুর কাছে লেখা একটি চিঠি মার্চ সংখ্যা 'Visva Bharati News'-এ মুদ্রিত হয়; তার বাংলা তরজমা আনন্দবাজার পত্রিকার ৮ মার্চ ১৯৩৬ সংখ্যায় প্রকাশ পায়; হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের যে বাধা গড়ে উঠেছে সে বাধা অপসারণের সমস্যার কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ ওই চিঠিতে বলেন

> আমি রাজনীতিজ্ঞ নহি।।। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করিতে যে সমস্ত রাজনীতিক সমস্যার সমাধান করিতে হইবে তাহা আমি বুঝি না, আপোষ মীমাংসা বা সুবিধা প্রদানের দিক হইতে এই সমস্যাটাকে আমি দেখিও না। এই দুইটি সম্প্রদায় বহু শতাব্দী ধরিয়া পাশাপাশি বাস করিতেছে, তবু তাহাদের পরস্পরের ভিতরের সন্দেহ ও বিরোধ ঘুচিল না। আমি ইহাকে বর্বরতার লক্ষণ বলিয়াই মনে করি। ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনকে অহরহ অবমাননার গ্লানিতে কলঙ্কিত করিতেছে। হিন্দুমুসলমানের বিরোধ সম্বন্ধে আর নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই। অবিলম্বে ইহার সমাধান আমাদিগকে করিতে হইবে।[২০]

১৯২৬ সালে কবির ঢাকা সফরকালে মুসলিম হলে কবিকে সংবর্ধনা প্রদান করে ছাত্র সংসদ। হলের প্রভোস্ট স্যার এ. এফ. রহমানের সভাপতিত্বে ওই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম হলের জীবন-সদস্য পদে সম্মানিত করা হয়। আবুল হুসেনের লেখা সংবর্ধনা ভাষণ পাঠ করেন ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি সুলতানউদ্দীন আহমদ। সংবর্ধনার উত্তরে কবি তার ভাষণে উল্লেখ করেন

> পরস্পরের বিরোধে আমাদের মনুষ্যত্ব অপমানিত হচ্ছে তা দেখে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছি; বিশেষ করে আমার হিন্দু সমাজের জন্য।... আমি আমার সমাজের জন্য লজ্জিত হয়েছি। লজ্জার কারণ মুসলমানের মধ্যেও ঘটে। এক্ষেত্রে যদি পরস্পর প্রীতি না করি তাহলে বিধাতা যে দায়িত্ব আমাদের উপর দিয়েছেন তার কত বড় অপমান করা হয়।...

মুসলিম হলে প্রদত্ত ওই বক্তৃতায় কবি আরো বলেছিলেন

> পাশ্চাত্য দেশে আমি মানবের কবি বলে সমাদৃত। তার কারণ কোন সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আমি কোন কার্য্য করি নি।... ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও পরস্পরের বিচ্ছেদ দেখে নিতান্ত দুঃখিত,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> মর্মাহত, লজ্জিত হই। ধর্মে ধর্মে বিরোধ হতে পারে না। কারণ ধর্ম হল মিলনের সেতু আর অধর্ম বিরোধের।[২১]

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে কবি নিজেই বলছেন

> সর্ব প্রথম বলে রাখি আমার স্বভাবে এবং ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নেই। দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই।[২২]

১৩২৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় গোলাম মোস্তফার 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি পাঠ করে কবি ওই পত্রিকার সম্পাদককে লেখেন

> মুসলমানদের প্রতি আমার মনে কিছু মাত্র বিরাগ বা অশ্রদ্ধা নাই বলিয়াই আমার লেখায় কোথাও তাহা প্রকাশ পায় নাই।[২৩]

বর্তমান শতকের গোড়ায় ১৯০৫ সালের ২৬ অক্টোবর কলকাতায় মল্লিকবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে জাতীয়তাবাদী মুসলমান ব্যারিষ্টার আবদুর রসুলের সভাপতিত্বে প্রধানত মুসলমানদের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ জননেতা বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখসহ উপস্থিত ছিলেন। কবি সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মৈত্রী ও মিলনের প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়; কবির নিজের লেখা পরে এক প্রবন্ধে তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উল্লেখ করেন

> হিন্দু-মুসলমান এক হইলে পরস্পরের কত সুবিধা একদিন কোন এক সভায় মুসলমান শ্রোতাদিগকে তাহা বুঝাইয়া বলা হইতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারি নাই যে, সুবিধার কথাটা এ স্থলে মুখে আনিবার নহে। দুই ভাই এক হইয়া থাকিলে বিষয়কর্ম ভালো চলে, কিন্তু সেইটিই দুই ভাই এক থাকিবার প্রধান হেতু হওয়া উচিত নহে। কারণ, ঘটনাক্রমে সুবিধার গতি পরিবর্তন হওয়াও আশ্চর্যজনক নহে। আসল কথা আমরা এক দেশে এক সুখ-দুঃখের মধ্যে একত্রে বাস করি আমরা মানুষ আমরা উভয়েই এক দেশের সন্তান... আমরা ঈশ্বরকৃত সেই ধর্মের বন্ধনবশত শুধু সুবিধা নহে, অসুবিধাও একত্রে ভোগ করিতে প্রস্তুত যদি না হই, তবে আমাদের মনুষ্যত্বে ধিক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সুবিধার চর্চা নহে, প্রেমের চর্চা নিঃস্বার্থ সেবার চর্চা যদি করি তবে সুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা পুরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তাহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব।[২৪]

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৩ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত অন্তত সতেরোটি প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও বিরোধ বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রবন্ধসমূহের একটি তালিকা সংকলন করা যেতে পারে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১. ইংরেজ ও ভারতবাসী
২. ইংরাজের আতঙ্ক
৩. সুবিচারের অধিকার
৪. অবস্থা ও ব্যবস্থা
৫. ব্যাধি ও প্রতিকার
৬. পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণ
৭. সমস্যা (১৩১৫)
৮. সদুপায়
৯. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
১০. লোকহিত
১১. ছোট ও বড়
১২. হিন্দু-মুসলমান (১৩২৯)
১৩. সমস্যা (১৩৩০)
১৪. স্বরাজ সাধন
১৫. স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
১৬. বৃহত্তর ভারত
১৭. হিন্দু-মুসলমান (১৩৩৮)

এসব প্রবন্ধ রচনাবলীতে সংকলিত হয়েছে, তাই আমরা এসব প্রবন্ধের উদ্ধৃতি সংকলন থেকে বিরত রইলাম।

রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সমাজ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ছাড়াও কর্মের মধ্যেও মুসলমানদের স্থান দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে সব ক্ষেত্রে তিনি সফল হন নি। তাঁর একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার উল্লেখ করছি

১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় চালু করার দশ বছর পর ১৯১১ সালে এক মুসলমান অভিভাবক তাঁর পুত্রকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে চেয়েছিলেন। কবি এতে আপত্তির কোন কারণ দেখেননি। তবে সেকালের সামাজিক সংস্কার, ছাত্র ও শিক্ষকের এবং আশ্রমের অন্যতম অছি (ট্রাস্টি) দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাধা আসার আশঙ্কা করে তিনি কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। আবাসিক আশ্রমের শিক্ষক নেপালচন্দ্রকে চিঠি লিখে কোন সাড়া না পেয়ে দ্বিতীয় চিঠিতে কলকাতা থেকে লেখেন

> মুসলমান ছাত্রটির একটি চাকর দিতে তাহার পিতা রাজি অতএব কি এমন অসুবিধা, ছাত্রদের মধ্যে এবং অধ্যাপকের মধ্যেও যাহাদের আপত্তি নাই তাঁহারা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> তাহার সঙ্গে একত্রে খাইবেন।... আপনারা মুসলমান রুটিওয়ালা পর্যন্ত চালাইয়া দিতে চান, ছাত্র কি অপরাধ করিল। এক সঙ্গে হিন্দু মুসলমান কি এক শ্রেণীতে পড়িতে বা একই ক্ষেত্রে খেলা করিতে পারে না?... আধুনিক তপোবনে যদি হিন্দু মুসলমানে একত্রে জল না খায় তবে আমাদের সমস্ত তপস্যাই বৃথা।[২৫]

মুসলমানদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সম্পর্কে মুসলমান সমাজের একাংশের অভিযোগ ও অনুযোগের পেছনে একটি ধারণা ক্রিয়াশীল; তা হল রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সমাজ সম্পর্কে নির্বিকার ছিলেন, তাদের প্রতি কবির হয়তো অবজ্ঞার প্রকাশ তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মে মুসলমান জীবন ও সমাজের অনুপস্থিতি। এই ধারণা ভিত্তিহীন মনে হয়। আমাদের ধারণার সপক্ষে আমি কিছু তথ্য উল্লেখ করি। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন মহাফেজখানায় সংরক্ষিত নথিপত্র, সমকালীন পত্রপত্রিকা, কবির চিঠিপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য কবির প্রতি এসব অভিযোগ সম্পর্কে আমাদের ভিন্ন ধারণায় উপনীত করে।

কবির জীবনের ৩৫ বৎসর বয়স থেকে অর্থাৎ গত শতকের শেষ দশক থেকে আমৃত্যু খ্যাত-অখ্যাত রাজনীতিক, সাহিত্যিক, সাধারণ গৃহবধূ ও শিশু, সমাজের নানা স্তরের মুসলমানদের সঙ্গে কবির সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেছে। কেবল বাঙালি মুসলমান নয়, অন্যান্য প্রদেশের এবং ভিন্ন দেশের মুসলমান ব্যক্তিদের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। তাঁদের সঙ্গে কবির মতামতের আদান প্রদান হয়েছে।

অনেক তথ্য হারিয়ে গেলেও যা খুঁজে পেয়েছি, তার ভিত্তিতে মুসলমান সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের হদিসের কিছু তথ্য উল্লেখ করি। এসব তথ্য সবই নতুন আবিষ্কার নয়, কিছু কিছু ইতোমধ্যেই প্রকাশিত ও প্রচারিত।

আমি এই আলোচনায় যাদের নাম উল্লেখ করবো, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করেছেন, কেউ কেউ পত্রালাপ করেন। অনেকে নিজেদের লেখা বইপত্র পাঠান কবিকে। কবি সকলকেই স্নিগ্ধ সৌজন্যে উত্তর দিয়েছেন। চার-পাঁচ জনের ফটোগ্রাফ দেখেছি কবির সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের চেনা-জানা মুসলমান ব্যক্তিদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা :

স্যার আকবর হায়দরি, আগা খান, স্যার আজিজুল হক, ওস্তাদ আলী আকবর খান, ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল, আবদুল করিম, আবদুল কাদির, আবদুল গাফফার খান, বগুড়ার নবাব আবদুস সোবহান চৌধুরী, স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হোসেন, আ কা শ নূর মোহাম্মাদ, আ ন ম বজলুর রশীদ, ডাঃ আর আহমদ, ওস্তাদ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আলাউদ্দীন খান, আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, আসফ আলী (রাষ্ট্রদূত, গীতাঞ্জলি ও চিত্রার অনুবাদক), ওস্তাদ আয়েত আলী খান, একরামউদ্দীন, এয়াকুব আলী চৌধুরী, স্যার এ এফ রহমান, এ এ আজম, নবাব স্যার ওয়াসিফ আলী মির্জা, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী কাদের নওয়াজ, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী মোতাহার হোসেন, খাজা নাজিমউদ্দীন, খান মোহাম্মদ মঈনুউদ্দীন, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্‌দীন, জাহানারা চৌধুরী, মৌলানা জিয়াউদ্দীন, জেবুন্নেসা জামাল, খান বাহাদুর তসদ্দক আহমদ, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, শেষ নিজাম (হায়দরাবাদ), ফজলুল হক, ফিরদৌস করিম (গল্প ও ডাকঘর অনুবাদিকা), ফেরদাউস খান, বন্দে আলী মিয়া, মহীউদ্দীন, মামুন মাহমুদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মোজাম্মেল হক (ভোলা), অধ্যাপক মহম্মদ হাবীব, রেজা শাহ পাহলভী, রেজাউল করীম, শাহেদ সোহরাওয়ার্দী, শামসুন্নাহার মাহমুদ, নবাব শামসুল হুদা (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি), সাজ্জাদ জহির (ফ্যাসিবিরোধী কমিটি), সারা তৈফুর, সুফিয়া কামাল, সৈয়দ মুজতবা আলী, স্যার আবদুল হালিম গজনবী, ডঃ হাসান সোহরাওয়ার্দী, হুমায়ুব কবির।

এসব ব্যক্তিত্ব ছাড়াও আরো অন্তত ২০ জনের নাম পাওয়া গিয়েছে যাঁদের সঙ্গে কবির যোগাযোগ ঘটেছিল। এখানে যে ৬২ জনের উল্লেখ করলাম তাঁদের সঙ্গে কবির পরিচয়ের সূত্র তাঁদের মধ্যে অনেকের কাছে লেখা কবির চিঠিপত্রাদি নিয়ে ভিন্ন প্রবন্ধ রচতি হতে পারে। এঁদের সঙ্গে কবির যে যোগাযোগ ঘটেছিল, তার সাহিত্যিক গুরুত্ব বিচারে নয়, সামাজিক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিবেচনায় এ বিষয়ে গবেষণার সুযোগ আছে।[২৬]

তথ্যসূত্র

১-৩. আবদুল হক (সম্পাদিত), *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী* (১ম খণ্ড), ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৫০২।

৪. কাজী আবদুল ওদুদ, "রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ" ঐ।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, *রবি-পরিক্রমা*, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ. ৬৩-৯৩।

আবুল ফজল, "বাঙলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ", *সওগাত*, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৪৮

"রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ" *দোলনা*, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, "গল্পগুচ্ছের মুসলিম চরিত্র", *সমকাল*, রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৬১।

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, "রবীন্দ্রচেতনায় মুসলিম সমাজ ও জীবন", *ভাষা-সাহিত্য পত্র* (১০ম সংখ্যা), ১৩৮৯।

গোলাম মোস্তফা, "ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ", *আমার চিন্তাধারা*, ঢাকা, ১৯৬৮।

হুমায়ুন আজাদ, *রবীন্দ্রনাথ-প্রবন্ধ রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা*, ঢাকা, ১৯৭৩।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ, "স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু বিরুদ্ধ কি?", *দেশ*, কলকাতা, ১ মে ১৯৯৯।

অমিতাভ চৌধুরী, *ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, ১৪০০।

গৌরী আইয়ুব, "হিন্দু-মুসলমান বিরোধ রবীন্দ্রনাথের চোখে", *চতুরঙ্গ*, কলকাতা, পৌষ ১৩৯৪।

৫. ভূঁইয়া ইকবাল, *রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র*, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৫, পৃ. ১৬৮।

৬. ঐ, পৃ. ১৬৯।

৭. অমিতাভ চৌধুরী, *"ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ"*, কলকাতা, ১৪০০, পৃ. ৩।

৮. ঐ, পৃ. ২।

৯. শোভন সোম এই তথ্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। *রবীন্দ্রভাবনা* (সন্তোষচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা), কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১১৩-১৫৩।

১০. মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস, *ভারতী*, শ্রাবণ ১৩০৫। দ্র. আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (নবম খণ্ড) কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৪, পৃ. ৪৯৪-৪৯৮।

১১. উদ্ধৃত, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের দশ দিশারী*, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

১২. *'ভারতী'*, ২৪ বর্ষ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৭, পৃ. ৬২০-২৪।

১৩. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, (অষ্টাবিংশ খণ্ড, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৭৪৫-৭৪৭।

১৪. "বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা প্রবেশিকা পাঠ্য" উদ্ধৃত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ* (২য় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৪৯৬-৪৯৮।

১৫. ভূঁইয়া ইকবাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১।

১৬. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, (অষ্টাবিংশ খণ্ড), পৃ. ৬১৯-২০।

১৭. ঐ, পৃ. ৬২১-৬২২।

১৮. ঐ, পৃ. ৬২০।

১৯. "বাংলার নৃশংস তাণ্ডব"/রবীন্দ্রনাথের আবেদন; *পুষ্পপাত্র*, বর্ষ ৫ সংখ্যা ৬, আশ্বিন ১৩৩৮, পৃ. ৫৭৬।

২০. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৪।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২১. *অভিযান*, ঢাকা ভাদ্র ১৩৩৩; উদ্ধৃত প্রবাসী, ২৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৩৩; পৃ. ৭০৭-৭০৮।

২২. রবীন্দ্র-রচনাবলী, (অষ্টাবিংশ খণ্ড), পৃ. ৬১৯।

২৩. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র* (১৮৩১-১৯৩০), ঢাকা, ১৯৬৯। উদ্ধৃত, ভূঁইয়া ইকবাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

২৪. উদ্ধৃত, প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী* (৫ম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৯০ পৃ ২৭৩।

২৫. উদ্ধৃত, ঐ (ষষ্ঠ খণ্ড) ১৯৯৩ পৃ. ২৪৭।

২৬. উল্লিখিত ব্যক্তিদের অনেকের সঙ্গে কবির সম্পর্কের খতিয়ান সংকলন করেছি *রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র* (ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৫) গ্রন্থে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

প্রবোধচন্দ্র সেন

ভারতবর্ষের দুই প্রধান সমস্যা, ভাষাসমস্যা ও হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা। অখণ্ড বাংলাদেশের (তথ্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের) প্রধান সমস্যা একটাই, সেটি আমাদের দুই প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের সমতা বা সমন্বয়-বিধানের সমস্যা। কি পূর্ব কি পশ্চিম, দুই বাংলার এটাই সবচেয়ে জটিল সমস্যা। এই সমস্যার হিমশৈলে আহত হয়ে আমাদের জাতীয় তরণী সহসা দ্বিখণ্ডিত হয়ে আজ লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে চলেছে নির্মম ইতিহাসের খরস্রোতে। এই অসহায় অবস্থাটা যে-কোনো চিন্তাশীল দেশপ্রেমিককে সবচেয়ে বেশি পীড়িত করে। বলা বাহুল্য, কোনো প্রকার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারাই এর প্রতিকার সম্ভব নয়। কারণ এটা আসলে সামাজিক সমস্যা এবং এর শিকড় নিহিত রয়েছে দীর্ঘকালের ইতিহাসের মধ্যে। এর ঐতিহাসিক স্বরূপ নিরূপণ না করে শুধু তুকতাক বা হাতুড়ে চিকিৎসার দ্বারা এই ব্যাধির প্রতিকারের আশা দুরাশা মাত্র। আজ পর্যন্ত কেউ এই সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ ও তার মূল কারণ নিরূপণে এবং তার প্রতিকারের উপায় উদ্‌ভাবনে প্রয়াসী হয়েছেন বলে জানি না। অথচ আমাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এই কাজেই ব্রতী হওয়া উচিত ছিল সর্বাগ্রে। তার মূল কারণ এ বিষয়ে আমাদের প্রায় সর্বজনীন ঔদাসীন্য, অথবা জ্ঞাতসারেই হক বা অজ্ঞাতসারেই হক, উভয় পক্ষের মনের সুগভীর ও ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের দেশে পুরোপুরি নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক মননপরায়ণতার বড়ই অভাব। বলা যায় এ বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। তিনি কখনও এ বিষয়ের সামগ্রিক আলোচনায় প্রয়াসী হন নি। বিভিন্ন সময়ে নানা উপলক্ষে তিনি এ বিষয়ে যেসব মত প্রকাশ করেছেন তার থেকেই তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নানা রচনায় এ বিষয়ে তাঁর যেসব মন্তব্য বিকীর্ণ হয়ে আছে সেগুলিকে একত্র সংকলন করে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে এ বিষয়েও তাঁর মনোভাবের ক্রমপরিণতি আছে এবং সে পরিণতি সম্পূর্ণ

~ www.amarboi.com ~
নিরপেক্ষতার দিকে। শুধু তাই নয়, তাঁর চেষ্টা এই সমস্যার ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল সন্ধানের দিকে। রবীন্দ্রভাবনার এই দিকটার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে হলে একটি নাতিক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করতে হয় এবং তার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য এ বিষয়ে রবীন্দ্রচিন্তার ঐতিহাসিক পরিবেশের একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়া। যে সামাজিক ও মানসিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছিল তার পরিচয় না পেলে তাঁর পরিণত মনোভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক কি রকম ছিল সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য জানা যায় তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধে (১৩৪০ শ্রাবণ) থেকে। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি এই—"সে (মুসলমান) যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল। কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাধা মতের।... মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে, কিন্তু তার বিষয়বস্তু কিংবা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখি নে।" অর্থাৎ দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করলেও সামাজিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের প্রতি উদাসীন ও প্রায় নিঃসম্পর্ক হয়েই রইল। "দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় নি তা নয়, কিন্তু তা সামান্য।" বহু শতাব্দী কাটল এভাবেই। অবশেষে ইংরেজ রাজত্বকালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। কিন্তু সে পরিবর্তনটাও সুফলপ্রসূ হল না। মুসলমানরা দীর্ঘকালের রাজক্ষমতা হারিয়ে ইংরেজ জাতি, ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ হয়ে তাঁদের সনাতন ধর্মসংস্কৃতিকেই আঁকড়ে রইল। আর হিন্দুরা দীর্ঘকালের মুসলমান রাজত্ব থেকে নিস্কৃতি পেয়ে ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত শান্তিশৃঙ্খলাকে আশীর্বাদ বলেই গ্রহণ করল এবং শাস্ত্রীয় বিধিবিধানকে উপেক্ষা করে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বরণ করে নিতে দেরি করল না। ফলে মুসলমানরা মক্তব-মাদ্রাসার চৌহদ্দির মধ্যেই আটকা পড়ে রইল। আর হিন্দুরা স্কুল-কলেজী শিক্ষার সহায়তায় প্রভাব-প্রতিপত্তিতে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল। এভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবধান ও অসমতা বেড়ে গেল। এই ব্যবধান ও অসমতা স্বভাবতই তাদের মানসিকতাতেও প্রতিফলিত হল। দুষ্মন ইংরেজকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নেবার ফলে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানের স্বাভাবিক বিরূপতা ক্রমে দৃঢ়তর হতে লাগল। আর হিন্দুরাও মুসলমানকে অবাঞ্ছিত বিধর্মী ও বিদেশী বলে গণ্য করতে লাগল। আর হিন্দু কলেজ, হিন্দু হস্টেল, হিন্দুমেলা প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানকে 'হিন্দু' নামে চিহ্নিত

~ www.amarboi.com ~

করে কার্যত মুসলমানকে বহিষ্কৃত করার ফলও ভাল হতে পারে না। মুসলমানের প্রতি এই অবজ্ঞার মনোভাব তখনকার হিন্দুরচিত সাহিত্যেও কিছু প্রতিফলিত হয়েছিল। যেমন, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ('কানপুরের যুদ্ধজয়')—

কেবলি মর্জি তেড়া, কাজে ভেড়া মাথা যত।
নরাধম নীচ নাই নেড়েদের মত॥

এখানে যে অতিমাত্র উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে তা কিছু পরিমাণে বিপক্ষের প্রতি যুদ্ধকালীন বিদ্বেষের ফল। কিন্তু পুরোপুরি তা নয়। স্বাভাবিক বিরূপতার সঙ্গে যুদ্ধকালীন বিদ্বেষ মিলে এই উগ্রতার প্রকাশ ঘটেছে।

কানপুরের যুদ্ধের প্রায় দশ বছর পরে হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা (১৮৬৭)। এই মেলা চলে অন্তত চোদ্দ বছর (১৮৮০ পর্যন্ত)। এই মেলা বাঙালির জাতীয় জীবনে একটা বড় রকমের আলোড়ন আনে, বস্তুত বাঙালির ইতিহাসের গতিকে মোড় ফিরিয়ে দেয় একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। অথচ এই মেলায় মুসলমানের কোনো স্থান ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম মেলার নবম অধিবেশন (১৮৭৫)। এই অধিবেশনে ওস্তাদ মৌলা বক্সের সংগীত সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। তার কারণ সম্ভবত এই যে, মৌলা বক্স ছিলেন বরদা রাজ্যের অধিবাসী এবং হিন্দু সংগীতের অনুরাগী। তাই হিন্দুমেলায় যোগ দিতে তাঁর মনে দ্বিধা ছিল না।

হিন্দুমেলার নামান্তর ছিল 'জাতীয় মেলা' অর্থাৎ হিন্দুর জাতীয় মেলা বা হিন্দুজাতির মেলা। বার্ষিক হিন্দুমেলার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে তার সঙ্গে যুক্ত ছিল তার একটি মাসিক কর্মসমিতি, নাম 'জাতীয় সভা' (National Society)। "হিন্দুজাতির সর্বশ্রেণীর মধ্যে জাতীয় ভাবের বর্ধন এবং... উন্নতিসাধন করাই এই সভার মূল উদ্দেশ্য। অন্যূন এক মুদ্রা বার্ষিক দান করিলে হিন্দু নামধারী মাত্রেই এই সভার সভ্যতাপদের অধিকারী হইবেন।" আর হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল— 'সর্ব-সাম্প্রদায়িক হিন্দু'র স্বজাতীয় সর্বপ্রকার উন্নতিপক্ষে উৎসাহদান ও উপায় অবলম্বন। 'সর্ব-সাম্প্রদায়িক' হিন্দু বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভার অন্যতম প্রধান উদ্‌যোক্তা মনোমোহন বসুর একটি উক্তি থেকে। তাঁর মতে হিন্দুমেলা হবে এমন একটি মিলনস্থল যেখানে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক-নির্বিশেষে ভারতবর্ষস্থ সর্ব শ্রেণীর হিন্দু ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত মতভেদ ভুলে সকলেই সৌভ্রাত্র ও সৌহৃদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। তা ছাড়া 'নেপালী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী' প্রভৃতি সর্বভারতের হিন্দুরাই এখানে মিলিত হবেন, তা-ও ছিল হিন্দুমেলার উদ্‌যোক্তাদের অভিপ্রায়। অর্থাৎ হিন্দুমেলা ও তার অনুষঙ্গ জাতীয় সভায় মুসলমান, খৃস্টান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
প্রভৃতি অহিন্দুর কোনো স্থান ছিল না। সুখের বিষয় তখনকার দিনেও অনেকেই ভারতবর্ষের জাতীয়তা সম্বন্ধে এ-রকম সংকীর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন না। তাঁদের মতে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সব ভারতীয়কে নিয়েই ভারতবর্ষের জাতীয়তা, শুধু বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুকে নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত তাকে কিছুতেই 'জাতীয়' বলা যায় না। হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভার দুই প্রধান নেতা নবগোপাল মিত্র ও মনোমোহন বসু, এঁরা উভয়েই এই মনোভাবের প্রতিবাদ করেন। মনোমোহন বসু তাঁর সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় বলেন, হিন্দুরা একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্রকে 'জাতীয়' বলে অভিহিত করার কোনো আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। ন্যাশনাল পেপার-এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্র বলেন (১৮৭২, ডিসেম্বর ৪)—"We do not understand why our correspondent takes exception to the *Hindoos who certainly form a nation by themselves,* and as such a society established by them can very well be called a National Society." সুতরাং স্বীকার করতেই হবে, হিন্দুমেলার অনুষঙ্গ 'জাতীয় সভা'-কেই উত্তরকালীন 'হিন্দুমহাসভা'র আদিরূপ বলে বর্ণনা করা অন্যায় নয়, আর মহম্মদ আলী জিন্নার বহুনিন্দিত দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবীজ রোপণ করেছিলেন হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভার প্রতিষ্ঠাতারাই। এই দুই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রাণপুরুষ রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণ প্রবন্ধটিও পড়েছিলেন এই জাতীয় সভারই এক অধিবেশনে (১৮৭২, সেপ্টেম্বর ১৫)। তা ছাড়া তিনিই পরবর্তীকালে (১৮৮৬) ইংরেজি ও বাংলায় লিখিত 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামে এক পুস্তকে 'মহা-হিন্দুসমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার বিবরণ দেন। এই মহা-হিন্দুসমিতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজনীতি ক্ষেত্রেও হিন্দুজাতির অধিকার রক্ষা ও উন্নতিসাধন। এখানে সেই হিন্দুসভারই পূর্বাভাস সূচিত হল। ১৮৮১ সালে রাজনারায়ণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে বলেন—"মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত ভূমিখণ্ড কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেরূপ হিন্দুসমাজই আমাদিগের কার্যের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষ... যেরূপ উন্নত অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, পুনরায় সেই অবস্থা লাভ করিতে আমরা সমস্ত হিন্দুজাতিকে উত্তেজিত করিব। যাহাতে... রাজপুতানার বীর-কুলচূড়ামণি প্রতাপ সিংহের সময় পর্যন্ত ভারতের মহিমার প্রধান কথা অবলম্বন করিয়া হিন্দুজাতি উন্নতির মঞ্চে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় আমরা প্রাণপণে এরূপ চেষ্টা করিব। যাহাতে হিন্দুগণ ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হয়, যাহাতে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী প্রভৃতি হিন্দুবর্গ

~ www.amarboi.com ~
এক হৃদয় হয়, যাহাতে তাহাদের সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য ধর্মসংগত বৈধ সমবেত চেষ্টা হয়, তাহাতে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব।" এই হল তৎকালীন হিন্দু জাতীয়তার মূল কথা।

সেকালে ঠাকুর পরিবারেও এই হিন্দু জাতীয়তার হাওয়া প্রবল ছিল। হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা স্থাপনের মূলে ছিল ঠাকুর পরিবারেরই সহায়তা ও সমর্থন। হিন্দুমেলা তথা জাতীয় সভার প্রথম দুই সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের বিভিন্ন উক্তিতে বারবারই 'হিন্দুজাতি' কথাটা উচ্চারিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারত-সন্তান' ইত্যাদি বিখ্যাত জাতীয় সংগীতটি তো আসলে হিন্দু ভারতেরই জয়গান। তাতে ভীষ্ম-দ্রোণ থেকে পৃথ্বীরাজ পর্যন্ত বীরদের কীর্তি মহিমা উদগীত হয়েছে। তার পরেই 'যবনের' আবির্ভাবের ফলে 'অধীনতা আনিল রজনী'। অর্থাৎ বৈদেশিক বিজেতা মুসলমানের হাতেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও কীর্তিগৌরব বিনষ্ট হয়। সেই স্বাধীনতা ও গৌরব ফিরিয়ে আনাই যেসব প্রতিষ্ঠানের (হিন্দুমেলা, জাতীয় সভা তথা রাজনারায়ণের সঞ্জীবনী সভা) লক্ষ্য, স্বভাবতই বিজেতৃজাতীয় মুসলমানকে সেসব প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা চলে না।

কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের মনোজীবন গড়ে উঠেছিল এই হিন্দু জাতীয়তাবোধের পরিমণ্ডলেই। তাঁর প্রথম জীবনের অনেকগুলি কবিতাতেই তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। এখানে শুধু দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়াই যথেষ্ট। 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতায় (১৮৭৫) দেখি রাজা যুধিষ্ঠির আর্য-সিংহাসনে বসে স্বাধীন ভারতে যে স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারই মোহময় কল্পনায় বালক রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত বিভোর হয়ে আছে। আবার দেখি এই ভারতভূমিতে বিগত কালের মহিমামণ্ডিত রামরাজত্ব ফিরিয়ে আনার জন্যও কবি-হৃদয় ব্যাকুল হয়ে আছে।—

শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার
শাসিতেন হায়, এ ভারতভূমি,—
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে!

সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় তিনিও প্রাচীন হিন্দুভারতের শেষ বীর হিসাবে পৃথ্বীরাজের নাম উল্লেখ করতে ভোলেন নি। তবে এ কবিতায় বালক রবীন্দ্রনাথ তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা দুর্গাবতীর নাম উল্লেখ করে হিন্দুভারতের গৌরবযুগকে আর একটু প্রসারিত করেছেন। হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতায় (১৮৭৭) আছে—

এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরী,
স্বর্গরসাতল জয়নাদে ভরি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগে নি ইত্যাদি।

এর থেকেও বোঝা যায় তখনকার দিনে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মতে মুসলমান বিজেতাদের আক্রমণেই ভারতীয় স্বাধীনতা ও গৌরবযুগের অবসান ঘটে। সেকালে অনেক হিন্দুর মনই প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণের নানা প্রকার কল্পিত গৌরব স্মৃতিতে পরিপূর্ণ থাকত। 'আর্য তেজ গর্বভরে পৃথ্বী থরথর', রবীন্দ্রনাথের এই উত্তরকালীন উক্তিটি প্রধানত এইকালের পক্ষে প্রযোজ্য।

পূর্বে বলেছি 'জাতীয় সভা' প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালেই কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, শুধু হিন্দুকে নিয়ে গঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানকে 'জাতীয়' বিশেষণে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। এই মনোভাবের লোক তখনকার দিনে বিরল ছিল বলেই মনে হয়। তবু অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতেন এমন দু-এক জনের কথা কিছু বলা প্রয়োজন। আলোচ্য বিষয়টাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক. পৃথ্বীরাজের পরবর্তী বহু শতাব্দীব্যাপী মুসলমান-রাজত্বকালকে ভারতবর্ষের পরাধীনতার কাল বলে চিহ্নিত করা সঙ্গত কিনা? দুই. আধুনিককালে মুসলমানকে ভারতীয় জাতীয়তার অঙ্গ বা অংশভাগ বলে গণ্য করা যায় কিনা? এই দুই বিষয়ে প্রথমেই বহুনিন্দিত বা বহুবিতর্কিত বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ইতিহাসপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের দেশে খুব কমই জন্মেছেন। ইতিহাসপ্রজ্ঞার দৃষ্টিতে তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মগত পার্থক্যটা কখনও প্রাধান্য পায় নি। প্রাধান্য পেয়েছে সামগ্রিকভাবে দেশের জনকল্যাণের প্রশ্নটা। তাই তিনি তাঁর 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১২৮০ ভাদ্র) বলেছেন—যে রাজ্য পরজাতি পীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন। অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে।... পক্ষান্তরে, কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে। যথা, নর্মানদিগের সময়ে ইংলন্ড, ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষ। আমরা কুতবউদ্দীনের অধীন উত্তর-ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।" দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ভারতবর্ষের মুসলমান-রাজত্বকালকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরাধীনতার কাল বলা সংগত নয়।

সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে শুধু বাংলা দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত কি, তা-ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ) তাঁর একটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ওই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দশা ঘটে স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে

~ www.amarboi.com ~

বাঙ্গালার সে দুর্দশা ঘটে নাই। রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না।... পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক স্ফূর্তি নিবিয়া যায়। পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্তা রঘুনাথ শিরোমণি; এই সময়ে স্মার্ততিলক রঘু-নন্দন; এই সময়েই চৈতন্যদেব; এই সময়েই বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের অপূর্ব গ্রন্থাবলী :—চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খৃস্ট শতাব্দীর মধ্যেই ইহাদের সকলেরই আবির্ভাব। এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।" স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বাংলাদেশের এই দুই শতাব্দীব্যাপী মুসলমান-রাজত্বকালকে বঙ্কিমচন্দ্র পরাধীনতার যুগ বলে চিহ্নিত করেন নি। বরং স্বাধীনতার যুগ তথা পরম গৌরবের যুগ বলেই স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও স্পষ্ট করেই বলেছেন—"অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আকবরকে আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ। মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ্ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠানই আমাদের মিত্র।... বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগলকর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীর্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্তির চিহ্ন পাওয়া যায়।... কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোনো কীর্তি কেহ দেখিয়াছে?" আধুনিক কালের বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেকটি উক্তি পুরোপুরি সত্য বলে গণ্য না হতে পারে, কিন্তু তাঁর উদার মনোভঙ্গি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। সে মনোভঙ্গিকে আর যাই বলা যাক, সংকীর্ণ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বা হিন্দু জাতীয়তার মনোভঙ্গি বলা যায় না।

১৮৮০ সালে লেখা 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধেও (বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ অগ্রহায়ণ) বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপ কথাই লিখলেন—"মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগমাত্র হইয়াছিল।" দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতা সম্বন্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদীর মনোভাব যে বঙ্কিমচন্দ্র পোষণ করতেন না, তাতে লেশমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। পাঠান ও মুসলমান, মোগলও তাই। কিন্তু বঙ্কিমের মতে পাঠানদের আমলে বাংলা স্বাধীন ছিল, মোগলদের আমলে পরাধীন। আ[illegible] আকবর প্রমুখ মোগলের শাসনে ভারতবর্ষ ছিল

স্বাধীন, কিন্তু তাঁদের শাসনকালেই বাংলাদেশ ছিল পরাধীন, হৃদসর্বস্ব। অর্থাৎ বঙ্কিমের মতে দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতার বিচারে শাসকের জাতি বা ধর্ম বিবেচ্য বিষয় নয়, দেশের কল্যাণ-অকল্যাণই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। সম্রাট আকবরের শাসন সামগ্রিকভাবে উত্তর ভারতের পক্ষে কল্যাণকরই হয়েছিল, তাই আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলতে বঙ্কিম দ্বিধাবোধ করেন নি। 'পক্ষান্তরে এই আকবরই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন', এ কথাও তিনি সমান জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। কারণ তাঁর মতে আকবরের বঙ্গবিজয় বাঙালির পক্ষে কল্যাণকর হয় নি।

এবার আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাক বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তৎকালীন হিন্দু জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত হতে পেরেছিল কিনা। মীর মশাররফ হোসেনের 'গোরাই ব্রিজ' অথবা 'গৌরীসেতু' নামক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১২৮০ পৌষ) লেখেন, "তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না।... বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ, একা হিন্দুর দেশ নহে। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যত দিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাহাদের ভাষা নহে... ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।" দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাংলাদেশ যেমন একা হিন্দুর দেশ নয়, তেমন শুধু হিন্দুকে নিয়েই বাঙালি জাতি গঠিত নয়। বাংলাদেশ যেমন হিন্দু-মুসলমানের দেশ, বাঙালি জাতিও তেমনি হিন্দু-মুসলমানের জাতি। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রয়াস ছাড়া বাঙালি জাতির প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নেই। 'উচ্চ শ্রেণীর' মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বহুবাঞ্ছিত বাঙালি জাতীয়তার প্রধান অন্তরায়। দুঃখের বিষয় ঠিক সে সময়েই অঙ্কুরিত হল হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা-লালিত হিন্দু জাতীয়তাবোধের বিষবৃক্ষ। সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ছিল বাঙালি জাতীয়তাবোধের প্রাধান্য। একদিকে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের স্বাতন্ত্রবোধ এবং অপরদিকে নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু ও রাজনারায়ণের প্রচেষ্টায় নবোদ্‌ভূত হিন্দু জাতীয়তার আদর্শ। এই দুই-ই হয়েছিল বঙ্কিম-লালিত বাঙালি জাতীয়তা বিকাশের প্রধান অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথ যে অনতিকালের মধ্যেই এই বাঙালি জাতীয়তার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার বহু নিদর্শন আছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। এখানে সে প্রসঙ্গের উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন।

'আর্যদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণও (১৮৪৫-১৯০৪) তৎকালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর এই বিরোধিতা ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

বঙ্কিমের চেয়ে স্পষ্টতর। তা ছাড়া তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরই পক্ষপাতী। এখানে তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করে দিলেই তাঁর এই অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ কত গভীর ছিল তা বোঝা যাবে। হিন্দুমেলার সংকীর্ণতা তাঁকে কতখানি মর্মপীড়া দিত তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর এই উক্তিতে—"বিংশতি কোটি ভারতবাসী যদি বৎসরে অন্ততঃ একদিনও জাতি, ধর্ম, সমাজের পার্থক্য ভুলিয়া ভ্রাতৃভাবে একত্র মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে জানিতে পারিব যে ভারতের সৌভাগ্যসূর্য উদিত হইতে আর বিলম্ব নাই।... আমরা মেলার অধ্যক্ষদিগের নিকট করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই, তাঁহারা যেন এই মেলাকে কোনো সংকীর্ণ ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত না করেন। আমাদিগের ভিক্ষা তাঁহারা যেন এই মেলাকে এখন হইতে 'হিন্দুমেলা' নাম না দিয়া ভারতমেলা নাম দেন। যেন ইহা এখন হইতে ভারতবাসী মাত্রেরই উৎসবস্থল হয়। হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি ইহাতে যোগ না দেন—আমরা কাঁদিব। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয় কোনো ভ্রাতার বিরুদ্ধে ইহার দ্বার অবরুদ্ধ রাখিব না। আমরা সকলকেই ইহার অভ্যন্তরে আহ্বান করিব। আমরা কোনক্রমেই দলাদলির ভিতর যাইব না। দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। যে দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ আমাদিগের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা আর তাহার শরণাপন্ন হইব না।" এই উক্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি তা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু হিন্দুমেলাকে ভারতমেলায় রূপান্তরিত করার জন্য যোগেন্দ্রনাথের এই যে সনির্বন্ধ প্রার্থনা, সেকালে ওই মেলার নেতৃবর্গ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। আমরা কি আজ তার বিষময় ফল ভোগ করছি না?

যোগেন্দ্রনাথের প্রার্থিত 'ভারতমেলা' প্রতিষ্ঠিত হল না বটে, কিন্তু কিছুকালের মধ্যে অনুরূপ আদর্শের প্রেরণায় স্থাপিত হল একটি নূতন সংঘ, নাম ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা 'ভারতসভা' (১৮৭৬, জুলাই ২৬)। এই ভারতসভাকে সানন্দ অভিনন্দন জানিয়ে যোগেন্দ্রনাথ লিখলেন—"যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসীর প্রত্যেকে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে শিখেন,... যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসী জাতি, ধর্ম, সমাজ ভুলিয়া এক রাজনৈতিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে শিখেন... সেই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত ১২ই শ্রাবণ বুধবার কলিকাতা মহানগরীস্থিত আলবার্ট হলে 'ভারতসভা' নামক এক নূতন রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিন ভারতের পুনর্জন্মদিন। এই দিনে সমস্ত ভারতে এক অপূর্ব রাজনৈতিক ধর্ম প্রতিষ্ঠাপিত হইল।... এ ধর্মে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-জৈন, সেশ্বর-নিরীশ্বর, সাকার-নিরাকার, খ্রীষ্টান-হীদেন সকলই সমান। এই জন্যে ভারতসভা সকলকেই ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে। ভারতবাসী! হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, সীক! আপনারা সকলেই এই সভায় যোগ দিউন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখিবেন, ভারতের সুখসূর্য অচিরাৎ সমুদিত হইবে।" ভারতসভা প্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভার স্বীকৃত হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রত্যাখ্যাত হল এবং হিন্দুমেলার মুখ্য নায়ক নবগোপাল মিত্রও এই নূতন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন, এমন কি তার অন্যতম অধ্যক্ষরূপেও বৃত হলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব নিঃশক্তি বা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল না। বরং নানা কারণে তার শক্তি ও ব্যাপ্তি ক্রমে বেড়েই চলল। তাই দেখি 'ভারতসভা' স্থাপনের পরবর্তী কালে যোগেন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় জাতীয়তাবাদেও পরোক্ষভাবে একটু সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়া লেগেছে। যোগেন্দ্রনাথ, 'গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' গ্রন্থের (১৮৯০) 'উদ্‌বোধন' অংশে লিখলেন—"শিবাজীও একদিন হিন্দুধর্মের রক্ষার জন্য ভবানী ও ভবানীপতির ঘোরতর আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ও তদীয় মহারাষ্ট্রীয় জাতির 'হর হর বোম্ বোম্' রবে একদিন সমস্ত ভারত উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই মহতী সাধনার বলে একদিন মহারাষ্ট্রীয় শক্তি ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়াছিল।... এস ভাই! আবার একবার পঁচিশ কোটি ভারতবাসী অসংখ্য সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া সকলে মিলিয়া সেই দেবদেব ভগবানের নামকীর্তন করি। একবার এই জাতীয় দুর্গতির দিনে প্রাণ খুলিয়া তাঁহার নিকট দুঃখ জানাই। এস, আর দেরি করিও না। সময় আসিয়াছে। সকলে গগন বিদারিয়া গাও 'বন্দে মাতরম্', 'বন্দে হরিচরণারবিন্দম্'। স্বদেশানুরাগ ভগবদ্‌ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভারতে আবার নবযুগের উৎপত্তি করুক।" এই যে স্বদেশানুরাগের সঙ্গে ধর্মের মিশ্রণ, এখানেই নিহিত ছিল ভবিষ্যৎ বিষবৃক্ষের বীজ। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর উত্তরজীবনে ধর্মানুরঞ্জিত স্বদেশভক্তির পক্ষপাতী হয়েছিলেন। এখানেই আসে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রশ্ন। এই ধর্মপ্রতিষ্ঠ স্বদেশপ্রীতির মধ্যেই সূচিত হল ভাবী কালের ধর্মানুগত দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা দেশবিভাগের পূর্বাভাস। তা ছাড়া, যোগেন্দ্রনাথের এই শেষের উক্তিগুলি কি প্রায় অনিবার্যরূপেই বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত শিবাজী-উৎসব, ভবানী-মন্দির পরিকল্পনা এবং হিন্দুধর্মাশ্রিত বিপ্লবপ্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না! সবচেয়ে বড় কথা হল, নানা দিক থেকে হিন্দু জাতীয়তার নব-অভ্যুদয়ের এই যে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, তাতে স্বতঃই হক বা ইংরেজ সরকারের ইঙ্গিতেই হক অথবা দু-এর মিলিত প্রভাবেই হক দেশে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধও ক্রমেই প্রবল ও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং ফলে লর্ড কারজনও বাংলাবিভাগে উৎসাহিত হয়েছিলেন।

সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের প্রতি যতখানি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তার চেয়ে কম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাঁর উপরে বঙ্গদর্শনের প্রভাবও হিন্দুমেলার চেয়ে কম ছিল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন যোগেন্দ্রনাথের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্পাদিত আর্যদর্শনেরও গভীর অনুরাগী পাঠক। ফলে তাঁর হৃদয় ক্রমশঃ পূর্বতন হিন্দু জাতীয়তার আদর্শ ছেড়ে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তা তথা ভারতীয় জাতীয়তার প্রতি আকৃষ্ট হল। তাঁর মনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয়তার আদর্শই ক্রমে প্রবল হয়ে উঠল। ১৮৯২ সালে ইংরেজ সরকার যে শাসন সংস্কার আইন প্রবর্তন করেন তার মধ্যেই প্রথম হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক জীবন রাজনৈতিক বিচ্ছেদের বীজ বপন করা হল। তার কিছুকাল পরেই রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ (সাধনা, ১৩০০ আশ্বিন-কার্তিক)। প্রবন্ধটি পঠিত হয় চৈতন্য লাইব্রেরিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে। সভায় পঠিত হবার পূর্বেই এটি বঙ্কিমচন্দ্রের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। এই প্রবন্ধে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আজকাল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে, আমরা আপনাদের মধ্যে তাহা লইয়া... কি গোপনে বলি না যে, এই উৎপাতের প্রধান কারণ ইংরাজরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না।... ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশি করিয়া বপন করিয়াছে। ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছে এমন নাও হইতে পারে; কিন্তু আকবর যে-একটি প্রেমের আদর্শে খণ্ড-ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইংরাজের পলিসির মধ্যে সেই আদর্শটি নাই বলিয়াই এই দুই জাতির স্বাভাবিক বিরোধ হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে।" এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন—"একজন মহদাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ (আকবর) যে অত্যুচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, একটি সমগ্র জাতির (ইংরেজের) নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না।"

আকবরের আদর্শ কি ছিল তার পরিচয়দান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আকবর সকল ধর্মের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া যে-একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয় মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত, নিষ্ঠার সহিত, হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান পারসি ধর্মজ্ঞদিগের ধর্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও তিনি হিন্দু রমণীকে অন্তঃপুরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রিসভায়, হিন্দু বীরগণকে সেনানায়কতায় প্রধান আসন দিয়াছিলেন। তিনি কোন রাজনীতির দ্বারা নহে, প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন।"

হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই যে উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তা সর্বতোভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের সানন্দ অনুমোদন লাভ করেছিল এ কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের অসাম্প্রদায়িক উদার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মনোভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহ ছিলেন বলেই তিনি তাঁকে ওই বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছিলেন। আকবর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোল্লিখিত সশ্রদ্ধ মনোভাবের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং আকবরের উদার রাজনীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব দীর্ঘকাল পরে প্রকাশ পেয়েছে স্পষ্টতর ও গভীরতর রূপে তাঁর 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' প্রবন্ধে (প্রবাসী ১৩২৪ মাঘ)।—"মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন রাষ্ট্রীয় চাঞ্চল্যের ভিতরে ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্‌বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগল-সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয়, একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল, অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে ঐক্যের অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।"

এ তো অন্তরের মিলনের কথা। কিন্তু দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল বাইরের সংসারে যেখানে অনৈক্য প্রবল হয়ে ওঠে সেখানে অন্তরের মিলনপ্রচেষ্টাও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। বাইরের সাংসারিক অনৈক্য ও হানাহানি দীর্ঘকাল ধরে দেশটাকে অন্তহীন দুর্দশার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথও তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে তার শেষ বিভীষিকাময় রূপ দেখে যাবার দুর্ভাগ্য তাঁর হয় নি। তিনি নানা উপলক্ষ্যে ও নানা ভাবে এই কঠিন সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন, কারণ নিরূপণও করেছেন; কিন্তু তার সমাধানের কোনো সহজ সূত্র নির্দেশ করতে পারেন নি। কারণ কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তিনি এই সমস্যার যে তিতিক্ষা ও প্রতীক্ষাসাপেক্ষ সমাধানের কথা বলেছেন ('হিন্দু-মুসলমান' ১৩২৯ শ্রাবণ), তা এই—"সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে, হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে।... আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে—ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে—তারপরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই। কারণ, অন্য দেশের মানুষ যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব। যদি না আসি তবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

বলা বাহুল্য আমরা এখনও সংস্কারের গুটি কেটে মুক্ত জ্ঞানের আলোতে বেরিয়ে আসতে পারি নি। কারণ শিক্ষার অবাস্তবতা ও অব্যাপকতা। এ ক্ষেত্রে যে শিক্ষার আলো মনের সংস্কার ঘোচাবার প্রধান সহায়ক, তা হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা। যে ইতিহাস আমরা পড়ি তা আমাদের জীবনপ্রতিষ্ঠ নয়, আমাদের সামাজিক সংস্কারমোচনের সহায়ক নয়। এখানে বলা কর্তব্য বাংলার (পূর্ব ও পশ্চিম) হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং বিহার বা উত্তর প্রদেশের সমস্যা গুরুত্বে ও প্রকৃতিতে এক নয়। সুতরাং বাঙালির এই বিশেষ সমস্যার সমাধান হতে পারে শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসের শিক্ষার আলোকে। সামগ্রিকভাবে ভারত-ইতিহাসের সহায়তায় বাংলার সমস্যা-নিরসন সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গভীরভাবে বাংলায় ইতিহাসচর্চার কোনো ব্যবস্থা এখনও হয় নি, অদূর ভবিষ্যতে হবার কোনো লক্ষণও দেখা যায় না। সুতরাং বলা যায়, বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক সমতাবিধানের আশু সম্ভাবনা নেই। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় বাণীর প্রতিধ্বনি করে বলতে হয়—আমাদের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও বাংলায় ইতিহাসচর্চার ব্যবস্থা চাই, নইলে বাঙালির ভরসা নাই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-মুসলমান ও রবীন্দ্রবাণী

মৈত্রেয়ী দেবী

অনেক দিন ধরে ভাবছি উপরোক্ত প্রসঙ্গ নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করব। উনিশ শ' চৌষট্টি সালে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ' প্রতিষ্ঠার সময় 'হিন্দুমুসলমান ও রবীন্দ্রবাণী' বলে একটি ছোট্ট সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম। পরবর্তীকালে তখনকার পূর্ব-পাকিস্তানে অনেকে সেই পুস্তিকাটি থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এখানেও অনেকের কাজে লেগেছে। ঐ পুস্তিকাটি একেবারেই সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত যখন রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই এমন করে বাঙলাদেশে বাঙালীর হৃদয় উদ্ভাসিত হল। বঙ্গভঙ্গ নিরোধের সেই আশ্চর্য গান যা এক সময়ে বৃটিশ শাসকদের প্রতি উচ্চারিত হয়েছিল তা আজ পাকিস্তানের শাসকদের প্রতিও প্রযোজ্য হল :—"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি, তুমি কি এমন শক্তিমান—তুমি এমন শক্তিমান" প্রমাণ হল "ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে, ওদের আঁখি যত রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে।"

কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গ করেন তখন রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে তার প্রতিরোধে একরকম রাজনৈতিক যুদ্ধে নেমেছিলেন। সেই হয়ত প্রথম ও শেষ তাঁর পথে পথে মিছিল করা; রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃতি বিশিষ্ট এই ধরণের কাজ রবীন্দ্রনাথ পূর্বে বা পরে কখনো করেন নি। কোনো বিষয় নিয়ে উত্তেজনা প্রকাশ, প্রকাশ্যভাবে বহুজনের সম্মুখে উচ্ছ্বাসের আবেগ দেখান, তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ কিন্তু তাঁর "সোনার বাংলা" দুভাগ হয়ে যাচ্ছে এটা তাঁর এতই অসহ মনে হয়েছিল যে এই আবেগ প্রবাহ তাঁকে তাঁর স্বভাবের বাঁধ ভেঙ্গে অভাবনীয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর অল্প দিন পূর্বে অবনীন্দ্রনাথের লিখিত 'ঘরোয়া' বইখানাতে এই সময়কার বর্ণনা পড়ে তিনি স্মৃতিভারে অভিভূত হয়েছিলেন—বঙ্গভঙ্গ নিরোধ আন্দোলন জীবন সন্ধ্যার সেই প্রদোষ আলোতে তার অনুভূতিকে স্পর্শ করেছিল। ১৯৪০ সালে লেখা 'ঘরোয়া'তে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পরে অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ এখানে উল্লেখ করছি। এর [illegible] বোঝা যাবে তখনই

~ www.amarboi.com ~

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তার ভাব ও ব্যঞ্জনার একটা পার্থক্য সুরু হয়েছে। এবং মত পার্থক্যকে মুসলমানেরা উগ্রতার দিকে নিয়ে যাবেন এই ভীতিটি হিন্দুর মনে প্রবল। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত সরল মানুষ রাজনীতিকে ভয় পেতেন, রাজা বাহাদুরকেও ভয় পেতেন—জেলে যাওয়া, আন্দোলন করা, এসব তাঁর কাজ নয়। তিনি লিখছেন :—"তখনকার সেই স্বদেশী যুগে ঘরে ঘরে চরকা কাটা তাঁত বোনা বাড়ির গিন্নী থেকে চাকর বাকর দাস দাসী কেউ বাদ ছিল না... রবি কাকা একদিন বললেন, রাখী বন্ধন উৎসব করতে হবে আমাদের।... ঠিক হল সকাল বেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখি পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব। রবি কাকা বললেন সবাই হেঁটে যাব, গাড়ি ঘোড়া নয়।... রওনা হলুম সবাই গঙ্গা স্নানের উদ্দেশ্যে রাস্তার দু-ধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে শাখ বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।"

এই গানটি সেই সময়েই তৈরী হয়েছিল।...

স্নান সারা হলো—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একগাছা রাখি, সবাই এ ওর হাতে পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরও রাখি পরানো হল। হাতের কাছে ছেলে মেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখি পরানো হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকারা করলেন কী। ওরা যে মুসলমান মুসলমানকে রাখি পরিয়ে এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখি পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব, কাণ্ড দেখে। আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল চীৎপুরের বড় মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখি পরাবেন... এইবারে বেগতিক—আমি ভাবলুম, গেলুম রে বাবা মুসলমানদের রাখি পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হয়ে যায় না!... আমি করলুম কি আর উচ্চবাচ্য না করে যেই না আমাদের গলির মোড়ে মিছিল পৌঁছালো আমি সট্ করে একেবারে নিজের হাতার মধ্যে প্রবেশ করে হাফ ছেড়ে বাঁচলুম... এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে রবিকাকারা সব ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম কী কী হলো সব তোমাদের? সুরেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে, কী আর হবে, গেলুম মস্‌জিদের ভিতরে, মৌলবী টৌলবী যাদের পেলুম হাতে রাখি পরিয়ে দিলুম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি বললুম আর মারামারি? সুরেন বললে মারামারি হবে কেন? ওরা একটু হাসলে মাত্র... যাক বাঁচা গেল! এখন হলে? এখন যাও তো দেখিনি মস্‌জিদের ভিতর গিয়ে রাখি পরাও তো একটা মাথা ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে যাবে।" (ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ)

'এখন' অর্থ ১৯৪০ সাল যখন 'ঘরোয়া' বইটি লেখা হয়েছিল আর 'তখন' অর্থ ১২০৫ সাল যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়। উপরোক্ত মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে মুসলমানদের সম্পর্কে ১৯০৫ সালেও হিন্দুদের মনে একটা ভীতি ছিল যে সমস্ত মতানৈক্য লাঠ্যৌষধি যোগেই তারা সমাধান করে থাকে। সেই ভীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাতার মঙ্গোল তৈমুরলেন চেঙ্গিস খাঁর গল্প কাহিনীর সূত্রে ও পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে স্বার্থের দ্বন্দ্বে মুসলমান নির্দয়তার চূড়ান্ত দেখাতে পারে। এই ধারণার সত্যাসত্য নিরূপণের উপযুক্ত তথ্য আমাদের হাতে নেই তুলনামূলকভাবে প্রমাণ করার প্রয়াস তাই সফল হবে না দূরবর্তী অতীতে নিষ্ঠুরতা, দুর্বলের উপর অত্যাচার ও শারীরীক পীড়নের কাহিনী শোনা যায়। ইংল্যাণ্ডে ম্যাডাম টুসোড্‌ এর মোমের পুতুলগুলিতে এই অত্যাচারের কাহিনী লেখা হয়েছে।

হিন্দু মুসলমানের তুলনামূলক আলোচনায় সমাজ সম্পর্কে নানা ব্যবহারে মুসলমানদের প্রতিই অনুকূল মন্তব্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়। স্বজাতির সমালোচনাাতেই তিনি অনায়াস। কেবল একটি গ্রন্থ সমালোচনাতে তিনি তুলনামূলকভাবে এই প্রসঙ্গে মুসলমান ও খৃষ্টানদের বাসনা কামনার উগ্রতা কি ভাবে তাদের পরপীড়নে আক্রমণশীল করেছে তার আলোচনা আছে।

বইটি, আবুল করিম বি.এ. প্রণীত ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত। প্রথম খণ্ড। রচনাকালের উল্লেখ না থাকলেও অনুমান করা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেই লেখা। তখন এদেশে হিন্দু মুসলমানের পোলেটিক্যাল দ্বন্দ্ব সুরু হয়নি। ঐ গ্রন্থটি সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের অভ্যুদয়কালে ভারতে হিন্দুদের অবস্থা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ঐ সময় অর্থাৎ খৃষ্ট শতাব্দীর আরম্ভ কালে "যে দ্বন্দ্বসংঘাতে চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য সালিবাহন সমস্ত ভারতবর্ষের চূড়ার উপরে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন তাহা কেমন করিয়া একেবারে শান্ত নিরস্ত নিস্তরঙ্গ হইয়াছিল।" যখন মুসলমানরা ভারতের এই অন্ধকার যুগের যবনিকা তুললেন তখন রাজপুতরা "দেশের সমুদয় উচ্চস্থানগুলি অধিকার করিয়া মান অভিমানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধে দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিতেছিল"—

এই সময় যেন ভারতীয় চিন্তার জ্ঞানের ও ধ্যানের আলো প্রচ্ছন্ন, হোমাগ্নি নির্বাপিত, ব্রহ্মবিদ্যা স্তব্ধ। ছোট ছোট রাজন্যদের আত্মাভিমান ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কুসংস্কার, অর্থহীন দর্প, সারা দেশকে এক নিরর্থক জীবনচর্চায় প্ররোচিত করত। ভারতের যখন এই রকম অবস্থা, তখন—

"ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বহুতর খণ্ড বিচ্ছিন্ন জাতি মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচণ্ড আকর্ষণ বলে একীভূত হইয়া মুসলমান নামক এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল তাহারা যেন ভিন্ন ভিন্ন দুর্গম মরুময় গিরি শিখরের উপরে খণ্ড তুষারের ন্যায় নিজের নিকটে অপ্রবুদ্ধ এবং বাহিরের নিকট অজ্ঞাত হইয়া বিরাজ করিতেছিল—কখন প্রচণ্ড সূর্যের উদয় হইল এবং দেখিতে দেখিতে নানা শিখর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তুষারশ্রুত বন্যা একবার একত্রে স্ফীত হইয়া তাহার পরে উন্মত্ত সহস্র ধারায় জগৎকে চতুর্দিকে আক্রমণ করিতে বাহির হইল।"

এই আক্রমণের প্রসঙ্গে ভারতে মুসলমান অভিযানের সময়ে হিন্দু মুসলমানের একটি চরিত্রগত পার্থক্যের আলোচনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে—সেই সময় নব জাগ্রত মুসলমান জাতির "নবীন বল সম্বরণ করিবার উপোযোগী কোনো একটা উদ্দীপনা ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল না"—

তাছাড়া শাস্ত্রের উপদেশ, জীবে দয়া ইত্যাদি নানা কারণে হিন্দুরা মারার চেয়ে মরতেই পটু ছিল। এই সময়ে মুসলমান গরু সামনে নিয়ে যুদ্ধ করেছে আচার ভীরু হিন্দুরা বিনা যুদ্ধে মরেছে।

—"ইতিহাসে দেখা যায়, নিরুৎসুক হিন্দুগণ মরিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মুসলমানেরা যুদ্ধ করিয়াছে আর হিন্দুরা দলে দলে আত্মহত্যা করিয়াছে। মুসলমানদের যুদ্ধের মধ্যে এক দিকে ধর্মোৎসাহ অপর দিকে রাজ্য অথবা অর্থলোভ ছিল; কিন্তু হিন্দুরা চিতা জ্বালাইয়া স্ত্রীকন্যা ধ্বংস করিয়া আবাল বৃদ্ধ মরিয়াছে মরা উচিৎ বিবেচনা করিয়া... তাহাকে বীরত্ব বলিতে পার তাহাকে যুদ্ধ বলেনা।"

এতে সন্দেহ নেই যে হিন্দু ধর্মের মধ্যে তত্ত্বচিন্তার প্রভাব, জন্মান্তর বাদ, গীতার ফললাভহীন, কর্ম প্রচেষ্টার বাণী, তার প্রবৃত্তির উগ্রতাকে অনেক পরিমাণ হ্রাস করেছিল। ফলে জবরদস্তির ইতিহাসে তাদের বার বার হার হয়েছে। যার পরিণামে পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঐহিক জীবনে অসীম গ্লানি ভার বহন করত হয়েছে অধস্তন পুরুষদের। এই পৃথিবীকে দুহাতে আঁকড়ে ধরবার শক্তিই তার ক্ষীণ হয়েছে—যে জাতি বাঁচতে চায় তার পক্ষে এত বড় বিপদ আর নেই। তবে বাঁচার দু রকম দিক আছে এক শরীর আর এক আত্মা বা মন। মনের প্রকাশ তার মনুষ্যত্বে—যে সমস্ত মূল্যবোধগুলি মনুষ্যত্বের নিয়ামক সেগুলিকে ধ্বংস করেও বাঁচারে মূল্য কতটুকু তাও কবি বিবেচনা করছেন। "আমরা হিন্দুরা বিশেষ করিয়া কিছু চাহি না। অন্যের [illegible]র সন্ধি বিদীর্ণ করিয়া দূরের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিকড় প্রসারণ করি না, সেই জন্য যাহারা চায় তাহাদের সহিত পারিয়া উঠা আমাদের কর্ম নহে।"

এই কথাটি যে কত সত্য তা বর্তমানে দেশ ভাগের পরেও দেখা গেল। যে মুহূর্তে দেশ ভাগ হল হিন্দুরা বুঝতে পারল যে এখন পাকিস্তানে বাঁচতে গেলে সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে তারা দলে দলে মরতে ছুটে এল পশ্চিমবাংলায়। কোথায় পড়ে রইল নারকেল বাগান, সুপুরীর ছায়া, নদীর তীর। শিয়ালদহ ষ্টেশনে—মানার মরুপ্রান্তরে যমের খর্পরে এসে পড়তে লাগল বহ্নিমুখ বিবিক্ষু পতঙ্গের মত।

এই সেদিন যশোরে এক বৃদ্ধ মুসলমান বলেছিলেন নড়াইলের রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখলে আমাদের এখনও দুঃখ হয়। যেই পাকিস্তান হল এরা একবার ফিরে তাকাল না বিপুল সম্পদ ফেলে রেখে দলে দলে দেশ ছেড়ে চলে গেল।

এই ইতিহাস গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "যাঁহারা চায় তাহারা কেমন করিয়া চায় এই সমালোচ্য গ্রন্থে তাহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। পৃথিবীর জন্য এমন ভয়ঙ্কর কাড়াকাড়ি, রক্তপাত, এত মহাপাতক একত্রে আর কোথাও দেখা যায় না!..."

এই প্রসঙ্গে যে বৈরাগ্য ভারতবর্ষীয় প্রকৃতিকে নিজের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে অসাড় করেছে কবি তার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী নন, অপর দিকে স্বার্থোন্মত্ত আসক্তিকেও সমর্থন করেন না—তাঁর একটি প্রশ্ন থেকেই যায় এবং এই অমীসাংসিত প্রশ্নে তাঁর শেষ পর্যন্ত রায় বৈরাগ্যের বিপক্ষেই যায় যখন তিনি বলেন—"যদিও জানি, যে বল পশুত্বকে উত্তেজিত করে সেই বল সময়ক্রমে দেবত্বকে উদ্বোধিত করে। জানি যেখানে আসক্তি প্রবল সেইখানেই আসক্তি ত্যাগ সুমহৎ... জানি বৈরাগ্য ধর্মের ঔদাসীন্য যেমন প্রকৃতিকে দমন করে তেমনি মনুষ্যত্বে অসাড়তা আনে... তথাপি লোভ হিংসার ভীষণ আন্দোলন ও বিলাস লালসার নিয়ত চাঞ্চল্যের দৃষ্টান্ত দেখিলে ক্ষণকালের জন্য সন্দেহ জাগে যে পাপ পুণ্যের ভালো মন্দের উত্তুঙ্গ তরঙ্গিত অসাম্য শ্রেয় না অপাপের অমন্দের একটি নির্জীব সমতল নিশ্চলতা শ্রেয়?...

তৎকালীন হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলমান সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে সজাগ কিন্তু মুসলমান সমাজের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলমান সমাজ হিংস্র তার নানা উদাহরণে তিনি নিন্দায় অকুণ্ঠ্য। রীতি-নীতি ও জবরদস্তির কাছে যেখানেই মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত সেইখানেই তিনি প্রতিবাদে মুখর। 'সমাজ' নামে প্রবন্ধ গ্রন্থে 'মুসলমান মহিলা' নামে একটি ছোট প্রবন্ধ আছে—সেই প্রবন্ধে কোনো "তুরস্কবাসিনী" ইংরেজ রমণীর লেখায় তুরস্কের অসূর্যস্পশ্যা মুসলমান নারীদের দুরবস্থার বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। পর্দা প্রথার কদাচারের প্রসঙ্গে শাস্ত্রবাক্যের জালে মনুষ্যত্বকে বন্দী করার দৃষ্টান্তে হিন্দু মুসলমান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই সমাজেরই 'বাক্য বিন্যাস বিশারদের কথা বলেছেন। কিন্তু এই বইতে একটি বালিকা বধুর উপর যে নৃশংস অত্যাচারের বর্ণনা আছে তাতে শিহরিত হলেও তাকে জাতীয় চরিত্রের দৃষ্টান্ত রূপে ব্যবহার করতে তিনি রাজী নন। মধ্য যুগে সর্বত্রই স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি ইংরেজ মহিলার লাঞ্ছনা প্রসঙ্গে প্রাচ্য মুসলমানের বিশেষ দুষ্কৃতির কলঙ্ক খণ্ডন করেন। এই উদাহরণগুলি জাষ্টিস আমীর আলীর প্রত্যুত্তর হতে সংগ্রহ। অবশ্য ঐ প্রবন্ধে একটি প্রচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা রয়েছে যা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সমর্থনযোগ্য ছিল না।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই দুর্বলতা এড়াতে পারেননি। সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে ইংরাজের নিন্দা প্রাসঙ্গিক না হলেও প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। কারণ "প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে আমাদের ভাগে যে কেবলই কলঙ্ক সেটা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা এবং বিরুদ্ধ প্রমাণ আনয়ণ করা আমাদের নতশির ক্ষত হৃদয়ের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন— ।"

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র এই গ্রন্থ তৎকালীন ইংরেজ সম্পাদকদের ক্রুদ্ধ করেছিল কারণ তিনি অন্ধকূপ হত্যার সঙ্গে গ্লেন্‌কোর হত্যাকাণ্ড ও সিপাহী বিদ্রোহ কালে অমৃতসরের নিদারুণ নিধন ব্যাপারের তুলনা করেছেন। ইংরেজ সমালোচক লিখেছিলেন যে মুসলমান রাজত্বকালে শাসকদের বিরুদ্ধে এ রকম গ্রন্থ কেউ লিখতে পারত না। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "হয়ত পারতেন না। মুসলমান রাজত্ব কালে বিজিত হিন্দুগণ প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, রাজস্ব সচিব প্রভৃতি উচ্চতর রাজকার্যে অধিকারবান ছিলেন। কিন্তু কোনো নবাবী আমলে উক্ত নবাবের দেড় শতাব্দ পূর্ববর্তী ইতিহাস, বাহিরের প্রমাণ ও অন্তরের বিশ্বাস অনুসারে তাঁহারা হয়ত লিখিতে পারিতেন না! ইংরেজ রাজত্বকালে অক্ষয়বাবু যদি সেই অধিকার লাভ করিয়া থাকেন তবে তাহা ইংরেজ শাসনের গৌরব কিন্তু তবে কেন সেই অধিকার ব্যবহারের জন্য সমালোচক মহাশয় চক্ষু রক্তবর্ণ করিতেছেন?"

অল্পদিন পূর্বে বঙ্কিমের মধ্যে ইংরেজ রাজত্বের সূচনায় যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ও মুসলমান রাজত্বের প্রতি বিরাগ দেখা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধু বান্ধবের মধ্যে সেভাব পরিবর্তিত হয়ে গেছে তখন হিন্দু মুসলমানের প্রাচ্য ঐক্য, পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে নিজের সামর্থ্য বিচার শুরু হয়েছে।

মোগল পাঠান রাজত্বের যুগ থেকে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব নানা ভাবে প্রকট ছিল; রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি রচনায় সে অবস্থার বর্ণনা করেছেন। রাজপুত ও পাঠান মোগলের যুদ্ধ বিগ্রহে মুসলমানের নীতি ভ্রষ্টতার মধ্যে প্রধান যে দোষের কথা প্রচারিত তা তার নারী নিগ্রহ ও নারীত্বের অবমাননা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'কথা ও কাহিনী'র "হোরিখেলা" কবিতায় রাজপুতদের ছলনার কাছে নারীলোলুপ পাঠানের দুর্গতির বর্ণনায় তার একটা পরিহসিত ছবি আছে "পাঠান ভাবে রাজপুতানীর দেহে কোথাও কেন নাইকো কোমলতা" আর পরিশেষে ছদ্মবেশী রাজপুত সৈন্যের আক্রমণও ফলে—"যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল সে পথ দিয়ে ফিরল না কো তারা।"—বস্তুত অনেকগুলি কবিতায় এই দ্বন্দ্বের বর্ণনায় তখনকার দিনের যুদ্ধ বিগ্রহ ক্রুরতা ও নিষ্ঠুরতার নৈতিক দৃঢ়তার ও চরিত্রবলের প্রশ্নে শিখদের তিনি বড় করেছেন। 'বন্দীবীর' কবিতায় মোগলের হাতে বান্দার, নিষ্ঠুর মৃত্যুর ঐতিহাসিক ঘটনা যে জীবন রূপ নিয়েছে তাতে শিখদের নৈতিক বল ও মহত্বের তুলনায় মোগল চরিত্রকে ম্লান করেছে। কয়েকটি শিখ ও মোগল সংঘর্ষের ব্যাপারেই শিখদের এই সম্মান দেখিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য লাইন 'যাহা চাও তার কিছু বেশী দিব বেণীর সঙ্গে মাথা।" কৌশলের চেয়ে আত্মসম্মানে বীরত্ব ও মহত্বে নবীন শিখজাতি রবীন্দ্রনাথের কতখানি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল তা 'গুরুগোবিন্দ' কবিতাটিতে সুস্পষ্ট। ঐ কবিতাতে দেশ নায়কের কাছে রবীন্দ্রনাথ যা চেয়েছেন তা হচ্ছে তার মুখের কথার সঙ্গে জীবনের ঐক্য—রবীন্দ্রযুগেও যা ছিল দুস্প্রাপ্য—"আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ"—গুরু গোবিন্দর জীবনে চিন্তা ও কর্মে যে সংযোগের কথা রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সমগ্র শিখ জাতির জীবনই তাতে উদ্বুদ্ধ, আত্মসম্মানবোধ সততা ও দেশ প্রেমের প্রবর্তনা তো শুধু রাজনীতি নয়, যুদ্ধনীতি নয়, তার চেয়ে উচ্চতর বস্তু।

'কথা ও কাহিনী'র আর একটি কবিতা আছে যা নিয়ে সাম্প্রদায়িক মুসলিম পত্রিকা মোহম্মদী একদা উত্তেজিত হয়েছিল সে হচ্ছে "বিচারক" কবিতায় রঘুনাথ রাওর উক্তি "চলেছি করিতে যবন নিপাত যোগাতে যমের খাদ্য"—'যবন নিপাত' এর আগ্রহটা মোহম্মদীর ভালো লাগেনি তারা ঐ কবিতাকে বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট মনে করেছিল—রবীন্দ্রনাথ বললেন, "হা অদৃষ্ট ওতো আমার কথা নয় ও রঘুনাথ রাওর কথা॥"

এ সমস্ত কাহিনীমূলক কাব্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাহিনীর 'সতী' নাট্যকাব্য। বিদায় অভিশাপ, মালিনী, কর্ণ কুন্তি সংবাদ ইত্যাদির মত এত প্রসিদ্ধি নেই ঐ নাটিকাটির। কিন্তু বক্তব্যে অভিনব, নাটকীয় গুণে সমৃদ্ধ ঐ নাটিকার জন্য যে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে নিগৃহীত হতে হয় নাই এটা আশ্চর্য। সম্ভবত হিন্দু সমাজের মন একটি অবিশ্বাস্য ভয়ানক সত্যের সামনাসামনি হবার চেয়ে সমগ্র নাটিকাটিই ভুলে থাকতে চেয়েছে—কাব্যগুণে চমৎকার হলেও রচনাটি অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। সেই কারণে এখানে সংক্ষেপে বিবরণটি দেওয়া প্রয়োজন। কথা ও কাহিনীর অন্যান্য অনেক কবিতার মতই সতী নাটিকার ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আরম্ভে বলা হয়েছে "মিস ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের পত্রিকায় মারাঠি গাঁথা সম্বন্ধে অ্যাক্‌ওঅর্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধ বিশেষ থেকে বর্ণিত ঘটনা সংগৃহীত।

বিনায়ক রাওর কন্যা অমাবাই জীবাজীর কাছে বাগদত্তা। বিবাহ সভায় সকলে বরাগমনের প্রতীক্ষায় আছে—এমন সময় অমাবাই অপহৃতা হল। সেই কাল রাত্রির এক বৎসর পর জীবাজী তার বাগদত্তাকে অপহরণের প্রতিশোধ নিল সেই দস্যু যবনকে হত্যা করে। ইতিমধ্যে বহু দিন কেটে গিয়েছিল—অমাবাই অপহৃতা হলেও পরে স্বেচ্ছায় অপহরণকারীকে পতিত্বে বরণ করেছিল। তার একটি পুত্রও জন্মেছিল এমন সময় জীবাজী যবনকে বধ করে অপমানের প্রতিশোধ নিল। তারপর মাতা রমাবাই ও পিতা বিনায়ক রাওর সঙ্গে অমাবাইর সাক্ষাৎ এবং দ্বন্দ্বই এই নাটিকার বিষয় বস্তু।

অমাবাই পিতাকে বলছে—"ছেড়ে দাও মোরে ছেড়ে দাও পতিরক্তসিক্তর স্নেহডোরে বেঁধো না আমায়!"

বিনায়ক রাও—"কারে কস্ পতি লজ্জাহীনা? কাড়ি নিল যে ম্লেচ্ছ দুর্মতি জীবাজীর প্রসারিত বর হস্ত হতে বিবাহের রাত্রে তোরে—বঞ্চিয়া কপোতে শ্যেন যথা লয়ে যায় কপোতবধূরে আপনার ম্লেচ্ছ নীড়ে—সে দুষ্ট দস্যুরে পতি কস তুই।"

তারপর তিনি আরো বলেন, যে, জীবাজী এত দিন পরে "বিজাপুর যবনের রাজসভাসদ" যে দস্যুবৃত্তি করেছিল তার প্রতিশোধ নিয়েছে এবং "নিশীথ সমরে জীবাজি ত্যাজিয়া প্রাণ বীরের সদ্গতি লভিয়াছে। রে বিধবা সেই তোর পতি দস্যু সে তো ধর্মনাশী।"

এইখানে লোকাচারের ধর্ম ও মানব ধর্মের দ্বন্দ্বে অমাবাইর কাহিনী মানবধর্মের সত্যকে উদ্ভাসিত করেছে। ভালোবাসা যে লোকাচারের চেয়ে বড় কবির এই মত স্পষ্ট ও স্বচ্ছভাবে বলছে অমাবাই, "হৃদয় অর্পণ করেছিনু বীরপদে। যবন ব্রাহ্মণ সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়। অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয় সেথায় সমান দোঁহে।"

কিন্তু পিতা যদি বা কন্যাস্নেহে কিছুটা দুর্বল হন মাতা অবিচল সংস্কারে একনিষ্ঠ, ব্যক্তিগত স্নেহ বন্ধন ছিন্ন। স্ত্রীলোকই লোকাচার, সংস্কার ও প্রথার রক্ষক—সংস্কারের বন্ধনের কাছে স্নেহ দয়া মায়া মানবতা সব কিছু সে ত্যাগ করতে পারে।

'বিসর্জন' নাটকে রাণী গুণবতীও পুরহিতের সঙ্গে মন্ত্রণা করে ধ্রুবকে বলিদান দিতে উদ্যত। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ নারীর এই সংস্কার নিষ্ঠাকে দেখিয়েছেন; আনুষ্ঠানিক;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধর্মের শৃঙ্খল ছিঁড়ে মাঝে মাঝে পুরুষের মন যখন চিরন্তন মনের সত্য গ্রহণ করতে চেষ্টা করে তখন নারীই তার আদিম হিংস্রতা নিয়ে সংস্কারের শৃঙ্খল দিয়ে আরো দৃঢ় করে বাধে। সনাতন ধর্মের অক্টোপাস তার শুঁড়ের চাপে স্বাভাবিক সুস্থ মানবতাকে শুষে মেরে ফেলে। অমাবাইর জননী রমাবাই তাই বলছেন—"জানিস্ কাহারে বলে পতি?... রমণীর সে যে এক গতি একমাত্র ইষ্টদেব। ম্লেচ্ছ মুসলমান ব্রাহ্মণ কন্যার পতি দেবতা সমান!"

তখন অমাবাই স্থির করেছেন জীবাজির সঙ্গে এক চিতায় "তারি ভস্মে অমাবাইর ভস্ম মিলাইতে হবে।" বিবাহ রাত্রির বিফল হেমাগ্নি শিখাকে চিতাগ্নিতে সমাপ্ত করতে হবে।

অমাবাই বলছেন "পরপুরুষের সনে মাতা হয়ে বাঁধ যদি মৃত্যুর মিলনে নির্দোষ কন্যারে—তোরে ধন্য কবে কিন্তু মাত নিত্যকাল অপরাধী রবে শ্মশানের অধীশ্বর পদে।" লোক ধর্মের সঙ্গে নিত্যধর্মের বিরোধের ভয়ানক স্পষ্ট বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে এই কাহিনীর বর্ণনায়। তখন মায়ের ক্রোধানল থেকে কন্যাকে রক্ষা করতে ব্যাগ্র ব্যাকুল পিতা বলছে—

"সমাজের চেয়ে হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন। পিতৃস্নেহ নির্বিচার বিকারবিহীন দেবতার বৃষ্টি সম—আমার কন্যারে সেই শুভ স্নেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে, কোন শাস্ত্রে কোন লোক কোন সমাজের মিথ্যাবিধি তুচ্ছ ভয়?"

কিন্তু অমাবাইর আদেশে জীবাজির সৈন্যরা অমাবাইকে সহমরণে পাঠাল। স্বাভাবিক স্নেহ দয়া ভালোবাসা সংস্কার ও শাস্ত্রাভিমানে বিকৃত হয়ে ধর্মের নামে যে অধর্ম হিন্দু সমাজে চলত তার অনেক কাহিনীই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—। 'নরকবাস' নাটিকাটি ও 'বিসর্জন' নাটক তার দৃষ্টান্ত—কুসংস্কারে সুস্থ হৃদয়বৃত্তি ও মনুষ্যত্ব নষ্ট হবার দ্বন্দ্ব 'দেবতার গ্রাস' কবিতায়—কিন্তু এ সমস্তকে ছাড়িয়ে 'সতী' নাটিকাটির একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। আজ থেকে তেষট্টি বছর আগে লেখা এই কাহিনী। কবির স্পষ্ট সমর্থন রয়েছে এমন একটি অসামাজিক ঘটনায় যা হিন্দু সমাজের চিন্তা ভাবনায় প্রচণ্ড আঘাত করেছে চিরদিন। পদ্মিনীর বহুশ্রুত কাহিনী ছাড়াও মুসলমানের একটা স্থায়ী নিন্দা তার পরনারীতে লোভ। এই ঘৃণ্য অবস্থাতেও যে মানুষের স্নেহ প্রেম কখনও জয়ী হতে পারে ঐ মারাঠী কাহিনীতে তারই সংবাদ মানবধর্মের প্রতি কবির স্থির বিশ্বাসকে স্পর্শ করেছিল। ঐ কাহিনীতে তিনি নিশ্চয় অপহরণকারী দস্যুকে সমর্থন করেন না বস্তুত দস্যুর দস্যুতা সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই এখানে। শুধু অমাবাই যে অপহরণকারী ম্লেচ্ছকে ভালোবেসেছে এবং ভালোবাসাই যে সকল ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে মানুষকে

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তুলতে পারে এ কথাই এখানে বলা হয়েছে। এই কথাই গোরায় আনন্দময়ী বলেছেন—"ছোট শিশুকে কোলে নিলেই বোঝা যায় মানুষের জাত নেই।" উপেক্ষিত সতী নাট্যকাব্য সূক্ষ্ম হৃদয়-বোধে দ্রব, অভাবিত ঘটনা সমাবেশে চিত্ত উদ্দীপক ও রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মে অবিচলিত বিশ্বাসের একটি দৃষ্টান্ত!

এর থেকে কয়েক যুগ পরে লেখা আর একটি অপ্রচলিত ছোট গল্প বা গল্পের কাঠামো—হচ্ছে 'মুসলমানীর গল্প'। কবি তখন অসুস্থ প্রায় মৃত্যুশয্যায় তখনও তাঁর কল্পনা সৃষ্টির পথ দিয়ে আনাগোনা করেই চলত—নিজের হাতে লিখতে পারতেন না বলে তার অনেকটাই হারিয়ে গেছে। মুখে মুখে গল্প বলাও শেষের দিকে একটা খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একে ওকে লেখবার জন্য প্লটও দিতেন। অসম্পূর্ণ গল্পের মধ্যে 'বদনাম' ও 'পুরস্কার' এ দুটিকেও ধরা চলে। যারা আসত যেত তাদের সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হত—তারই কিছু কিছু নিয়ে মনে মনে নাড়া চাড়া করে গল্পের রূপ দিতেন। আমার যতদূর মনে পড়ে 'মুসলমানীর গল্প'র কাহিনীটির উৎপত্তি এমনই একটি ঘটনা থেকে। কোনো অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করে কোনো আশ্রমে রাখা হলে সে অপহারকের ঘরে ফিরে যেতে চেয়েছিল এই রকম কোনো কাহিনী একজন আত্মীয়ার কাছে শুনেছিলেন, এই গল্পের খসড়াটি তারই ভিত্তিতে লেখা।

একবার লাঞ্ছিতা ধর্ষিতা বা বলপূর্বক অপহৃতা নিরপরাধ নারী যে হিন্দু সমাজে স্থান পায় না অমানবিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ধিক্কারও এই গল্পের মধ্যে অনুস্যূত। গ্রাম বাংলায় এক সময়ে হিন্দু নারী বিশেষত বিধবাদের অপহরণের সংবাদ প্রায়ই কাগজে প্রকাশ হত—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও সে সময় প্রবাসীতে এ সম্বন্ধে অনেক লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে সংযুক্ত সেই 'ঢাকিরা ঢাকা বাজায় খালে বিলে সুন্দরীকে বিয়ে দিলাম ডাকাত দলের মেলে'—ছড়াটি অবলম্বনে মেয়ে ডাকাতি সম্বন্ধে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিস্তৃত সম্পাদকীয় অনেকের স্মরণ থাকতে পারে। মেয়ে ডাকাতি সে সময়ে গ্রামে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের গ্রামে চলত নির্বাধ। বিশেষ করে অসহায় নিরাশ্রয় হিন্দু বিধবারাই এর শিকার হত। এবং একবার কোনো নারী অপহৃতা হলে সম্পূর্ণ নিরপরাধ সেই হতভাগিনীকে নিষ্ঠুর হিন্দু সমাজ যে আর গ্রহণ করত না সেই রীতিকেই ধিক্কার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এই 'মুসলমানীর গল্পে'—

চতুর্দোলায় চড়ে ভোজপুরী পালওয়ান ও লাঠিয়ালে সুরক্ষিত হয়ে কমলা চলেছিল শ্বশুর বাড়ি। ডাকাত পড়ল পথের মধ্যে মধু মোল্লা ডাকাতের সর্দার তার দলবল নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে এসে পড়ল। পালওয়ানরা পলায়ন করল। এমন সময় বৃদ্ধ হবিব খাঁ এসে কমলাকে রক্ষা করলেন। ডাকাতরা তাঁকে মান্য করত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কমলা যখন হবিব খাঁকে বল্লে "দয়া করে কাকাকে খবর দাও তিনি নিয়ে যাবেন।"

হবিব বললে "বাছা ভুল করছ আজ তোমার বাড়িতে কেউ ফিরে নেবে না। তোমাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবে, না হয় একবার পরীক্ষা করে দেখ।" হবিব খাঁ কমলাকে তার বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে বাইরে অপেক্ষা করে রইল।

বাড়ির ভিতর গিয়ে কমলা কাকার গলা জড়িয়ে ধরে বলল "কাকামণি তুমি আমায় ত্যাগ করোনা" কাকার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কাকী এসে দেখে বলে উঠল, "দূর করে দাও দূর করে দাও অলক্ষ্মীকে, সর্বনাশিনী বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিস্ তোর লজ্জা নেই।"

এ সেই চিরন্তন সংস্কার পরায়ণা নারীর রূপ যা বিসর্জন নাটকে গুণবতীতে সতী নাট্যকাব্যে রামাবাই-এ রূপ নিয়েছে। পুরুষ সংস্কারে অভিভূত থাকলেও স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তিকে একেবারে পরিহার করতে পারে না যুক্তি ও বুদ্ধি তার জড়ত্ব মুক্ত হয়ে কখনো কখনো সত্যকে দেখতে চায়—কিন্তু প্রথা ও সংস্কারের গ্রন্থি দিয়ে নারীর জীবন আঁট করে বাধা এতটুকু নড়াচড়া সহ্য হয় না। সনাতন ধর্মের নিয়ম কানুনের কাছে তার সমস্ত মানবিক বৃত্তিগুলি নির্জীব হয়ে পড়ে। কমলা ফিরে গেল হবিবের ঘরে। সেখানে সে হিন্দুয়ানী রক্ষা করেই আলাদা থাকত। তারপর সে ভালোবাসল হবিবের মেজ ছেলে করিমকে। তখন সে বললে হবিবকে, "যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে অবজ্ঞার আস্তাকুঁড়ের পাশে আমাদের ফেলে রেখে দিয়েছে—সে ধর্মের মধ্যে দেবতার প্রসন্নতা আমি তো কোনোদিন দেখতে পেলুম না।... আমি প্রথম ভালোবাসা পেলুম বাপজান তোমার ঘরে।... যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পূজো করি। তিনিই আমার দেবতা তিনি হিন্দুও নন মুসলমানও নন।"

জীবনের দুই প্রান্তে লেখা এই দুই কাহিনী 'সতী' ও 'মুসলমানীর গল্প'। কিন্তু এর মধ্যে একটা যোগ সূত্র আছে।

ভারতে হিন্দু সমাজে মুসলমানদের প্রধান নিন্দা হিন্দু নারী অপহরণের।

এই দুটি কাহিনীতেই সেই কলঙ্ক কালিমা খানিকটা ফিঁকে হয়েছে। কতখানি নিরপেক্ষ দৃষ্টি থাকলে এই কাহিনী দুটি লেখা সম্ভব তা হয়ত আজ তেমন ভাবে অনুমেয় নয়। এই কাহিনীর বক্তব্যে অপহরণকে সমর্থন করা হচ্ছে না শুধু একটি কথা স্পষ্ট হচ্ছে যে আপাতদৃষ্টিতে যে যে ঘটনা যেমন কলঙ্কিত বলে প্রতিভাত হয় যে ব্যাখ্যা ও যে অর্থ হয় অনেক সময় তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও তার নিহিতার্থ অন্যরূপ। মানুষকে জাতি ধর্মে বিভক্ত করে কতগুলি দোষ ও গুণ আরোপ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখা তাকে সত্য রূপে দেখা নয়। নির্মোহ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণাত্মক মন নিয়ে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক বিচার রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় রয়েছে—এবং যেহেতু হিন্দু সমাজ তাঁর নিজের আত্মীয় সমাজ তাই তাঁর সমালোচনার দৃষ্টি সেদিকেই প্রখর যা আত্মসমালোচনারই রূপান্তর।

যখন পূর্বপাকিস্তান বলে একটা দেশ ছিল যেখানে ক্রমে ক্রমে অন্তর্জগতে বাংলাদেশ তৈরী হচ্ছিল সেখানে রবীন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্র বিরোধীদের মধ্যে প্রায়ই একটা বিতর্ক হত। বিরোধীদের বক্তব্য ছিল যে রবীন্দ্রনাথ মুসলমান জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন সেকারণে তাঁর গল্প ও কাহিনীতে মুসলমান জীবনের কোনো উপাদান নেই। তাঁর রচনায় মুসলিম নায়ক-নায়িকা নেই। এ অভিযোগ যাঁরা খণ্ডন করতেন তাঁরা বলতেন যে যেহেতু মুসলমান সমাজে ও তার অন্তপুরে হিন্দুদের সহজ গতি বিধি ছিল না সে হেতু ঐ সমাজকে ভিতর থেকে জানা ও তার সমস্যাগুলো অনুভব করা সম্ভব ছিল না হিন্দু লেখকের। এই বিতর্কে দুই পক্ষরই স্বপক্ষে বিপক্ষে কিছু বলবার আছে। প্রথমত রবীন্দ্রনাথের গল্পে ও কাহিনীতে মুসলমান একেবারে অনুপস্থিত নয়—তবে একথাও ঠিক যে মুসলমানের সমাজ জীবন রবীন্দ্রনাথের তত পরিচিত নয়, যাতে সেই সমাজের আঁতের খবর তাঁর কাছে পৌঁছবে। আর রবীন্দ্ররচনায় কাহিনীর পাত্রপাত্রী ও বিষয়বস্তু কখনই অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত বিষয়ে সমাজের কথা বলে নি। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ যদিও বহুবার ইয়োরোপে এমেরিকায় গিয়েছেন চীন জাপান ও বিভিন্ন প্রাচ্য দেশগুলিতে গিয়েছেন, সর্বত্রই তাঁর বান্ধব ও সুহৃদজনের সংখ্যা অনেক। বিশেষত ইয়োরোপে তাঁর বান্ধব সংখ্যা সমমর্মীর সংখ্যা হয়ত দেশের চেয়েও বেশি। ইয়োরোপীয় সমাজ তাঁর বাল্যকাল থেকে চেনা। সে দেশের স্ত্রী-পুরুষ ও জীবন বিন্যাস কোনো কিছুই তাঁর অপরিচিত নয়। কিন্তু তাঁর কাব্যে ইয়োরোপীয় মানব মানবী, বিশেষত সামাজিক মানব মানবী, প্রতিদিনের জীবন ব্যাপারের সঙ্গে সংযুক্ত মানব মানবীর কোনো স্থান নেই। এর চেয়ে অনেক কম জেনে একবার মাত্র বিলেতে বুড়ি ছুঁয়ে এসে সে দেশের জীবন নিয়ে অনেকে কাহিনী ও উপন্যাস রচনা করেন সহজে। যে কারণেই হোক রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি। বস্তুত ইয়োরোপীয় সমাজ এমন কি তার প্রকৃতিও রবীন্দ্রকাব্যে প্রায় অনুপস্থিত। দক্ষিণ এমেরিকায় বসেও রবীন্দ্রনাথ জুঁই ফুলেরই গান করেন অন্য কোনো বিদেশী পুষ্পের নয়। তবু শেষের দিকে 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি কবিতা বিদেশী ভিক্টোরিয়া ও বিদেশ ইটালিয়ার প্রতি উদ্দিষ্ট হলেও তার সংখ্যা সামান্যই এবং তা প্রত্যহের জীবন বা সমাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। অনেক লেখক একবার বিদেশ ছুঁয়ে এসেই অপরিচিত সমাজ ও জীবন [illegible] উপন্যাস লিখে থাকেন ইংরেজ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এমেরিকান বা বার্মিস পাত্র পাত্রীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারেন সে রকম সাহস বা ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। বস্তুত যে সব বিষয় তাঁর অনুভবে দৃঢ় সংসক্ত নয়, চেতনে অচেতনে অনুস্যূত নয়, তা হয়ত তাঁর রচনার প্রেরক হয় নি।

ইয়োরোপের চিন্তা ভাবনা তাঁর কাব্যে অবশ্য একভাবে গভীর প্রেরণা হয়েছে তাঁর চিন্তাকে নূতন বাঁকে মোড় ফিরিয়েছে, সে হয়েছে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের অভিঘাতে—বলাকা কবিতায় তারই আভাস পেয়েছি। তারপরে বিভিন্ন কবিতায় প্রবন্ধে দ্বন্দ্বমুখর বিশ্ব তাঁর চিন্তা ও অনুভবকে চঞ্চল প্রখর ও অতন্দ্র করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একদিকে তাঁকে যন্ত্রণাবিদ্ধ অন্যদিকে গভীরতর মানবমুখী করেছে। ইয়োরোপ যখন তাঁর চেতনাকে স্পর্শ করে তার সাধনা সংকল্প এমন কি ধর্মবোধকেও প্রভাবিত করেছে তখন তাঁর নাটকের কাহিনীর ইয়োরোপীয় পাত্রপাত্রী না থাকলেও পাশ্চাত্যজগত নানাভাবে নানা বেশে উপস্থিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যুগে বাঙলা দেশের মুসলমান বেশীর ভাগই ছিল গ্রামবাসী চাষী। জমিদার হিসাবে এই চাষীরা তাঁর চিন্তা ভাবনার একটা বড় জায়গা জুড়ে ছিল। হিন্দু কর্মচারীদের জাতিভেদের জন্য মুসলমান প্রজাদের প্রতি অবিচার বিশেষভাবে তাঁকে বিচলিত করেছিল। মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুদের বিরোধের প্রসঙ্গে এই জাতিভেদের প্রসঙ্গটাই শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি অচঞ্চল রেখেছিল। তাছাড়া শিলাইদহে পদ্মার তীরে তীরে গড়ুই নদীর ধারে ধারে প্রকৃতির সঙ্গে এক সঙ্গে মিশে যে মানুষ তাঁকে মানুষের কবি হতে প্রেরণা দিয়েছিল সে তাঁর অসহায় সরল প্রভুবৎসল চাষী প্রজাবৃন্দ। কিন্তু তারও পূর্বে রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন চব্বিশ তখন তিনি 'রাজর্ষি' উপন্যাসটি লেখেন। এই সময়ে সহরের শিক্ষা সংস্কৃতির কলা শিল্পের চর্চার মধ্যে ঠাকুরবাড়ির বিশিষ্ট শক্তিশালী পুরুষেরা বাংলাদেশে অভিজাত্যের একটি বিশেষ ভাবলোক সৃষ্টি করছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ পূর্ণরূপে কবি এবং ভাবুক কিন্তু তখনই তাঁর মধ্যে সমাজসেবক রবীন্দ্রনাথ উঁকি ঝুঁকি মারছে। সংসারের সমস্ত বিচিত্র ভাব ও অনুভাবের দ্বন্দ্ব ও ক্ষোভের ভিতর দিয়ে যে মানুষটি তৈরী হয়ে উঠছে তার চরম পরিণাম ও সার্থকতা পরের জন্য আত্মোৎসর্গের কর্মে। কবি রবীন্দ্রনাথ কর্মী রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন তাঁর কবিত্ব মানুষের সেবার ভিতরে প্রেমের পরম সত্যে ভাস্বর হয়েছিল অল্প বয়সে লেখা রাজর্ষি উপন্যাসেই তার সূচনা দেখতে পাই।

'রাজর্ষি' উপন্যাসের কাহিনীও হিন্দু সমাজের নিরর্থক অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রথা সংস্কারের সঙ্গে উচ্চতর মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত প্রেম করুণা ও মানবতার দ্বন্দ্বের ছবি। উপন্যাসের শেষ অঙ্কে বিল্বন ঠাকুরকে দেখা যাচ্ছে একজন আদর্শ পুরুষ রূপে তিনি ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণের আচারের শৃঙ্খলে বদ্ধ নন। তিনি গোবিন্দমাণিক্যের মত বৈরাগ্য নিয়ে সংসার থেকে দূরে চলে যান না—গোবিন্দমাণিক্যও শেষ পর্যন্ত

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতির আশ্রয় ছেড়ে লোকালয়ে মানুষের কাজে এলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন হিমালয়ের শিখর থেকে নির্ঝরিত নদী যেমন লোকালয়ের দিকে ছুটে যায় নিজে মলিন হয়েও মানুষের হিতার্থে তেমনি তিনিও তাঁর সাধন শিখর থেকে মানুষের কাজে মানুষের মধ্যে নেমে আসবেন। সেই উপমাটিই রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্যের সম্বন্ধে লিখেছেন "গোবিন্দমাণিক্য দেখিলেন নির্জনে ধ্যানপরায়ণা প্রকৃতি যে স্নেহধারা সঞ্চয় করিতেছে, সজনে লোকালয়ের মধ্যে তাহা নদী রূপে প্রেরণ করিতেছে—যে তাহা গ্রহণ করিতেছে তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে, যে করিতেছে না তাহার প্রতিও প্রকৃতির কোনো অভিমান নাই।" গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন "আমিও আমার বিজনে সঞ্চিত প্রেম সজনে বিতরণ করিতে বাহির হইব।" বলিয়া তাঁহার পর্বতাশ্রম ছাড়িয়া তিনি বাহির হইলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কবিতার আশ্রয় থেকে শিল্পের সংস্কৃতির পরিবেশ থেকে সযত্ন সঞ্চিত প্রেম দুঃস্থ হতভাগ্য দরিদ্র মানুষের দিকে প্রবাহিত করেছিলেন। এই প্রেমেরই একটি কল্পিত রূপ বিল্বন ঠাকুরের পাঠান পাড়ায় লোক সেবায়—"পাঠানদের পাড়ায় মড়কের প্রথম আরম্ভ হইল। মৃতদেহকে গোর দেবার বা পরস্পরকে সেবা করিবার কাহারও অবসর রহিল না। হিন্দুরা কহিল মুসলমানেরা গো-হত্যা পাপের ফল ভোগ করিতেছে। জাতি বৈরিতায় এবং জাতিচ্যুতিভয়ে কোনো হিন্দু তাহাদিগকে জল দিল না বা কোনো প্রকার সাহায্য করিল না। বিল্বন সন্ন্যাসী যখন গ্রামে আসিলেন তখন গ্রামের অবস্থা এইরূপ। বিল্বনের কতকগুলি চেলা জুটিয়াছিল মড়কের ভয়ে তাহারা পালাইবার চেষ্টা করিল। বিল্বন ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে বিরত করিলেন। তিনি পীড়িত পাঠানদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন। পথ্য পাণীয় ঔষধ এবং তাহাদের মৃতদেহকে গোর দিতে লাগিলেন। হিন্দুরা হিন্দু সন্ন্যাসীর অনাচার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। বিল্বন কহিতেন আমি সন্ন্যাসী আমার কোনো জাত নাই। আমার জাত মানুষ। মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত! ভগবানের সৃষ্টি মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই বা কিসের জাত!" হিন্দুরা বিল্বনের অনাসক্ত পরহিতৈষণা দেখিয়া তাহাকে ঘৃণা বা নিন্দা করিতে যেন সাহস করিল না। বিল্বনের কাজ ভালো কি মন্দ তাহারা স্থির করিতে পারিল না। তাহাদের অসম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান সন্দিগ্ধভাবে বলিল "ভালো নহে" কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের ভিতর যে মনুষ্য বাস করিতেছে সে বলিল "ভালো"। যাহা হউক বিল্বন অন্যের ভালোমন্দের দিকে না তাকাইয়া কাজ করিতে লাগিলেন মুমূর্ষু পাঠানেরা তাহাকে দেবতাজ্ঞান করিতে লাগিল। পাঠানের ছোট ছোট ছেলেদের তিনি মড়ক হইতে দূরে রাখিবার জন্য হিন্দুদের কাছে লইয়া গেলেন। হিন্দুরা বিষম শশব্যস্ত হইয়া উঠিল কেহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাহাদিগকে আশ্রয় দিল না তখন বিল্বন একটা পরিত্যক্ত ভাঙ্গা মন্দিরের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ছেলের পাল সেখানে রাখিলেন...” ইত্যাদি।

উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যায় যে সেই চব্বিশ বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের কাছে “মানুষের ধর্ম” কি তা স্পষ্ট হয়েছিল। যে ধর্মে শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস অবিচলিত ছিল। হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে জাতিভেদের সংস্কার যে মানব ধর্মের বিচ্যুতি তাই যে একটি প্রধান কণ্ঠক এটা সেই যুগে যখন রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আভাস মাত্র নেই তখনই রবীন্দ্রনাথ দেখতে পাচ্ছিলেন। তাই গল্পে উপন্যাসেও নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই এই প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। বস্তুত রাজর্ষি উপন্যাসে বিল্বনের এই সমাজ সেবার অংশে পাঠানদের উপস্থিতি উপন্যাসের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অর্ন্তলোকে দেশহিতৈষণার আদর্শে জাতিভেদের কলঙ্ক ও কুসংস্কারের নিরর্থকতা এত বেশি আঘাত করত যে যে কোনো সুযোগে তিনি এই অমানবিক প্রথাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্যত হতেন। ‘গোরা’ উপন্যাসে গোরা স্বদেশের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য “দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া” মনোবৃত্তির উদাত্ত চর্চা করছিল—সে হিন্দুয়ানীর সমস্ত সংস্কারের জটাজাল শুদ্ধ বহুব্যবহৃত জীর্ণ প্রথার জঞ্জাল শুদ্ধ গোটা দেশকেই গ্রহণ করবে। তার যুক্তি উল্টো পথে চলেছে—তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিতদের যুক্তিবাদ থেকে। স্বদেশের সমস্ত অপরাধ শুদ্ধ তাকে গ্রহণ করবে গোরা এবং তর্কের জোরে অন্যায়কে ন্যায় করে নেবে। স্বদেশ প্রীতির এই রূপটি রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়—। সে সময়ে জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে হিন্দুয়ানীর সমর্থনও কতকটা এক হয়ে যাচ্ছিল। কারণ হিন্দু সংস্কারের যে সব মূঢ়তার নিন্দা সাহেবদের মুখে ও ইংরেজি শিক্ষিত সাহেবদের বশংবদদের মুখে শোনা যাচ্ছিল স্বাতন্ত্র্যকামী স্বদেশ প্রেমিকদের অভিমানে তা প্রচণ্ড আঘাত হানত। অথচ গোরা মানুষ হিসাবে খুব বড়, ন্যায় অন্যায়ের বোধও তার জাগ্রত তাই যখন একজন বৃদ্ধ মুসলমানকে রাস্তায় লাঞ্ছিত হতে দেখল তখন সে তাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উৎসাহ দিল। ‘গোরা’ বইটির আরম্ভেই এই কাহিনী আছে... “একটা মোটা ঘড়ির চেনপরা বাবু গাড়ি হাঁকাইতেছিল... একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় এক ঝাঁকা ফল সবজি আণ্ডা, রুটি মাখন প্রভৃতি আহার্য সামগ্রী লইয়া কোনো ইংরেজ প্রভুর পাকশালা অভিমুখে চলিতেছিল। চেনপরা বাবুটি তাহাকে গাড়ির সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য হাঁকিয়াছিল বৃদ্ধ শুনিতে না পাওয়ায় গাড়ি প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। কোনো মতে তাঁহার প্রাণ বাঁচিল কিন্তু ঝাঁকা সমেত জিনিষগুলো রাস্তায় গড়াগড়ি গেল এবং ক্রুদ্ধবাবু কোচবাক্স হইতে [illegible] তাহাকে ড্যাম শুয়ার বলিয়া গালি দিয়া তাহার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুখের উপর সপাং করিয়া চাবুক কষাইয়া দিতে তাহার কপালে রক্তের রেখা দেখা গেল। বৃদ্ধ আল্লা বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া যে জিনিষগুলো নষ্ট হয় নাই তাহা নিজে কুড়াইয়া ঝাঁকায় তুলিতে প্রবৃত্ত হইল...

এ দৃশ্য অসহ হওয়ায় গোরা গাড়ির পিছনে ছুটেছিল কিন্তু চেনপরা বাবু ততক্ষণে দুই তেজস্বী ঘোড়াকে "চাবুক কষাইয়া মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য" হয়েছে। গোরা বৃদ্ধকে বলল "যা লোকসান গেছে সে তো তোমার সইবে না। চলো আমাদের বাড়ি চলো, আমি সমস্ত পুরো দাম দিয়ে কিনে নেব। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি তুমি কথাটি না বলে যে অপমান সহ্য করলে আল্লা তোমাকে এ জন্য মাপ করবেন না" মুসলমান কহিল, 'যে দোষী আল্লা তাহাকেই শাস্তি দেবেন, আমাকে কেন দেবেন?'

গোরা কহিল "যে অন্যায় সহ্য করে সেও দোষী কেন না সে জগতে অন্যায়ের সৃষ্টি করে। আমার কথা বুঝবে না, তবু মনে রেখো ভালমানুষি ধর্ম নয়, তাতে দুষ্ট মানুষকে বাড়িয়ে তোলে। "তোমাদের মহম্মদ সে কথা বুঝতেন তাই তিনি ভালোমানুষ সেজে ধর্ম প্রচার করেননি।"

মহম্মদ সম্বন্ধে এরকম সুবিচার হিন্দুর কলমে আর কোথাও লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। সাধারণত তলোয়ার হাতে ধর্ম প্রচার করেছেন বলে মুসলমান ধর্মের মধ্যে হিংস্র ভাবের নিন্দাই হিন্দু সমাজে প্রচলিত।

'গোরা' উপন্যাস রচনার সময় ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান সমস্যাটা উগ্ররূপে দেখা দেয় নি কিন্তু একদা যে দেখা দেবে তারই পটভূমি তৈরী হচ্ছিল। এ কথা অনেকে বলেন বিশেষত মুসলমান বন্ধুরা বলেন যে বাঙালীর নব-জাগরণের যুগে যে দেশাত্মবোধ জেগেছিল তা বিশেষভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদ। বঙ্কিমের আনন্দমঠ থেকে যার সুরু। গোরার চরিত্রে সেই হিন্দু জাতীয়তার একটা স্পষ্ট ছবি আছে। গোরা বলছে, "এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, যা কিছু স্বদেশের তারই প্রতি সংকোচহীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া। দেশের সম্বন্ধে লজ্জা করে করে আমরা নিজের মনকে দাসত্বের বিষে দুর্বল করে ফেলেছি।" দেশকে আপন করবার আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনবার প্রবল আগ্রহ তখনকার হিন্দু সমাজের স্বাজাত্য-অভিমান এমনি বাড়িয়ে তুলেছিল যে গোরার মত বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষও হিন্দু সমাজের অতীত গৌরব কাহিনী বাণীতে উদ্দীপ্ত হতেন ও সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতিকে নানাভাবে সমর্থন করতেন। এই যে পুরাতন ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফেরান এটা হিন্দু জাগরণ হলেও মুসলমান বিরোধী নয়—মুসলমান তখন রঙ্গমঞ্চের পিছন দিকে, যুদ্ধ হচ্ছিল ইংরেজ ও তার বশংবদদের সঙ্গে।

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু যে কোনো কারণেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রীতি এত দূর পৌঁছত না যে ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ডটি স্বদেশের পক্ষপাতে হেলে থাকবে। তাই নব্য-দেশাত্মবাদীদের যুক্তিজাল যতই সনাতন ধর্মের স্বপক্ষে বিস্তারিত হোক পরেশের মুখ দিয়ে-তিনি বলেন "একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোন দোষ হয় না অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয় মানুষের প্রতি এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে কি বলব?"

গোরা যখন স্বদেশপ্রেমের বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে দেশের চরমতত্ত্বগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রাত্যহিক সমাজ ব্যবস্থায় আরোপ করে হিন্দু সমাজের একটি মহিমাময় মূর্তি মনে মনে গড়েছিলেন সেই সময়ই বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখলেন "এই নিভৃত প্রকাণ্ড ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন কত সঙ্কীর্ণ কত দুর্বল" বিবেকানন্দ যেমন ভারতবর্ষকে চিনবার জন্য পদব্রজে বেরিয়ে পড়েছিলেন ভ্রমণে তেমনি গোরাও বেরিয়ে পড়েছিল পথে।... গ্রামের যে কোনো গৃহস্থ গোরাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভক্তি করিয়া ঘরে রাখিয়াছে তাহার বাড়িতে আহার ব্যবহারের যতই অসুবিধা হউক দিনের পর দিন সে কাটাইয়াছে। তাহার আলাপ শুনিবার জন্য সমস্ত গ্রামের লোক তাহার চারিদিকে সমাগত হইত...

এ থেকে বোঝা যায় গোরা ভ্রমণকালে ব্রাহ্মণের আশ্রয় নিচ্ছে—তারপর?

উভয়ে (গোরা ও তার বন্ধু রমাপতি) চলিতে চলিতে একজায়গায় নদীর চরে এক মুসলমান পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আতিথ্য গ্রহণের প্রত্যাশায় খুঁজিতে খুঁজিতে সমস্ত গ্রামের মধ্যে কেবল একটি মাত্র ঘর হিন্দু নাপিতের সন্ধান পাওয়া গেল। দুই ব্রাহ্মণ তাহারই ঘরে আশ্রয় নিতে গিয়া দেখিল বৃদ্ধ নাপিত ও তাহার স্ত্রী একটি মুসলমানের ছেলেকে পালন করিতেছে...।"

এদিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রমাপতি তো পিপাসায় অস্থির মুসলমানের ঘরে তো জল খেতে পারে না, গোরারও শারীরিক অবস্থা তাই কিন্তু গোরার জাগ্রত মন হিন্দু আচারের সমর্থনে যুক্তির তলোয়ার ঘুরিয়ে বিপক্ষকে পরাজিত করতে সদা ব্যগ্র হওয়া সত্ত্বেও তার সত্যাশ্রয়ী অবচেতন মন সত্যের সামনে এলেই হিন্দু সংস্কারের নিরর্থকতা অনুভব করেছে। যদিও যতক্ষণ না নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত জেনেছে ততক্ষণ সে কথার সম্পূর্ণ ধারণা হয় নি। 'গোরা' উপন্যাসের প্লটের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে ঐ প্রশ্নটি ও তার উত্তর মিলছে যে আচার সংস্কারের ছোট ছোট গণ্ডী দিয়ে ঘেরা যে জাতীয়তা তৈরী তার যথার্থ মূল্য কতটুকু।

"গোরা নাপিতকে তাহার অনাচারের জন্য ভর্ৎসনা করাতে সে কহিল "ঠাকুর আমরা বলি হরি, ওরা বলে আল্লা কোনো [illegible]।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গোরা ছেলেটির মা বাপের সম্বন্ধে প্রশ্ন করে জানতে চাইল এই হিন্দু নাপিত কেন মুসলমানের ছেলে মানুষ করছে। নাপিত যে ইতিহাসটা বলল তা নীলের জমিদারের সঙ্গে প্রজাদের বিরোধের ও পুলিসের অত্যাচারের কাহিনী। “সমস্ত প্রজা বশ মানিয়েছে কেবল এই চর-ঘোষপুরের প্রজাদিগকে সাহেবরা শাসন করিয়া বাধ্য করিতে পারে নাই—এখানকার প্রজারা সমস্তই মুসলমান এবং ইহাদের প্রধান ফরু সর্দার কাহাকেও ভয় করে না। নীলকুঠির উৎপাৎ উপলক্ষে দুই বার পুলিশকে ঠেঙ্গাইয়া সে জেল খাটিয়া আসিয়াছে।”

ক্রমাগত পুলিশের অত্যাচারে ফরু সর্দারের সংসার তখন একেবারে নিরন্ন তখন তার বালক পুত্র তমিজকে নাপিত বৌ নিজের বাড়িতে এনেছে।

গোরা এই সব কাহিনী বিস্তারিত জানতে যখন ব্যস্ত, গোরার সঙ্গী পরম হিন্দু রমাপতি ততক্ষণে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে কেবলি হিন্দু-পাড়ার সন্ধান করছে—জানতে পারল নীলকুঠির তহসিলদার মাধব চাটুজ্জে একমাত্র ব্রাহ্মণ ক্রোশ দেড়েক দূরে বাস করেন। প্রশ্ন করে আরও জানা গেল যে সেই নীলকর সাহেবদের প্রধান সাক্‌রেদ নির্দয় ও অত্যাচারী। কিন্তু রমাপতির তাতে কোনো চিত্ত বিক্ষেপ নেই বরং প্রবলের বিরুদ্ধে মনিবের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চাওয়াই গোঁয়ার মুসলমানের স্পর্দ্ধা ও নির্বুদ্ধিতার চরম বলে মনে হল।

অভ্যাসের বশে রমাপতির সঙ্গে গোরা ব্রাহ্মণ মাধব চাটুজ্জের বাড়ির দিকে যেতে গিয়েও ফিরে এল কারণ তার মনে হতে লাগল দুবৃত্ত অন্যায়কারীর অন্ন কি করে পবিত্রতর হবে—“পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিষ করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কি ভয়ঙ্কর অধর্ম করিতেছি—উৎপাৎ ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে আর উৎপাৎ স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে... তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে!”

বাস্তব অভিজ্ঞতার আঘাতে গোরার চিন্তাশীল মনে এই যে সংশয়ের আন্দোলন অধিকাংশ অভ্যাসবদ্ধ সংস্কার শৃঙ্খলিত মানুষের মনে তা লাগত না। তারা রমাপতির মত মাধব চাটুজ্জের অন্নই পবিত্র মনে করত। গোরাও সেই হিন্দু-সংস্কারকে সমর্থন করবার চেষ্টা করেছে অভিমান বশত কিন্তু যুক্তির আঘাতে তা মাঝে মাঝেই ভেঙ্গে যাচ্ছে।

নিচের তলায় হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে হিতাহিত জ্ঞান রহিত কিন্তু হিন্দুর আচারের মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদের সম্ভবনাকেই বাড়িয়ে তুলছে। ধর্ম মানুষকে মেলাচ্ছে না দূরে ঠেলছে। অপর দিকে মুসলমান সমাজ যখন অমুসলমানের মুখোমুখি হয় তখন তাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ পরায়ণতা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখা দেয় তার জোর কম নয়—কিন্তু নিজ সমাজের মধ্যে মুসলমান যে "মানুষের পরশেরে প্রতিদিন দূরে 'ঠেকিয়ে' রাখে নাই এই জন্যই সে হিন্দু সমাজের চেয়ে সঙ্ঘবদ্ধ ও বলিয়ান হয়েছে। মানব সম্বন্ধের মধ্যে মিলনের গোরার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বলছেন। বাঙলাদেশের পল্লীর মধ্যে হিন্দু মুসলমান সমাজের ছবি তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তাঁর জমিদারীর বেশির ভাগ প্রজা ছিল মুসলমান যাদের প্রতি তাঁর একটি পক্ষপাতপূর্ণ স্নেহপরায়ণতা চিরদিন মনে লেগে ছিল।

"পল্লীর মধ্যে বিচরণ করিয়া গোরা ইহাও দেখিয়াছে মুসলমানদের মধ্যে সেই জিনিষটি আছে যাহা অবলম্বন করিয়া গোরা ইহাও দেখিয়াছে গ্রামে কোনো আপদ বিপদ হইলে মুসলমানেরা যেমন নিবিড়ভাবে পরস্পরের পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হয় হিন্দুরা এমন হয় না।" এর কারণ চিন্তা করে গোরা যে উত্তরটি পেয়েছে সে উত্তরটি স্বীকার করতে তার মান চায়নি কারণ গোরা হিন্দু ধর্মের সমর্থক তাই কোনো বিষয়ে মুসলমান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে তার দ্বিধা তবু তাকে মানতেই হয়েছে যে "ধর্মের দ্বারা মুসলমান এক কেবল আচারের দ্বারা নহে—একদিকে যেমন আচারের বন্ধন তাহাদের সমস্ত কর্মকে অনর্থক বাঁধিয়া রাখে নাই, অন্যদিকে ধর্মের বন্ধন তাহাদের মধ্যে একান্ত ঘনিষ্ঠ। তাহারা সকলে মিলিয়া একটি জিনিষকে গ্রহণ করিয়াছে যাহা 'না' মাত্র নহে, যাহা 'হা'। যাহা ঋণাত্মক নহে যাহা ধনাত্মক যাহার জন্য মানুষ এক আহ্বানে এক মুহূর্তে এক সঙ্গে দাড়াইয়া অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে।"

হিন্দুসমাজের আচারপরায়ণ ধর্মের প্রতি বিমুখ রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সমাজের প্রতি একটু বেশি উচ্ছ্বসিত—সম্ভবত সে সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবেই। কারণ মুসলমান সমাজেও 'না' অর্থাৎ বিধিনিষেধের দিকটা কম উগ্র নয়। জাতিভেদ না থাকলেও মুসলমান অমুসলমানে ভেদ, নারী পুরুষে ভেদ, সমাজের ভিতরে গহ্বর সৃষ্টি করে রেখেছে ও বিশ্বমানবের মিলনের পথ করেছে রুদ্ধ।

এই কথাই পরেশ বলছেন সুচরিতাকে। "মুসলমান সমাজের সিংহদ্বার সমস্ত মানুষের জন্য উদ্ঘাটিত। খৃষ্টান সমাজও সকলকেই আহ্বান করছে। যে-সকল সমাজ খৃষ্টান সমাজের অঙ্গ তাদের মধ্যেও সেই বিধি...

"হিন্দু ঠিক তার উল্টো তার সমাজে প্রবেশ করবার পথ একেবারে বন্ধ, বেরোবার পথ শত সহস্র... সেইজন্য কিছুকাল থেকে কেবলই দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে। এ রকম চললে ক্রমে এদেশে মুসলমান প্রধান হয়ে উঠবে তখন একে হিন্দুস্থান বলাই ভুল হবে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গোরা যখন জানতে পারল সে ব্রাহ্মণ নয় হিন্দু নয় এমন কি ভারতীয়ও নয় তখন সে যে মুক্তির স্বাদ পেল সেই মুক্তিই মানুষের জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা; মুসলমান সমাজে সে বস্তু লভ্য নয়। গোরা পরেশবাবুকে বলছে—"আপনি আজ আমাকে সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই, যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

চতুরঙ্গ

হিন্দু সমাজের অচলায়তনের মধ্যে যখন মুক্ত ভাবনা ও যুক্তিবাদের প্রবর্তনা ক্রমে ক্রমে এক একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে এক এক ভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল তার মধ্যে কিছু কিছু মানুষ নূতন চিন্তায় বিভোর হয়ে নূতন পথের নির্দেশ খুঁজে সমাজের মধ্যে ছন্ন ছাড়া হয়ে পড়েছিলেন। চতুরঙ্গ কাহিনীর জ্যাঠামশাই ও তাঁর ভাইপো শচীশ সেই গোত্রের।

জ্যাঠামশাইর সঙ্গে শচীশের চরিত্রগত পার্থক্যও অনেক। জ্যাঠামশাই তৎকালীন হিন্দু সমাজের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধগুলির গলদ ও নূতন মূল্যবোধের সূচনা করতে চাইছেন, তাঁর চেলা শচীশ তার উপর আরো কিছু চায়। সে দার্শনিক। দার্শনিক ভাবের অর্থাৎ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন ও অনুভূতির নানা আঘাতের মধ্যে সে সত্যকে উপলব্ধি করতে চাইছে—এই কাহিনী একটি গল্প নয় বরং একটি সুসম্পূর্ণ কাব্য। শচীশের বর্ণনা করা চলে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা দিয়েই "পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম, কস্তুরী মৃগ সম"—। শোনা যায় যে শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র কবিপ্রকৃতির সতীশচন্দ্রই এ চরিত্রের প্রেরণা।

যাহোক এই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস যাকে কাব্য বলাও চলে সেই গ্রন্থের সূচনাতে তৎকালীন হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের প্রসঙ্গে, জাতিভেদের বিরুদ্ধে জ্যাঠামশায়ের বিদ্রোহ ও সেই প্রসঙ্গে মুসলমান সমাজের বিষয়ে যা লিখেছেন তা মুসলমান সমাজের প্রধান প্রশংসনীয় দিকগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সদা জাগ্রত চিন্তার প্রমাণ। শচীশের জ্যাঠামশায় জগমোহন নামজাদা নাস্তিক। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের সঙ্গে তার তর্ক ছিল এই রকম :—

"ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে ঈশ্বর নাই—

অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে ঈশ্বর নাই"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই কথাই অন্যভাবে আরেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "My God has given me freedom to deny him" এদেশের ঈশ্বরে বিশ্বাস ও কুসংস্কারে বিশ্বাস এমনি ঘেষাঘেষি মেশামেশি হয়ে বাস করে একটাকে নাড়তে গেলে অন্যটাতে টান পড়ে। "জগমোহনের নাস্তিক্য ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা" সে ভালো করা আস্তিক লোকদের মত কোনো লাভের উদ্দেশ্যে নয়—তাতে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি। জগমোহনের ব্রত হয়েছিল প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখ সাধন (greatest good of the greatest number) সমাজের আইন কানুন মেনে পূণ্য লোভে এ কাজ নয়—এতে না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বকশিসের আশা বা চোখ রাঙানি।"

এই প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখ সাধনের কাজে তাঁর প্রধান চেলা ছিল তাঁর ভাইপো শচীশ যদিও তাঁর ভাই হরিমোহন অর্থাৎ শচীশের বাবা ছিলেন একেবারে বিপরীত।

"পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড় আড়ত। সেখানকার যত মুসলমান ব্যাপারী এবং চামারদের লইয়া জ্যাঠায় ভাইপোয় মিলিয়া এমনি ঘনিষ্ঠ রকমের হিতানুষ্ঠানে লাগিয়ে গেলেন যে, হরিমোহনের ফোঁটা তিলক আগুনের শিখার মতো জ্বলিয়া তাঁর মগজের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইবার জো করিল।"

জগমোহন একদিন ঐ মুসলমান প্রতিবেশী চামারদের নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিজ হাতে পরিবেশন করে খাওবার ব্যবস্থা করলেন। বলা বাহুল্য সংস্কার ভাঙ্গার জন্যই তাঁর এই অধ্যবসায়—এই সূত্রে বলতে হয় যেমন একদিকে অন্ধ মূঢ় শাসনে হিন্দু সমাজ অবরুদ্ধ তেমনি অন্যদিকে বন্ধন মোচনকারীর সংখ্যাও বড় কম ছিল না। বার বার তাঁরা এই সমাজের মধ্যে থেকেই মুক্তির সাধনা করে গেছেন—সেই সাধনাই হিন্দুকে সচলতা দিয়েছে, তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

কিন্তু মুসলমান সমাজে যেটুকু উদারতা কোরাণে অনুমোদিত তার চেয়ে এক পা এগোবার উপায় নেই। সেইজন্য অনেকখানি সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মুসলমান সমাজ সচলতা পেল না। ক্রমেই সংস্কারে ও মূঢ়তায় হিন্দু সমাজের চেয়েও কঠিনতর অনুশাসন বদ্ধ হয়ে রইল। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে এই অন্ধতার দিকটা তেমন করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

"হরিমোহন রাগে অস্থির হইয়া শচীশকে ডাকিয়া কহিল, তুই নাকি যত তোর চামার বাবাদের ডাকিয়া এই বাড়িতে আজ খাওয়াইবি?"

"জগমোহন কহিলেন, তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ, আমি কথা কই না। আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব ইহাতে বাধা দিও না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তোমার ঠাকুর!"

"হা, আমার ঠাকুর।"

"তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ?"

"ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে তাহাকে চোখে দেখা যায় না। আমরা সজীবকে মানি; তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।"

"তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা?"

"হা, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার দেবতা তা পারে না আমি সেই আশ্চর্য রহস্য দেখিতে ভালোবাসি তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি—দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে খুশি হইতে।"

এই কথাই অপমানিত কবিতায় অমোঘ স্বরে উচ্চারিত—"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে, ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে"—এই কাহিনীর শেষের দিকে উল্লেখ আছে শ্রীবিলাস ও দামিনী যখন শচীশের অনুরোধে তার বাড়িতে বাস করতে এল হরিমোহন দখল দিতে নারাজ—তখন শ্রীবিলাস লিখছে "আমার প্রধান সহায় ছিল পাড়ার মুসলমানরা। আর কিছু নয় জগমোহনের উইলখানা একবার তাদের দেখাইয়াছিলাম আমাকে আর উকীল বাড়ি হাঁটা হাঁটি করতে হয় নাই।"

একতাবদ্ধ মুসলমান সমাজের মধ্যে যে একটা জোর আছে একথাটা রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে নানা কাহিনীর সূত্রে কারণে এবং অকারণে উল্লেখ করেছেন।

কবিতা :

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গল্প ও কাহিনীতে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলাম। রবীন্দ্র রচনায় এ বিষয়টি গদ্য-প্রবন্ধে নানা ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কবিতায় অবশ্য এ প্রসঙ্গ স্পষ্ট ভাবে নেই শুধু জাতিভেদ সম্বন্ধে বহু কবিতায় তাঁর ধিক্কার বাণী উচ্চারিত। তবে সেটা হিন্দু সমাজের একটা সামাজিক গলদ বা সামাজিক অবিচারের প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে—এ রকম কবিতা বহু আছে। এ ছাড়া কথা ও কাহিনীর রাজপুত ও শিখ কাহিনী মূলক কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুসলমান সম্পর্কে স্পষ্টতই মুসলমানের স্বপক্ষে নয় একথা পূর্বেই বলেছি। এই বিপক্ষতা অবশ্য প্রধানতই রাজার অবিচারের বিরুদ্ধে দুর্বলের বিদ্রোহ ঘোষণায় দুর্বলের পক্ষ অবলম্বন। বিপুল রাজশক্তির সামনে শিখদের আত্মশক্তির উদ্বোধন ও রাজপুতদের আত্ম-সম্মানবোধ ইত্যাদির প্রসঙ্গে সবল ও অবলের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ 'অবলের' দিকেই সহানুভূতি সম্পন্ন। যেমন "হোথা বার বার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে!" কিংবা "বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক সাঁড়াশী করিয়া দগ্ধ" কিংবা "যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা" এগুলি কোনটাই হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব নয়, ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব।

পূর্বেই বলেছি মোহাম্মদী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে 'বিচারক' কবিতাটি নিয়ে বিষোদ্গারণ হয়েছিল। 'কথা ও কাহিনীর' 'বিচারক' কবিতার কাহিনী প্রচলিত মারাঠী গাঁথা থেকে নেওয়া, এখানে এই কবিতাটির একটু বিশদ আলোচনা করছি যাতে বোঝা যাবে মানুষ যখন অন্ধ হয় তখন আলোকেও অন্ধকার বলে ভ্রম হয় মারাঠার রঘুনাথ রাওর সঙ্গে মৈশুরাপতি হায়দারালির দ্বন্দ্বের কথা লেখা হয়েছে এ কবিতায়, যদিও সেটা কাহিনীর মুখ্য বক্তব্য নয়। "পূণ্য নগরে রঘুনাথ রাও পেশোয়া নৃপতি বংশ। রাজসনে উঠি কহিলেন বীর হরণ করিব ভার পৃথিবীর মৈশুরাপতি হায়দরালির দর্প করিব ধ্বংস," তারপর যখন আশি সহস্র সৈন্য নিয়ে রঘুনাথ রাও হায়দরালিকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চলেছেন—তখন রাজগুরু বিচারক ও পুরহিত ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। তখন, "প্রভু কেন আজি কহে রঘুনাথ, অসময়ে পথ রুধিলে হঠাৎ চলেছি করিতে যবন নিপাত যোগাতে যমের খাদ্য"—

রামশাস্ত্রী বললেন, "বধিয়াছ তুমি আপন ভ্রাতার পুত্রে। বিচার তাহার না হয় যদিন ততকাল তুমি নহ তো স্বাধীন। বন্দী রয়েছে অমোঘ কঠিন ন্যায়ের বিধান সূত্রে।"

রঘুনাথ রাও উপদেশ শুনবার পাত্র নয়—সে বললে, "নৃপতি কাহার বাঁধন না মানে চলেছি দৃপ্ত মুক্ত কৃপাণে শুনিতে আসিনি পথ মাঝখানে ন্যায় বিধানের ভাষ্য।"

বিচারক যদি রাজার অপরাধের দণ্ড না দিতে পারে তবে তার বিচারকের আসনের মূল্য কি? তাহলে তো বিচার প্রহসন হয়। তাই ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী বললেন রঘুনাথ রাওকে, "যাও কর গিয়ে যুদ্ধ, আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার বিচারশালার খেলাঘরে আর হিব না অবরুদ্ধ।"

কিন্তু মোহাম্মদীর সম্পাদকের কাছে ঐ লাইনটাই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ "চলেছি করিতে যবন নিপাত।" তাহলে রবীন্দ্রনাথও যবন নিপাত করতে চান! সমস্ত কবিতাটির অমূল্য বাণী তখন মুসলমানের কাছে ব্যর্থ করা হয়েছিল। এই ভাবে

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বাঙলা সাহিত্যের অনেক গভীর দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা, থেকে মুসলমান সমাজের এক বৃহৎ অংশ দীর্ঘদিন অজ্ঞ ছিল এবং সম্ভবত আজও আছে।

প্রবন্ধ :

এর পরে হিন্দু মুসলমান প্রসঙ্গ নিয়ে বহু দিক প্রসারী রবীন্দ্রচিন্তার কিছুটা আলোচনা করা যাক।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনীহা। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার তার ব্যক্তিগত জীবন সত্তার সঙ্গে ওতপ্রতোভাবে জড়িত। তাকে পৃথক করে একটা কাঠামোর মধ্যে অনড় করে ফেলে তা সত্য ভ্রষ্ট হয়ে যায়, মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টি করে। 'ধর্মমূঢ়' কবিতায় এই তত্ত্বটি বলা হয়েছে। যা মানুষের ধর্মেও বলা হয়েছিল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মুসলমানেরা দেশের কর্তিত মূর্তি দেখে যে শঙ্কিত হয়নি—এতে রবীন্দ্রনাথ পীড়িত হয়েছিলেন। তখন ইংরেজ বিভেদ সৃষ্টি করে তুলছিল, যে কথা আজও বলা হয়—যে হিন্দু মুসলমানের বিভেদটা শত্রুর সৃষ্টি, সে কথা রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি অনুমোদন করছেন না। তাঁর মতে প্রভেদ ছিল তাই সেটাকে অবলম্বন করে বিভেদ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। 'আত্মশক্তি ও সমূহে' তাই লিখছেন :—

"যখন পশুসত্ত্বার বিকার আমরা আত্মিক সত্যে আরোপ করি তখন সেই প্রমাদ সবচেয়ে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। কেন না তখন আমাদের হওয়ার ভিত্তিতে লাগে আঘাত। জানার ভুলের চেয়ে হওয়ার ভুল কত সর্বনেশে তা বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই, বিজ্ঞানের সাহায্যে যে শক্তিকে আমরা আয়ত্ত করেছি সেই শক্তিই মানুষের হিংসা ও লোভের বাহন হয়ে তার আত্মঘাতকে বিস্তার করছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এই জন্যেই সম্প্রদায়ের নামে ব্যক্তিগত বা বিশেষ জনগত স্বভাবের বিকৃতি মানুষের পাপ বুদ্ধিকে যত প্রশ্রয় দেয় এমন বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তিতে কিংবা বৈষয়িক বিরোধেও না। সাম্প্রদায়িক দেবতা তখন বিদ্বেষ-বুদ্ধির, অহংকারের, অবজ্ঞাপরতার, মূঢ়তার দৃঢ় আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়, শ্রেয়ের নামাঙ্কিত পতকা নিয়ে অশ্রেয় জগদ্‌ব্যাপী অশান্তির প্রবর্তন করে স্বয়ং দেবত্ব অবমানিত হয়ে মানুষকে অবমানিত ও পরস্পরের ব্যাবহারে আতঙ্কিত করে রাখে। আমাদের দেশে এই দুর্যোগ আমাদের শক্তি ও সৌভাগ্যের মূলে আঘাত করছে।"

"এদিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইয়া গেল, আমরা হিন্দু মুসলমান একই দেশমাতার দুই জানুর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
উপরে বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।

এই দুর্বলতার কারণ যতদিন আছে ততদিন আমাদের দেশের কোনো মহৎ আশাকে সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভবপর হইবে না, আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্তব্যপালনই পদে পদে দুরূহ হইতে থাকিবে।

বাহির হইতে এই হিন্দুমুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে ভীত হইব না—আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব। এই উত্তেজনা কালক্রমে আপনিই মরিতে বাধ্য। কারণ, এই আগুনে নিয়ত কয়লা জোগাইবার সাধ্য গবর্মেন্টের নাই। এ আগুনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে শীঘ্রই ইহা এমন সীমায় গিয়া পৌঁছিবে যখন দমকলের জন্য ডাক পাড়িতেই হইবে। প্রজার ঘরে আগুন ধরিলে কোনোদিন কোনো দিক হইতে তাহা রাজবাড়িরও অত্যন্ত কাছে গিয়া পৌঁছিবে। যদি এ কথা সত্য হয় যে, হিন্দুদিগকে দমাইয়া দিবার জন্য মুসলমানদিগকে অসংগত প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্তত ভাবগতিক দেখিয়া মুসলমানদের মনে যদি সেইরূপ ধারণা দৃঢ় হইতে থাকে, তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি রাজাকেও ক্ষমা করিবে না। কারণ, প্রশ্রয়ের দ্বারা আশাকে বাড়াইয়া তুলিলে তাহাকে পূরণ করা কঠিন হয়। যে ক্ষুধা স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো যায়, যোগ্যতার স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো যায়, যোগ্যতার স্বাভাবিক দাবিরও সীমা আছে, কিন্তু প্রশ্রয়ের দাবির তো অন্ত নাই। তাহা ফুটা কলসীতে জল ভরার মতো। আমাদের পুরাণে কলঙ্কভঞ্জনের যে ইতিহাস আছে তাহারই দৃষ্টান্তে গবর্মেন্ট, প্রেয়সীর প্রতি প্রেমবশতই হউক অথবা তাহার বিপরীত পক্ষের প্রতি রাগ করিয়াই হউক, অযোগ্যতার ছিদ্রঘট ভরিয়া তুলিতে পারিবেন না। অসন্তোষকে চিরবুভুক্ষু করিয়া রাখিবার উপায় প্রশ্রয়, সমস্ত শাঁখের করাতের নীতি, ইহাতে শুধু একা প্রজা কাটে না, ইহা ফিরিবার পথে রাজাকেও আঘাত দেয়।

"এই ব্যাপারের মধ্যে যেটুকু ভালো তাহাও আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গবর্মেন্টের চাকুরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অসূয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত যে জ্ঞাতিদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া ওঠে না, যখন বুঝবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন যে এক দেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনোই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না, তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।"

হিংসা কি? বিলাতী কাপড়, বিদেশী জিনিষ বর্জনের ব্যাপারটা অসহযোগ আন্দোলন। কিন্তু হত্যাই হিংসার একমাত্র রূপ নয়। রবীন্দ্রনাথ সব রকম জবরদস্তিকেই হিংসার পর্যায়ে ফেলেন। সেজন্য আমরা দেখেছি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তিনি এই প্রসঙ্গটাকে বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন। একটি দরিদ্র ফেরিওলার কাছ থেকে কাপড় কেড়ে নিয়ে পোড়ানোর মধ্যে যে জবরদস্তি আছে রবীন্দ্রনাথের কাছে তা হিংসা। কিন্তু দরিদ্রতম লোকটিও নিজের হাতে তার বিলেতি বস্ত্রটি পুড়িয়ে ফেলতে পারে যদি সে মনে মনে এই কাজের সহযোগী হয়।

যে কাজে মন নেই সেই কাজ কাউকে দিয়ে জোর করে করান রবীন্দ্রনাথের মতে হিংসা। কি সামাজিক কি রাজনৈতিক কি ব্যক্তিগত কোনো কারণেই কোনো মানুষের উপর জবরদস্তি করা তাঁর মতে হিংসা এবং কারু তাতে অধিকার নেই। তাই তিনি বলে :—

"I do not believe in compelling fellow workers by coercion; for all free ideas must work themselves out from freedom. Only a moral tyrant can think that he has the dreadful power to make his thought prevail by means of subjection. There are men who make idols of their ideas and sacrifice humanity before their altars but in my worship of ideas I am not a worshipper of Goddess Kali"

ব্যক্তিই রবীন্দ্রনাথের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান—মানুষকে পীড়িত করার অধিকার কারু আছে এটা তিনি স্বীকার করেন না। অবশ্য এভাবে কাব্যের জগৎ চলবে কিন্তু রাজনীতির জগৎ কি চলতে পারে? তবে এটাও ঠিক যে জবরদস্তির নীতিও সুফল ফলায় না সব ক্ষেত্রে। অসহযোগ আন্দোলনে অনেক মুসলমান একনিষ্ঠ সহায়ক ছিলেন কিন্তু গ্রামের মুসলমানদের পাওয়া যায়নি। এজন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত

~ www.amarboi.com ~

নেতৃবৃন্দকে দায়ী করেন। যাঁরা সামাজিক ব্যবধানকে দূর করার জন্য কোনো চেষ্টা না করে কেবল সুবিধার জন্য মুসলমানকে ডাক দিচ্ছিলেন।—

"হিন্দু মুসলমান এক হইলে পরস্পরের কত সুবিধা একদিন কোনো সভায় মুসলমান শ্রোতাদিগকে তাহাই বুঝাইয়া বলা ইহতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারি নাই যে, সুবিধার কথাটা এস্থলে মুখে আনিবার কথা নহে; দুই ভাই এক হইয়া থাকিলে বিষয়কর্ম ভালো চলে, কিন্তু সেইটেই দুই ভাই এক থাকিবার প্রধান হেতু হওয়া উচিত নহে। কারণ, ঘটনাক্রমে সুবিধার গতি পরিবর্তন হওয়াও আশ্চর্য নহে। আসল কথা, আমরা এক দেশে এক সুখদুঃখের মধ্যে একত্রে বাস করি, আমরা মানুষ, আমরা যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম। আমরা উভয়েই একদেশের সন্তান—আমরা ঈশ্বরকৃত সেই ধর্রে বন্ধন বশত, শুধু সুবিধা নহে, অসুবিধাও একত্রে ভোগ করিতে প্রস্তুত যদি না হই, তবে আমাদের মনুষ্যত্ব ধিক্। আমাদের পরস্পরের মধ্যে, সুবিধার চর্চা নহে, প্রেমের চর্চা, নিঃস্বার্থ সেবার চর্চা যদি করি তবে সুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা পুরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তাহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব।"

"যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই মনে মনে যোগ দিতে পারেনি"—তাদের উপর হঠাৎ অসহযোগের জবরদস্তি তিনি অনুমোদন করেন না সেই কারণেই বিলাতী বস্ত্র পোড়াবার চেষ্টা তাদের পক্ষে উৎপাত বলে মনে হবে এবং শেষ পর্যন্ত সুফল ফলবে না বলেই তাঁর বিশ্বাস।

"অবশেষে যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই যোগ দিতে পারে নাই, যাহারা বরাবর যে পথে চলিয়া আসিতেছিল সেই চিরাভ্যস্ত পথ হইতে হঠাৎ ইংরাজি পড়া বাবুদের কথায় সরিতে ইচ্ছা করিল না, আমরা যথাসাধ্য তাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য আমাদের জেদ বাড়িয়া গিয়াছে, আমরা নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছি, যাহারা আত্মহিত বুঝে না বলপূর্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত করাইব।

"আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই; আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রুতবেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবা নাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নি-প্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায়। কাজ ফাঁকি দিবার জন্য, পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনই এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখনই প্রমাণ

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কী অমূল্য ধন তাহা আমরা জানি না। আমরা মনে করি, আমার মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়, অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে পথে চলে তবে ভালোই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে—অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জবরদস্তি।

"বয়কটের জেদে পড়িয়া আমরা এই সকল সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবুদ্ধির মূলে আঘাত করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইল মফস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি, সেখানকার কোনো একটি বড়ো বাজারের লোকে নোটিশ পাইয়াছে যে, যদি তাহারা বিলাতি জিনিস পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিসের আমদানি না করে তবে নির্দিষ্ট কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে, সেই সঙ্গে স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হইয়াছে।

"এইরূপভাবে নোটিশ দিয়া কোথাও কোথাও আগুন লাগানো হইয়াছে। ইতিপূর্বে জোর করিয়া মাল আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং খরিদদারদিগকে বলপূর্বক বিলাতি জিনিস খরিদ করিতে নিরস্ত করা হইয়াছে। ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন লাগানো এবং মানুষ মারাতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ উৎপাতকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন না। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, দেশের হিতসাধনের উপলক্ষে এরূপ উপদ্রব করা যাইতে পারে।

"ইঁহাদের নিকট ন্যায়ধর্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা। ইঁহারা বলেন, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যাহা করা যাইবে তাহা অধর্ম হইতে পারে না কিন্তু অধর্মের দ্বারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল কখনোই হইবে না সে কথা বিমুখ বুদ্ধির কাছেও বার বার বলিতে হইবে।

"জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া আমরা বিলাতি কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না। দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী প্রচারের ব্রত লইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না।"

এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না। যাঁহারা কখনও বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে, তাহারা আজ কাপড় পোড়ানো বা অন্য যে কোনো উপলক্ষে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে ইহা আমরা সহ্য করিব না।"

~ www.amarboi.com ~

দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং নমঃশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া এমন কি ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিলাতি সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।

"তাই বলিতেছি, বিলাতি দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহ-বিচ্ছেদের মতো এত বড়ো অহিত আর কিছুই নাই। দেশের এক পক্ষ প্রবল হইয়া কেবলমাত্র জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মত শৃঙ্খলে দাসের মতো আবদ্ধ করিবে, ইহার মতো ইষ্টহানিও আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া বন্দেমাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না; ভয় দেখাইয়া, এমন কি কাগজে কুৎসিৎ গালি দিয়া, মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্য সাধন বলে না।

"এ সকল প্রণালী দাসত্বের প্রণালী। যাহারা এইরূপ উপদ্রবকে দেশহিতের উপায় বলিয়া প্রচার করে তাহারা স্বজাতির লজ্জাকর হীনতারই পরিচয় দেয় এবং এই প্রকার উৎপাত করিয়া যাহাদিগকে দলন দমন করিয়া দেওয়া যায় তাহাদিগকেও হীনতাতেই দীক্ষা দেওয়া হয়।"

হিন্দু মুসলমানের প্রসঙ্গে শুধু নয় হিন্দুজাতির সামাজিক ধর্মে বিচারের চেয়ে আচার প্রবণতার ঝোঁক যে তার সহজ গতিকে প্রতিহত করছে—"আচারের মরুবালুরাশি" যে পথ রোধ করে তার অগ্রগতি বন্ধ করেছে একথা নানাভাবে রবীন্দ্রনাথ বার বার বলছেন। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক প্রশ্নেও সেই একই সত্য আবার বলছেন তিনি—

'য়ুরোপে সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে, হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারও সঙ্গে কারও মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানস প্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না, শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে ডানার চেয়ে খাঁচাই বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে—তারপরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। **হিন্দুমুসলমানের মিলন যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে**। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই—কারণ, অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব—যদি না আসি তবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক শুধু নয়, যে কোনো রকম সত্য জীবন বোধ গড়ে তোলার জন্য মনের যে মুক্তি প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে তারই কথা বলা হয়েছে।

মুক্তিসাধক রবীন্দ্রনাথ খাঁচা খোলবার সাধনাই করেছেন। শাস্ত্রবাক্যে তিনি সে নির্দেশ খোঁজেননি—"মুক্তি তত্ত্ব খুঁজতে ফিরিস তর্কশিরোমনির পিছে হায়রে মিছে—হায়রে মিছে"—দুঃখ করে তাই নানা জায়গায় লিখছেন এদেশের আচারমুখী ধর্মের কথা—"আমার বাঙালী জন্ম প্রায় শেষ করে এনেছি, আজ আমার ক্লান্ত আয়ুর অন্তিম নিবেদন এই যে, যদি জন্মান্তর থাকে তবে যেন বাংলাদেশে আমার জন্ম না হয়—এই পূণ্যভূমিতে পূণ্যবানেরাই জন্মে জন্মে লীলা করতে থাকুন—আমি ব্রাত্য, আমার গতি হোক সেই দেশে যেখানে আচার শাস্ত্রসম্মত নয় কিন্তু বিচারসম্মত। (চিঠিপত্র নবম খণ্ড)

আচার এবং বিচারের দ্বন্দ্বে মনুষ্যত্বকে মূঢ়তার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে যে যুক্তির ও বুদ্ধির শক্তি ভারতের জন্য রবীন্দ্রনাথ তারই প্রার্থনা করেছেন তাঁর নৈবেদ্যের "চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির" এই প্রসিদ্ধ কবিতায়—

সামাজিক জীবনে ধর্মকে আচারের গণ্ডিতে ঘেরা, মানুষকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া—হিন্দুর সমাজ জীবনে এত প্রবল বলেই মানবিক প্রসারতার ক্ষেত্র তার সঙ্কীর্ণ।

"পূর্বেই বলেছি, মানবজগৎ এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মের দ্বারাই আত্ম ও পর এই দুই ভাগে অতি মাত্রায় বিভক্ত হয়েছে। সেই পর চিরকালই পর হয়ে থাক, হিন্দুর এই ব্যবস্থা; সেই পর, সেই ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ, কোনো ফাঁকে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে না পড়ে, এই তার ইচ্ছা। মুসলমানের তরফে ঠিক এর উল্টো। ধর্মগণ্ডির বহির্বর্তী পরকে সে খুব তীব্রভাবেই পর বলে জানে; কিন্তু সেই পরকে, সেই কাফেরকে বরাবরকার মতো ঘরে টেনে এনে আটক করতে পারলেই সে খুশি। এদের শাস্ত্রে কোনো একটা খুঁটে বের করা শ্লোক কী বলে সেটা কাজের কথা নয়—কিন্তু লোক ব্যবহারে এদের এক পক্ষ শত শত বৎসর ধরে ধর্মকে আপন দুর্গম দূর্গ করে পরকে দূরে ঠেকিয়ে আত্মগত হয়ে আছে, আর অপর পক্ষ ধর্মকে আপন ব্যূহ বানিয়ে পরকে আক্রমণ করে তাকে ছিনিয়ে এনেছে। এতে করে এদের মনঃপ্রকৃতি দুই রকম ছাঁদের ভেদবুদ্ধিতে একেবারে পাকা হয়ে গেছে। বিধির বিধানে এমন দুই দল ভারতবর্ষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রধান স্থান অধিকার করে নিয়েছে—আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে, আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে।"—সমাজ (পৃষ্ঠা ৬১৩)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ যে যুগ পরিবর্তনের কথা বলছেন, সে যুগ পরিবর্তন সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। ধর্মের সঙ্গে সমাজের, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের পরিবর্তন। উচ্চ নিচের ভেদাভেদের প্রশ্ন শুধু তো জাতি ও ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, ধনের ক্ষেত্রেও তার প্রভাবের শক্তি জাতিভেদের চেয়েও মারাত্মক। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে অন্য কোনো উচ্চতর মূল্য বেধানে নিয়ন্ত্রিত করতে হলে কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রকে শুদ্ধ করা যায় না—তার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তাই রবীন্দ্রনাথ যুগপরিবর্তনের কথা বলছেন। বুদ্ধিহীনতা থেকে যুক্তির যুগে, ভেদাভেদ থেকে শোষণ থেকে অবমাননা থেকে মুক্তির যুগে পৌঁছনার কথা তিনি ভাবছেন এবং এই যুগ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তার দান অপরিমিত। কোনো হিন্দু আচার পরায়ণা মহিলাকে লিখছেন :—

"যখন তুমি বিচারের চেয়ে আচারকে, বুদ্ধির চেয়ে সংস্কারকে, পুরুষকারের চেয়ে গ্রহকে প্রাধান্য দিতে চাও এবং দিয়ে বল সেটা হিন্দুধর্ম তখন মন পীড়িত হয়।"

দেশের এই যুগ পরিবর্তনের জন্য রবীন্দ্রনাথ ধর্ম শূন্যতা বা ধর্মহীনতা চান না, চান এক নূতন ধর্মের উজ্জীবন। তাই তিনি বলেন, "আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয় প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়—আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে যেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা সত্য, পিত্তিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে... কিন্তু যেখানে মন্দিরের দেবতা মানুষের দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী, যেখানে দেবতার নামে মানুষ প্রবঞ্চিত সেখানে আমার মন ধৈর্য মানে না। গয়াতে যখন বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন পশ্চিমের কোনো পূজা মুগ্ধা রাণী পাণ্ডার পা মোহরে ঢেকে দিয়েছিলেন—ক্ষুধিত মানুষের অন্নের থালি থেকে কেড়ে নেওয়া অন্নের মূল্যে এই মোহর তৈরী। দেশের লোকের শিক্ষার জন্য অন্নের জন্য আরোগ্যের জন্য এরা কিছু দিতে জানে না, অথচ নিজের অর্থ সামর্থ্য সময় প্রীতিভক্তি সমস্ত দিচ্ছে সেই বেদীমূলে যেখানে তা নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে।"

"এই নিরর্থক ধর্মচর্চা মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যকারের মিলনের প্রতিবন্ধক। সংসারের যে ক্ষেত্রটা বুদ্ধির ক্ষেত্র, সেখানে বুদ্ধির যোগেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য মিলন সম্ভবপর। সেখানে অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা।" (সমাজ)

হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বাহিরে উভয়েরই জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই যে দূরত্বের ভেদ এরা নিজেদের চারিদিকে অত্যন্ত মজবুত করে গেঁথে রেখেছে, এতে করে সকল মানুষের সঙ্গে সত্যযোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে, ধর্মগত ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের সংকীর্ণভাবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই জন্যেই মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে নিত্য সত্যের চেয়ে বাহ্য বিধান, কৃত্রিম প্রথা, এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে।"

সমাজের মধ্যে এই সঙ্কীর্ণতা অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতাই তাঁর মতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ভিত্তি ভূমি। "যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিয় স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে?" (সমাজ)

হিন্দু মুসলমানের বিভেদের মূল ও স্বরূপ তাঁর বিশেষভাবে লক্ষ্য হয় জমিদারীতে কাজ করতে গিয়ে। কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মুসলমান সভ্যতা সংস্কৃতির ছাপ ছিল তাঁদের বেশভূষা আসবাব পত্রে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় কবি ছিলেন হাফিজ সূফী ধর্মের প্রভাবও তাঁদের মধ্যে ছিল—তাছাড়া পিয়ালী অর্থাৎ পির ও আলি শব্দ সংযুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ হলেও তাঁরা মুসলমান ঘেঁষা। ব্রাহ্ম হবার আগে থেকেই তাঁরা ব্রাত্য—হিন্দু সমাজের কোনের দিকে তাঁদের আসন। কোনো সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ কুলে ঠাকুর বাড়ির পুত্র কন্যার বিবাহ সম্ভব ছিল না, মুসলমান সংসর্গের জন্যই। কেউ কেউ বলেন যশোরবাসী এঁদের কোনো পূর্ব পুরুষের নাকে গোমাংস রান্নার গন্ধ গিয়েছিল কেউ বা বলেন, জোর করে গোমাংস খাওয়ান হয়েছিল—ঠিক ব্যাপার কি তা জানা সহজ নয়। তবে তাঁরা পিরালী ব্রাহ্মণের ঘরে ছাড়া বিবাহ করতে পারতেন না বা তাঁদের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলে কুলীন ব্রাহ্মণও পিরালী হয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি যে গুজব ছিল যে তাঁদের বংশে কোনো আর্মানী মুসলমানীর রক্ত সংযোগ ঘটেছিল। কিন্তু একথা অন্য কোথাও পাইনি। অবশ্য ঠাকুরবাড়ির অধিকাংশ মানুষেরই আকৃতি যে বাঙালী সুলভ নয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যাই হোক ঠাকুরবাড়িতে মুসলমান বিদ্বেষের চিহ্ন মাত্র ছিল না—"মানুষের পরশেরে ঠেকাইয়া দূরে" রাখার অভ্যাস ছিল না—সম্ভবত জমিদারীর কার্যোপলক্ষে কুষ্টিয়াতে থাকার সময়ই এই প্রভেদ তাঁর বিশেষভাবে লক্ষ্য হয়েছে। তিনি কোনো দিন ভুলতে পারেননি যে জমিদারী সেরেস্তায় হিন্দু মুসলমানের বসবার পৃথক ব্যবস্থা ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও সে কথা স্মরণ করতেন। বিশেষত তাঁর প্রজাদের স্নেহ প্রীতি ও তাদের সরল হৃদয়ের শ্রদ্ধা তাঁকে কিভাবে অভিভূত করেছিল—'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে তা লেখা আছে। এই সব প্রজারা অধিকাংশই ছিল মুসলমান। জমিদার ও প্রজার যে বীভৎস সম্বন্ধের কথা আজকাল ঘোষণা করা হয়ে থাকে 'ছিন্নপত্র' পড়লে বা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে তা মনে হত না। যে সব প্রজাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যোগাযোগ নেই। তাদের কথা বলতে তিনি বিগলিত হয়ে যেতেন। সেই সরল বিশ্বাস পরায়ণ প্রভুবৎসল মানুষগুলির কথা শোনবার সৌভাগ্য ব্যক্তিগতভাবে আমার অনেক হয়েছে—আজকের জগতে সে মানুষগুলি হারিয়ে গেছে—কিন্তু কবির চিত্তে তাদের উপস্থিতিই তাঁকে মানুষের কবি হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাদের জন্যই তিনি মানুষের ধর্ম কি তা বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি বলছেন—

"একটা কথা শুনেছ বোধহয় যে আমি একজন অত্যাচারী জমিদার (বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ নিন্দার ব্যসন তাঁকেও কম আক্রমণ করে নাই) অথচ এত বড় মিথ্যা কম আছে। আমার সঙ্গে আমার প্রজাদের সম্বন্ধ কোনো দিনও স্নেহশূন্য ছিল না—

সত্যি সত্যি আমায় ভালোবাসত তারা। প্রথম জমিদারীর কাজে গিয়েই একসঙ্গে এক লক্ষ টাকা মাপ করে দিয়েছিলুম, সেটা সহজে হয় নি। বেশ মনে পড়ে এক মুসলমান প্রজা, প্রকাণ্ড লম্বা চেহারা এক সময়ে ছিল ডাকাতের সর্দার। সে আমায় কি ভালোই বাসত! ভারি মজা লাগতো তার গল্প শুনতে। এক একদিন পাশের জমিদারের প্রজাদের ধরে নিয়ে আসত। কি করে তারা? ওর ভয়ে আসতেই হত। আমার সামনে এনে সারি সারি তাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে এক গাল হেসে বলত "নিয়ে এলুম এদের আমাদের কর্তাকে একবার দেখে যাক। এমন চাঁদমুখ তোরা দেখেছিস?" আমাদের ওখানে তো মুসলমান প্রজা কম ছিল না, কিন্তু একথা বলতেই হবে তাদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি হিন্দু প্রজাদের কাছ থেকে তা পাইনি। আজকাল এই ঘোর কমিউনাল বিদ্বেষের দিনে সে সব কথা মনে পড়ে। কৈ একবিন্দু অভিযোগ করার কারণ কখনো ঘটেনি। যখন প্রথম গেলুম, দেখলুম বসবার বন্দোবস্ত অতি বিশ্রী। ফরাস পাতা রয়েছে উচ্চ-জাতের হিন্দু আর ব্রাহ্মণের জন্য, আর মুসলমানরা ভদ্রলোক হ'লেও দাঁড়িয়ে থাকবে—নয়তো ফরাস তুলে বসবে। আমি বল্লুম, বেশ তাহ'লে বসবে না। কিন্তু এ ব্যবস্থা চলবে না, তাতে যাঁদের জাত যাবে তাঁরা না হয় নিজেদের শুচিতা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আজ এই ঘোর রেষারেষির দিনে সে সব কথা মনে হয়। আমাদের অপরাধও কম নয় তা মনে রেখো। অক্ষম অপমান সহ্য করে যায় বাধ্য হয়ে কিন্তু সে বেদনার ক্ষত মূল প্রসার করতে থাকে ভিতরে ভিতরে গভীর হয়ে ওঠে গহ্বর। তারপর যখন হঠাৎ একদিন ধ্বস নামে তখন হায় হায় করে লাভ নেই।... আর একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে। একবার মাঠের মাঝখান দিয়ে পাল্কীতে চলেছি, দুপুরের প্রচণ্ড রোদে চাষীরা ক্ষেত্রে কাজ করছে। পাল্কীতে বসে বসে বোধহয় 'ক্ষণিকার' কবিতা লিখছি,—একটা লোক মাঠের মাঝখানে কাজ করছিল, হঠাৎ হৈ হৈ করে ছুটে এসে পাল্কী থামাল। আমি বললুম কি চাস্? সে বললে, একটুখানি দাঁড়া না! বসে রইলুম পাল্কী থামিয়ে, সে ক্ষেতের মধ্যে আঁকা বাঁকা আলের পথ দিয়ে চলে গেল। একটু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পরে ফিরে এসে একটা টাকা আমার পায়ের কাছে রাখল। আমি বল্লুম, এর কি প্রয়োজন ছিল? কেন শুধু শুধু এজন্য আমায় দাঁড় করালি? সে বলে—দেব না, আমরা না দিলে তোরা খাবি কি? আমার ভারি মিষ্টি লাগল তার এমন সহজ করে সত্যি কথা বলা। তাই মনে আছে আজ পর্যন্ত,—আমরা না দিলে তোরা খাবি কি।"

এই সমস্ত স্মৃতি তিনি স্মরণ করেছেন দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে যখন উত্তরোত্তর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছে—তাই বলেছেন যে—

"হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না আমরা যখন মুসলমানকে আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কার্য উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে আর কাজের জন্য দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিতে আমাদের বাঁধিবে না তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।' সমাজের মধ্যে এই ভেদবুদ্ধি ও পার্থক্যই রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে গেছে—কারণ,

"নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত বুকে টানিবার ন্যায় ভঙ্গী করিলে সেটা কখনো সফল হইতে পারে না।" অন্তরের আত্মীয়তা বোধ না থাকলে রাজনৈতিক একতার প্রথম সূত্রটিও মিলবে না। কিন্তু হিন্দু মুসলমান উভয়েরই প্রতিপক্ষের প্রতি সন্দেহ অবিশ্বাস ও বিরোধের ভাব তাদের ধর্মান্ধতার সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে—

"আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে।"

এই বিরোধ দূর করবার একমাত্র উপায় বুদ্ধির মুক্তি—। তা না হলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্ষণকালীন সন্ধি কখনো কোনো স্থায়ী প্রভাব বা পরিবর্তন করবে না। এই কারণে ইংরেজের বিরুদ্ধে খেলাফৎ আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সূত্র বলে গ্রাহ্য করেন নি। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সে ঐক্যের সত্যতা অমূলক। তা ধর্মের ক্ষেত্রেও যেমন শ্রেণীর ক্ষেত্রেও তাই। ঈর্ষামূলক নেতিবাচক অভিসন্ধিপরায়ণ কোনো প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে না—তিনি তার চেয়ে দৃঢ় সত্যতর ভিত্তি খোঁজেন—তাই তিনি বলেন, "ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তাহলে হিন্দু মুসলমানকে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেই সমকক্ষতা তাল ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয় পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।"

এই সামাজিক শক্তির সমকক্ষতার জন্য প্রবল পক্ষ হিন্দুকে যদি কিছুটা আর্থিক ক্ষতি বা সুযোগ সুবিধা ত্যাগ করতে হয় তাতেও তাঁর আপত্তি নেই।

তাই কালান্তরে বলছেন,

'হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বে আব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই...

আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নয় তাহা মানি। তবু সেখানকার ঠেলা ঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে হৃদয়ে লাগে না—কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না হৃদয়ে লাগে।"

হিন্দুর আচারপরায়ণতা অবশ্য শুধু মুসলমানের প্রতিই এত দুর্দম নয়। অন্যান্য জাতি এমন কি ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যেও কত ভেদ কত বিধিনিষেধ। সামাজিক এই নিষেধগুলির তাই হিন্দু মুসলমানের বিরোধের ভিত্তি হওয়া উচিৎ ছিল না। যুক্তি দিয়ে বুঝলে মুসলমান বুঝতে পারতেন যে এটা ঘৃণা নয় আচার। সে আচার সদাচার না হতে পারে তাহলেও সেটা কেবল মুসলমান বিদ্বেষ নয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মনে করেছেন যে ধর্মের ক্ষেত্রে সত্যভ্রষ্টতা একটি অপরাধ।

"একথা মানতেই হবে, আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম বড়ো অশান্তির কারণ হয় এমন আর কিছুই না। এই 'ডগ্‌মা' অর্থাৎ শাস্ত্রমতকে বাহির হইতে পালন করা লইয়া য়ুরোপের ইতিহাস কত বার রক্তে লাল হইয়াছে। অহিংসাকে যদি ধর্ম বলো, তবে সেটাকে কর্মক্ষেত্রে দুঃসাধ্য বলিয়া ব্যবহারে না মানিতে পারি, কিন্তু বিশুদ্ধ আইডিয়ালের ক্ষেত্রে তাহাকে স্বীকার করিয়া ক্রমে সেদিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায়, এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্মমতের মানুষকেও নামাইতে চেষ্টা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনো কালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম আচার প্রধান হইয়া থাকিবে না। আরো একটি আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিত-সাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া উঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।

কিন্তু তাঁর এই মত কেহই গ্রহণ যোগ্য মনে করেনি। দিনের পর দিন শিক্ষা চাকুরী রাজনীতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবিশ্বাস সন্দেহ ও ব্যবধান বেড়েই চলেছিল বিনা যুদ্ধে সূচ্যাগ্র মেদিনী কেউ ছাড়তে রাজি নয়।

"অবশেষে এমন হয়েছে যেখানে হিন্দু সেখানে মুসলমানের দ্বার সংকীর্ণ যেখানে মুসলমান সেখানে হিন্দুর বাধা বিস্তর। এই আন্তরিক বিচ্ছেদ যতদিন থাকবে ততদিন স্বার্থের ভেদ ঘুচবে না এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এক পক্ষের কল্যাণভার অপরের হাতে দিতে সংকোচ অনিবার্য হয়ে উঠবে।" এই অমোঘ ভবিষ্যৎবাণীতে দেশভাগের সূচনা দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মতে ইংরেজ তাড়ানোর আগে নিজেদের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে হবে। সন্দেহ অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পেলেই উড়ে যাবে না।

"আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চোখ বুজে বলেন সবই সহজ হয়ে যাবে যখন দেশটাকে হাতে পাব। অর্থাৎ নিজের বোঝাকে অবস্থা পরিবর্নের কাঁধে চাপাতে পারব এই ভরসায় নিশ্চেষ্ট থাকবার ছুঁতো।... সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয় বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই সেইখানে খুব করে খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্ব জগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালী না পড়ে।"

সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ এই আত্মবিচ্ছেদের জন্য তৃতীয় শক্তিকে দায়ী করেন না। দেশের মানসলোকে অজ্ঞতার যে অন্ধকার, মূঢ়তার যে ব্যাপকতা সেই দিকেই তিনি নির্দেশ করে চলেছেন কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই দুর্বলতার ছিদ্রপথে যখন রাজশক্তি প্রবেশ করে অবিচারে অত্যাচারে জর্জরিত করে তুলল সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষকে, তখনও তিনি জানেন ভিতরের দুর্বলতাকে জয় করাই এ বিপদে উদ্ধারের একটি মাত্র পথ। ১৯২৪ সালের পর থেকে মাঝে মাঝেই বাংলাদেশে দাঙ্গা লাগছে। ঢাকায় চট্টগ্রামে এটা তো একটা স্থায়ী ব্যাধি হয়ে দাঁড়াল। তখন শাসকদের উস্কানী, পক্ষপাতিত্ব ও উদাসীনতা তাঁকে গভীর ভাবে নাড়া দেয় বিশেষত ইয়োরোপ ভ্রমণকালে যখন চিঠিপত্রে দেশের অবস্থা জানতে পারেন এবং সেখানে ইংল্যাণ্ডের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংবাদপত্রে তার উল্লেখ মাত্র হয় না তখন তিনি উত্তেজিত হন, তবুও তিনি জানেন যে রাজা বাহিরের শত্রু মাত্র, অন্তরে শত্রু প্রবলতর।

"কেন না, যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন করে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড় শত্রু হতে পারে না। সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নজরবন্দী করুক না। এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েচে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধকারে রাখে।"

(রাশিয়ার চিঠি)

দুঃখের বিষয় এই যে এ সব কথা হিন্দু সমাজের মর্মে কিছু কিছু প্রবেশ করলেও মুসলমান সমাজকে বিশেষ নাড়া দিতে পারে নি। ছোট্ট একটি আন্দোলন হয়েছিল, 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন। কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন তার পুরোভাগে। মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল আরো কয়েকজন লেখক এই আন্দোলনের সমর্থক হলেও এর মূল বেশী দূরে প্রসারিত হয় নি। রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রবীন্দ্রবাণী মুসলমান সমাজের মর্মে তার উপস্থিতি ঘোষণা করল যথার্থভাবে পাকিস্তান হবার পর। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী মুসলমান দেশ ভাগ হবার পর জানতে পারল যা তারা চেয়েছিল তা পায়নি, যা পাবার ছিল সেই ঐতিহ্য হারিয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ দেশ ভাগ দেখে যাননি। ভাঙ্গা দেশ যাঁরা জোড়া দিয়েছিলেন তার ছিলেন তিনিই প্রধান কর্মী—তাঁর সেই গানগুলিই ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাকামী বাঙালী মুসলমানের প্রেরণা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি যে দেশ সত্যই আবার ভাগ হবে কিন্তু আশঙ্কা তাঁর ছিল।

হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব যখন দেশের চিত্ত ক্ষত বিক্ষত করে চলেছে—রাজনৈতিক খেলায় সাধারণ মানুষ ক্রীড়নক, তার ভিতরে দুর্বলতা সন্দেহ অবিশ্বাস ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নিচ্ছে এবং হিন্দু সংবাদপত্র ও মুসলিম সংবাদপত্রের উস্কানীও চলেছে তখন একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"চট্টগ্রামের বিবরণটা আমার ঘুম তাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের নিজের দেশের লোক নির্মম হয়ে যখন এরকম দানবিক কাজ করে তখন কোথাও সান্ত্বনা দেখিনে—তার উপর আর একটা জ্বালার যোগ হয়ে অশান্ত করে তুলেচে—মনে নিশ্চয় জানি এর পিছনে আমাদের মর্ত্যলোকের বিধাতা পুরুষেরা রয়েচেন। এই রকম ব্যাপারের দ্বারা দুটো গুরুতর অনিষ্ট হচ্ছে। প্রথম এই—সমস্ত মুসলমান জাতের উপর হিন্দুর ঘৃণা জন্মে যাচে। অথচ একথা নিশ্চয় সত্য তাদের মধ্যে

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অনেকে আছে যারা ভালো লোক ঠিকমত পরিচয় পেলে যাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে কোথাও বাধত না। ইংরেজের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। এই সমস্ত দুর্যোগে যে তীব্র বিষয় বুদ্ধি ব্যাপক হয়ে আমাদের মনকে অধিকার করে সেটাতে আমাদের গভীর ভাবে ক্ষতি হয়। মুসলমানেরা যদি সম্পূর্ণ ভাবে পর হত তাহলে এ ক্ষতি আমাদের পক্ষে তেমন সর্বনেশে হত না কিন্তু দেশের দিক থেকে তারা আপন এটা কোনো উৎপাতেই অস্বীকৃত হতে পারে না। তাই এটা তো বাইরের শেল নয় এটা যে মর্মস্থানের ভিতরকার বিস্ফোটক এর মার কে সামলাবে?... তারা চিরদিনের জন্য দেশের চিত্তে যে অবিশ্বাস ও ঘৃণা আবিল করে তুলেচে তাতে চিরদিনের মতই তাদের নিজের ক্ষতি..."

ঠিক এই কথাই চিঠিপত্রের নবম খণ্ডে আর একবার উল্লেখিত হয়েছে—"সকলের চেয়ে আমাদের সাংঘাতিক ক্ষতি এই যে হিন্দুরা পাছে সমস্ত মুসলমান সমাজের প্রতি বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। এ কথা বলাই বাহুল্য এবং আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিশ্চিত জানি মোটের উপর ভালমত পরিচয়ের অভাব থেকেই পরস্পর আত্মীয়তার ব্যাঘাত ঘটে। কোনো জাতের একদল মাত্র যখন অপরাধ করে, তখন সেই জাতের সকলের উপরেই কলঙ্ক লাগে এটা অনিবার্য কিন্তু এরকম ব্যাপক অবিচার কঠিন দুঃখেও আপন লোকের উপর করা চলবে না। দেশের দিক দিয়ে মুসলমান আমাদের একান্ত আপন একথা কোনো উৎপাতেই অস্বীকৃত হতে পারে না।"

কিন্তু অস্বীকৃত হল—যে 'হিন্দু-মুসলমান' জাতির উদ্ভব রবীন্দ্রনাথের কল্পনার বস্তু তা আজও দেখা গেল না।

ইংরেজ নিজ স্বার্থে বিভেদ উস্কিয়ে তুলবে সেটা স্বাভাবিক কিন্তু যে মূঢ়তা নিজেকেই আঘাত করছে তার নিস্ফলতা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন বার বার।

"যে পর জাতির পক্ষে ভারতবর্ষ অন্নের থালি তারা যদি সেই অন্ন হ্রাস বা আশঙ্কায় আমাদের পরে কঠোর হয়ে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে সেটা স্বাভাবিক সেটা স্বার্থের জন্য এস্থলে তাদের শ্রেয়ো বুদ্ধি বিচলিত হ'লে পরমার্থের দিকে না হোক অর্থের দিকে একটা মানে পাওয়া যায়। কিন্তু আপন লোকের কৃত অন্ধ অন্যায় তাদের নিজেদেরই স্বার্থের বিরুদ্ধে।"

হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্যগুলি এখানে সংকলিত করলাম। বাহুল্য ভয়ে আর বেশি দিলাম না। কিন্তু উপযুক্ত মন্তব্য অসাবধানে বাদ পড়ে গিয়েও থাকতে পারে। সব শেষে একটা কথা মনে হয় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ককে অন্তরের দিক থেকে এতখানি একাত্ম করে আর কেহ তখনও দেখেন নি পরেও না এবং অন্তরের দিক থেকে এই যে এক রাসয়নিক মিলন কল্পনা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনি 'হিন্দু মুসলমান' বলে মুসলমানকেও হিন্দু নেশনত্বের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, ডাক দিয়েছিলেন এক ভারতীয় জাতি গঠনে 'এস হে আর্য এস অনার্য হিন্দু মুসলমান' সে আহ্বানের অর্থ বোধহয় যারা বহুবার এই কবিতা আবৃত্তি করেছে তারাও বোঝে নি। আজও তাই এ রোগ আরোগ্যের পথে নয়, উপর থেকে প্রলেপ পড়ছে ভিতর থেকে ক্ষত সারেনি কারণ রোগটা কি তা আজও অনেকেই জানেন না, জানতে চান না। তাই ধর্মের গোঁড়ামীগুলি এখনও সমাজে তেমনি অবিচল। হিন্দু ধর্মের পূজা প্রথায় যে পাগ্‌লামি বা মাতলামি প্রবেশ করেছে যাতে কলেজের বিজ্ঞান পড়ুয়া ছেলেরাও শিবপূজা, কার্তিক পূজা সুরু করেছে আর মুসলমানের ধর্ম বিশ্বাস এখনও শরিয়ৎ আঁকড়ে ধরে স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে অসাম্য ও পুরুষের স্বেচ্ছাচারকে সমর্থন করতে লজ্জিত হচ্ছে না এতে বোঝা যায় যে এরা এখনও মোহগ্রস্ত হয়ে সেই "ধর্মের বিষকন্যাকে" আলিঙ্গন করে থাকবে। যতদিন না তেমন কোনো শক্তি এই হিন্দুস্তানে হিন্দুস্তান অর্থে আমি ইকবাল কথিত অখণ্ড ভারতই মনে করি আবির্ভূত হবে, যা সত্যই 'যুগ পরিবর্তন' ঘটাতে পারে। এক সময়ে আমাদের রাজনীতিবিদরা দেশের মধ্যে এই পরিতাপজনক অবস্থার জন্য দোষ দিতেন শাসকদের আজকের রাজনীতিবিদরা দোষ দিচ্ছেন শোষকদের। অর্থাৎ তারা একটি সাধারণ শত্রু খুঁজে মিত্রতা সৃষ্টি করবেন আসল জায়গায় হাত না দিয়ে। আসল স্থানে হাত দেবার নৈতাদের সাহস হবে না নেতৃত্ব পাছে হারিয়ে ফেলেন তার ভয়ে। তাই এই দুই সহোদর ভ্রাতার মধ্যে বিদ্বেষের নদী বইতেই থাকল বাংলাদেশের রক্তস্রোত তার মধ্যে পড়ে লাল হয়েছে বটে কিন্তু চর ভাসেনি—পারাপার করার সুবিধা হল না আজও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ—রবীন্দ্রনাথের চোখে

গৌরী আইয়ুব

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ছয় বৎসর পর পাকিস্তানের জন্ম। এবং অবশ্যই স্বাধীন ভারতেরও। এই জন্মের পূর্ববর্তী তিন-চার দশক ধরে একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অন্য দিকে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যে দেশ অস্থির ছিল। ফলে অবিভক্ত ভারতবর্ষে এবং আরো ঘনিষ্ঠভাবে অবিভক্ত বাঙলায় রাজনীতি ও সংস্কৃতির সেই অধ্যায়টিকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই প্রত্যক্ষ করে গেছেন যখন হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছিন্নতাবোধ তিক্ততম ও তীব্রতম পর্যায়ে উঠেছিল। তখন বাঙলাদেশে, একদিকে ছিল সংখ্যাগুরু মুসলমান, প্রধানত কৃষিজীবী, আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষায় হিন্দুর তুলনায় অনগ্রসর, সেই পরিমাণে চাকুরি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন—ফলে কিছু সংখ্যার জোরেই সেইসব ক্ষেত্রে অধিকতর অধিকারের দাবিদার। অন্যপক্ষে সংখ্যালঘু হলেও বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে ছিল ইংরাজি শিক্ষায় অগ্রসর একটি নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত সমাজ, যারা আধুনিক জীবিকার নানা ক্ষেত্রে নিজেদের অর্জিত অগ্রাধিকার বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। ফলে সর্বক্ষেত্রেই রেষারেষি উঠেছিল তুঙ্গে। এবং এই তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাকে রাজনীতির উপজীব্য করে তোলার জন্য মুসলমানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল সংখ্যা-গুরুত্ব, আর হিন্দুর ছিল আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সুবিধা। সমস্যাটার সর্বভারতীয় চেহারা একটু ভিন্নতর ছিল অবশ্য। তাই নিয়ে সর্বভারতীয় নেতারা যখন রাজনৈতিক মঞ্চে দরকষাকষি করছিলেন তখন তার উত্তেজনার চাপে মাঝে-মাঝেই যে-কোনো অছিলায় জনসাধারণ সরাসরি খুনোখুনিতে নেমে পড়ছিল। বাঙলাদেশে এই সাম্প্রদায়িক হানাহানি ছোট বড় নানা আকারে নানা অঞ্চলে প্রায়শই ঘটছিল। অবশ্যই তাতে রাজনৈতিক দলগুলির প্ররোচনাও থাকত।

সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ধোঁয়ায় দেশের আবহাওয়া যখন এইরকম কলুষিত এমন সময় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৭ই আষাঢ় তারিখে অধ্যাপক কালিদাস নাগের একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "ঠিক যখন আমার জানালার ধারে বসে গুঞ্জনধ্বনিতে গান ধরেছি—

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে
আমার ভাবনা যত উতল হল
অকারণে—

ঠিক এমন সময় সমুদ্রপার হতে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কী।"

আজকের সভার* তারিখ ১লা আষাঢ়, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ। আজ ৬৫ বৎসর পরেও আমরা সমস্যাটার কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না। এখন আরো হতাশ বোধ করার কারণ আছে, যেহেতু এই দুরারোগ্য ব্যাধির দুরূহতম চিকিৎসার প্রয়াসও করা হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। ৪০ বৎসর আগে দেশব্যবচ্ছেদ করে সমস্যাটার একটা চূড়ান্ত সমাধান করার চেষ্টা হয়েছিল। অবশ্য প্রবহমান ইতিহাসের ধারায় চূড়ান্ত সমাধান বলে কিছু নেই। আবার শোনা যায় কর্কটরোগে আক্রান্ত দেহে অস্ত্রোপচার হলে রোগটা নাকি আরো দ্রুত সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। ভারত-দেহের বেলাতেও দেখছি এই উৎকট ব্যাধি ক্রমাগত ছড়িয়েই পড়ছে।

দেশবিভাগের কথা যখন উঠলই তখন সমগ্র উপমহাদেশেরই বর্তমান পরিস্থিতিটার উপরেও দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার অন্য নানারকম চেহারা থাকলেও হিন্দু-মুসলমান বিরোধটা এখন আর তেমন বড় সমস্যা নয়, একথা স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য দুই হাত থাকলেই তালি বাজে—এ তো চিরকালের কথা। বিভাগপূর্ব পাঞ্জাবের দুই অংশে জনবিনিময় প্রায় সম্পূর্ণ ঘটে গিয়েছিল বলে পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা আজ এতই নগণ্য যে তাদের অস্তিত্ব স্মরণেই থাকে না। নতুন করে পাকিস্তানে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হলাম কয়েকদিন আগে, যখন কাগজে পড়লাম মীরাট দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় গত ঈদের দিনে করাচিতে কয়েকটি মন্দির ও হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চল আক্রান্ত হয়েছিল।

পূর্বপাকিস্তান বাংলাদেশ-এ দ্বিতীয় জন্ম লাভ করার কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত সেখানেও হিন্দু মুসলমান বিরোধের ক্ষত বার বার রক্তক্ষরণ করেছে। কিন্তু উর্দুভাষী পাকিস্তানের সঙ্গে বঙ্গভাষী পাকিস্তানের সম অধিকারের লড়াইটা যত তীব্র হতে থাকল ষাটের দশকে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটাও ততই ধামাচাপা

---

* এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্র[illegible] পঠিত বক্তৃতার ঈষৎ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পড়ে গেল। বাংলাদেশের জন্ম হবার পর থেকে এই ১৬ বৎসরে ধামাটা যে একবারও তোলা হয় নি তার কারণ হিসাবে বাংলাদেশীরা দাবি করেন যে তাঁদের দেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত মোটামুটি পাকা হয়ে গেছে, এতে ফাটল ধরানো সহজ হবে না আর। এই জাতীয়তাবাদ হিন্দু-মুসলমানের, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দের মিলিত প্রেরণার সৃষ্টি। সত্যিই যদি সম্প্রীতির ভিত বেশ পাকা করে গাঁথা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা সমগ্র উপ-মহাদেশের পক্ষেই মস্ত বড় আশার কথা, এবং অনুকরণযোগ্য আদর্শ। কিন্তু বহুযুগের বদ্ধমূল ভয় তো সহজে কাটতে চায় না। মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশকে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই ধর্মান্ধতার হাতে প্রাণ দিয়ে সেই আদর্শের চরম মূল্য চুকিয়েছেন একথা আমরা জানি এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। কিন্তু যাঁরা অবশিষ্ট আছেন তাঁরা যে আজ আর তেমন করে সেই দাবির কথা মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে সাহস পান না এতে আশঙ্কার কারণ অল্প একটু আছে বইকি! বাংলাদেশের প্রায় নয় কোটি জনসংখ্যার এক-দশমাংশ হিন্দু। এঁদের মধ্যে বর্ণ-হিন্দুর সংখ্যা নগণ্য। অতএব পূর্ববাংলায় হিন্দু-সংস্কৃতির একদা উগ্র আত্মাভিমানও আজ লুপ্ত। জনবল অল্প, মনোবলও খুব বেশি নেই। ফলে বাংলাদেশের হিন্দু-সংখ্যালঘু আজ নির্জীব নির্বিষ। অতএব আপাতত এই হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সমস্যা-জর্জরিত বাংলাদেশেরও কোনো বড় সমস্যা নয়।

প্রতিতুলনায় ভারতরাষ্ট্রের অবস্থাটা, সবাই জানেন, অন্যরকম। এবং অনেক বেশি জটিল। পাঞ্জাব প্রদেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে যেভাবে নিঃশেষে মুসলমান-অমুসলমান (হিন্দু না বলে অমুসলমান বলছি, কারণ সে সময়ে হিন্দুর সঙ্গে বিরাটসংখ্যক শিখও ছিলেন একপক্ষে) গণ-বিনিময় হয়ে গিয়েছিল সেরকম চূড়ান্ত বিনিময় যদি পাকিস্তানের দুই অংশের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষেরও হয়ে যেত তাহলে এই শতাব্দীর ইতিহাসে আরো একটি অতি নিষ্ঠুর দীর্ঘ-মেয়াদি সমাধান সেরে রাখত ইতিহাসবিধাতা। সেই সমাধান অনেকেই চেয়েছিলেন এবং তাকেই এখনও অনেকে একমাত্র চূড়ান্ত সমাধান বলেই মনে করিন। আমার এক পাঞ্জাবি ভাবী বলতেন, "ন রহে বাঁস, ন বাজে বাঁসরী।"—শ্যামের বাঁশির আপদ যদি বিদায় করতে চাও তাহলে দেশ থেকে সব বাঁশঝাড় উৎখাত করে ফেলো। উৎখাত যে করা হয়নি তাতে করে একদিকে মনুষ্যত্বের উপর কিছুটা আস্থাও যেমন অবশিষ্ট রয়ে গেল অন্য দিকে তেমনি যথা-সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার মতন সমস্যার কিছু শিকড়ও রয়ে গেল আমাদের মাটিতে।

ধর্মনিরপেক্ষতার একটা স্বাস্থ্যকর কিন্তু অস্পষ্ট ভাবনাকে কিছু ভারতীয় নেতা আমাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন—সংবিধানেও এই আদর্শকে ঠাঁই

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিলেন। কিন্তু আদর্শটা অস্পষ্টই রয়ে গেছে যেহেতু নেতৃস্থানীয় ভাবুকরাও মনস্থির করতে পারেন নি যে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ঠিক কী বোঝাবে এদেশে। সব ধর্ম থেকে সরকারের সমদূরত্ব বা সম-নৈকট্য—equal distance না equal proximity? দেশের চিন্তাশীল মুষ্টিমেয় মানুষের কাছেই যখন আদর্শটা স্পষ্ট রূপ ধরতে পারে নি এবং সরকারি আচরণও দ্বিধাগ্রস্ত তখন সাধারণ মানুষের জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা যে কিছুমাত্র গৃহীত হয় নি এতে আর অবাক হবার কী আছে? অতএব ধর্মনিরপেক্ষতার শুভ চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে অনুকূল জল-হাওয়া পেয়ে সেই শিকড় থেকে সাম্প্রদায়িকতার চারা গজিয়ে উঠে ডালপালা মেলতে দেরি করে নি। অতি সম্প্রতি মীরাট ও দিল্লীতে আর একবার কী উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই বিরোধ তা কারুর অজানা নেই।

ভারতবিভাগের পর থেকে কত হাজার বার হিন্দু মুসলমান বিরোধ নৃশংসভাবে ফেটে পড়েছে কখনও বড় আকারে তার পরিসংখ্যান সন্ধান করতেও সাহস হয় না। অর্থাৎ পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে দুই ভিন্ন উপায়ে এই হিন্দুমুসলমান সমস্যার দুই ধরনের সমাধান হয়ে গিয়ে থাকলেও আমাদের দেশের এই সমস্যা, বলতে গেলে ১৯৪৭ সালে যেখানে ছিল আজ ১৯৮৭ সালেও সেখানেই আছে। বরং বলা যায় হিন্দুমুসলমান দুই সম্প্রদায়েই সাম্প্রদায়িক-মনোভাবসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা আবার দ্রুত বাড়ছে এবং তারা আরো অবুঝ এবং মরীয়া হয়ে উঠছে। এদিকে যাঁরা এই সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করেন তাঁরা আজো দিশেহারা হয়ে পরস্পরকে সেই একই অসহায় প্রশ্ন করে বলেছেন—"ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধান কী?"

এই পঁয়ষট্টি বছরে আমরা যে সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তুলেছি—সমাধানের দিকে একচুলও অগ্রসর হইনি সেকথা স্পষ্ট করে দেবার জন্যই কালিদাস নাগের প্রশ্ন এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তরের উল্লেখ করেছিলাম। পত্রাকারে লেখা বলে রবীন্দ্রনাথের উত্তরটা খুব দীর্ঘ নয়। অল্পস্বল্প বাদ দিয়ে তাঁর চিঠিখানা প্রায় সবটাই তুলে দেব, পাঠক একটু ধৈর্য ধরবেন

'পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র—সে হচ্ছে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এই জন্যে তাদের ধর্মগ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে তাঁরা আধুনিক যুগের বাহন; তাঁদের মন মধ্যযুগের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নেই। [এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া অন্যায় হবে না যে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে য়ুরোপের বুকে নেমে আসা মধ্যযুগের অন্ধকার, ফ্যাশিসট তাণ্ডব]। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবনে পরিবেষ্টিত করে নেই।... কিন্তু ধর্মের নামে যে জাতির নামকরণ ধর্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়—অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non-cooperation! হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। [আবার জনান্তিকে বলি, এখন আর তত সংকীর্ণ নেই—শুদ্ধিকরণের বেশ প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত করে মুসলমানদের পুনর্বার সদ্ধর্মে ফিরিয়ে আনার পাকা ব্যবস্থা হয়েছে নাকি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে]। আচারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক।... আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারী কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের একপ্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানেই তাকে স্থান দেওয়া হোত। [এই কুশ্রী অভিজ্ঞতাটা এতো লজ্জিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে যে অন্তত ৫/৬ বার উল্লেখ করেছেন তাঁর নানা রচনায়]।

'অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে—ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে? এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে 'হিন্দু' যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ—এ যুগে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকে সচোটভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল।... মোটকথা হচ্ছে, বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংশ্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল। এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয় নি।... সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্য যুগের ভিতর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেচে, হিন্দু-মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে।... আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে প্রতিরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা সাধনার দ্বারা, সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।... হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই—কারণ, অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরির্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব।—যদি না আসি তবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

আমাদের আলোচ্য সমস্যা ও সমাধানের প্রায় সবটাই এখানে সূত্রাকারে পেয়ে গেলাম বলেই আলোচনার সূত্রপাত হিসেবে পত্রখানি পাঠককে উপহার দিলাম। নানা দিক থেকে এই সমস্যাকে তিনি তাঁর প্রবন্ধে উপন্যাসে কাব্যে উত্থাপন করেছেন। এখন তারই কিছুটা বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। উদ্ধৃত পত্রে তিনি বলেছেন বটে যে ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে এই দেশেই এমন পরস্পর-বিরুদ্ধ দুটি জাত পাশাপাশি বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে, ইতিহাসের চক্রান্তে। এদের এক পক্ষ আগ্রাসী এবং আত্মসম্প্রসারণে উদ্যমী মুসলমান, অন্য পক্ষ নিজের সুনিপুণ কৌশলে গড়া আচারের প্রাকারে সুরক্ষিত, কূর্মস্বভাব হিন্দু। কিন্তু পৃথিবীর ইতস্তত একটু চোখ বুলিয়ে দেখলেই টের পাওয়া যাবে যে নিজেদের যারা সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী মনে করে এমন আরো বহু জাতই নানা ভূখণ্ডে যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি প্রতিবেশীরূপে বাস করেও আমাদেরই মতন কিছুতে মিলতে পারছে না, পারছে না বলেই নিরন্তর হানাহানি করে চলছে। এমেরিকার সাদা আর কালো মানুষদের দেখুন, আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্যাথলিক আর প্রোটেসট্যানট্‌ন্টদের দেখুন, আরো কাছে এশিয়ার দুই প্রতিবেশী মুসলমান দেশ ইরাকে ইরানে সুন্নী আর শিয়াদের দেখুন—এরকম পারস্পরিক বিরোধের তো শেষ নেই। ইয়োরোপে খ্রীস্টান ও মুসলমানের সংঘাতও হিন্দু-মুসলমানের সংঘাতের মতোই ৮/৯শ বৎসরের পুরানো। য়িহুদীদের সঙ্গে প্রথমত খ্রিস্টানদের এবং পরে মুসলমানদের বিরোধ আরো প্রবীণ। তাই ইতিহাস-বিধাতা ভারতবর্ষের প্রতিই বিশেষভাবে অকরুণ হয়েছেন এমন বলা যায় কি?

তাছাড়া ইতিহাসের এই বিধানকে রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের জাতীয় ভাগ্যের অবিমিশ্র অভিশাপ বলে মনে করেছিলেন এমন ভাববারও কারণ নেই। ভারতের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতে বসে তিনি নিজেই বলেছেন 'গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত মহা-সভ্যতার গোড়াতেই একটা জাতিসংঘাত আছে। এই জাতিসংঘাতের বেগেই মানুষ পরের ভিতর দিয়া আপনার ভিতরে পুরা মাত্রায় জাগিয়া উঠে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এইরূপ সংঘাতেই রূঢ়িক হইতে যৌগিক বিকাশ লাভ করে এবং তাহাকেই বলে সভ্যতা।' অতএব দেখা যাচ্ছে জাতি-সংঘাত ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের চোখেও ইতিহাসের অভিশাপ নয়, ইতিহাসের বরলাভ—যদি অবশ্য রূঢ়িক থেকে যৌগিক বিকাশ অর্থাৎ সভ্যতার অগ্রগতিই আমাদের কাম্য হয়।

মানবসভ্যতার এই রূঢ়িক থেকে যৌগিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা সমাজের পক্ষে শেষ পর্যন্ত উত্তরণের পর্যায়ে পড়লেও ব্যক্তিমানুষকে এর জন্য কঠিন মূল্য চুকাতে হয়েছে। বহু স্বেদ অশ্রু ও রক্তের অক্ষরেই নিশ্চয়ই লেখা হয়েছিল মানবসভ্যতার এই উত্তরণের ইতিহাস। এদেশে বহিরাগত আর্যদের সঙ্গে ভারতবর্ষের যথার্থ আদিনিবাসীদের সংঘাতেও অবশ্যই তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। আমাদের মহাকাব্যে তার কিছু কিছু 'ইতিহাস' আজো আমরা দেখতে পাই। জাতি-সংঘাতের অনিবার্য আনুষঙ্গিক যে ঘৃণা এবং জাতি-বিদ্বেষ তারও যথেষ্ট প্রমাণ মেলে মহাকাব্যে। আর্যরা অনার্যদের যে প্রায় বন্য প্রাণীর সমতুল্য মনে করেছিল তার কিছুটা সাক্ষ্য আছে রামায়ণের হনুমান, জাম্বুবান, বালি, সুগ্রীব ইত্যাদি চরিত্রে। রাক্ষসজাতির বর্ণনায় জাতিবিদ্বেষ প্রায় হাস্যকর অসম্ভাব্যতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। আবার মজা হল এই যে, ইংরেজ বিজেতারা এই দেশের মানুষকে যখন 'নেটিভ' বলেছিল কিংবা মুসলমান বিজেতারা কাফির আখ্যা দিয়েছিল তখন আমরা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলাম। কিন্তু কই আর্য বিজেতারা যে এদেশের মানুষকে 'অনার্য' বা 'অভদ্র-অসভ্য' আখ্যা দিয়েছিল সেটা তো আমরা প্রতিবাদযোগ্য মনে করি না। বরং এখনও সেই শব্দটিকেই আমাদের আদিপুরুষের অভিধা বলে মেনে নিয়েছি। এবং সেইভাবেই ব্যবহার করে বলেছি। অবশ্য দ্রাবিড়রা এই আর্য অহঙ্কারের প্রতিবাদ করে থাকেন। তাকে আবার আমরা উত্তর ভারতের মানুষরা দক্ষিণীদের অযৌক্তিক অতিস্পর্শকাতরতা মনে করি।

হিন্দু সমাজের বর্ণবিভাগের উৎস ও যৌক্তিকতার সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আমরা আবাল্য শুনে আসছি রবীন্দ্রনাথও মোটামুটি তার সমর্থন করেছেন 'এই বিরোধে আর্যরা জয়ী হইলেন কিন্তু অনার্যরা আদিম অস্ট্রেলিয়ান বা আমেরিকানগণের মতো উৎসাদিত হইল না।... একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল।" তাহলে এটাকে সৌভাগ্য বলেই জ্ঞান করা উচিত শূদ্রদের। কিন্তু হিন্দু সমাজতন্ত্রের নিম্নতম ধাপে গৃহীত হবার এই সৌভাগ্যকে শূদ্ররা পরে যথেষ্ট প্রাপ্তি বলে জ্ঞান করেন নি। এই আশ্রয় ত্যাগ করে তাঁরা কখনও বৌদ্ধধর্মে কখনও ইসলামে বা শিখধর্মে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেছেন। এটাকে আমরা মোটেই ভালো চোখে দেখি নি, আজও দেখি না। বাবাসাহেব আম্বেদকর যে হিন্দু সমাজের বর্ণভেদের বিরোধিতা করে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং নিজেও সেই ধর্ম গ্রহণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

করেছিলেন তার জন্য তাঁকে আমরা ক্ষমা করি নি। অন্যপক্ষে আর্যদের যে "সামাজিক সুব্যবস্থা" সেদিন মানবিক বলে মনে হয়েছিল, আজ তিন হাজার বৎসর পরে তা কী দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠেছে হিন্দু সমাজের কাঁধে! তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার ক্রাচ তৈরি করে দিয়েও আজ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না হিন্দু সমাজ। ক্রাচটাই দেহের অঙ্গ হয়ে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে মনে হচ্ছে এবং নানা যন্ত্রণাও সৃষ্টি করে চলেছে। অবশ্য এই বর্ণব্যবস্থার দুর্বলতাটাও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন 'যদিচ আমরা বহুসংখ্যক আর্য অনার্য এবং সংকরজাতি হিন্দুত্ব নামক এক অপরূপ ঐক্য লাভ করিয়াছি, তথাপি আমরা বল পাই নাই।' তাছাড়াও বলেছেন, 'জগতে হিন্দু-জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।... জাতীয়ত্বের সংকীর্ণতা ইহার মধ্যে আছে অথচ জাতীয়ত্বের বল ইহার মধ্যে নাই।'

জাতিসংঘাতের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। বহু দেশেই এইরকম জাতিসংঘাত একবার নয়, বার বার ঢেউয়ে ঢেউয়ে এসেছে। ভারত ইতিহাসের এহেন ঢেউ গুনতে বসে 'শক হুনদল পাঠান মোঘল' সকলকেই রবীন্দ্রনাথ আপন বলে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন, এমন-কি 'এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ'-ও বলেছেন। খুব সরবেই বলেছেন যেহেতু তাঁর দেশবাসীরা অনেকেই এই পরবর্তী বহিরাগতদের আপন বলে স্বীকার করতে রাজি নন। একমাত্র আর্যদেরই তাঁরা 'দুবাহু বাড়ায়ে' গ্রহণ করেছেন। এবং আর্য গরিমার প্রতিফলিত গৌরবে নিজেরাও গৌরবান্বিত বোধ করেছেন। অবশ্য আর্যমহিমা কীর্তনে রবীন্দ্রনাথেরও উচ্ছ্বাস কিছু কম ছিল না। তবে আর্যামির ভণ্ডামিকেও রবীন্দ্রনাথ কলমের খোঁচায় ছিন্নভিন্ন করতে দ্বিধা করেন নি।

"মোক্ষমুলর বলেছে আর্য,
তাই শুনে মোরা ছেড়েছি কার্য।"

এখানে সত্যের খাতিরে একথাও স্বীকার করা হয় যে তাঁর "হিন্দুর ঐক্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনার্যদের প্রতি যে অবজ্ঞাসূচক মত প্রকাশ করেছেন তা আমি যতবার পড়ি ততবার ক্ষুব্ধ বোধ করি। তিনি লিখেছেন 'দুর্গাগ্যক্রমে তাহারা কী শারীর-সংস্থানে কী বুদ্ধিরবৃত্তিতে আর্যদের স্বশ্রেণীয় বা সমকক্ষ নহে। তাহারা সর্ববিষয়েই নিকৃষ্ট। এই কারণে তাহারা আর্য-সভ্যতার বিকার উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা যেমন আর্যরক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছে তেমনি আর্যধর্ম এবং আর্যসমাজকেও বিকৃত করিয়া দিয়াছে, 'এই বহুদেবদেবী বিচিত্র পুরাণ এবং অন্ধ লোকাচার-সংকুল আধুনিক বৃহৎ বিকারের নাম হিন্দুত্ব।' অনার্যরা অর্থাৎ দ্রাবিড়রাও সর্ব বিষয়েই আর্যদের চেয়ে নিকৃষ্ট একথা রবীন্দ্রনাথ বললেও আমি মানতে বাধ্য নই। এই মতটি আমাদের জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপদজনক বলেই যে শুধু আমার

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কাছে আপত্তিকর ঠেকে তা নয়, এটিকে বাস্তবিক ভ্রান্ত এবং আর্য অহঙ্কার-প্রসূত বলেই আমার মনে হয়। তবে এক্ষেত্রে এই আলোচনার অবকাশ নেই।

অনার্য জাতি ও সভ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যা ধারণা তাতে আর্যদের ভারতে আগমনকে যে তিনি আশীর্বাদ বলে জ্ঞান করবেন এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু যা উল্লেখযোগ্য সে হল এই যে পরবর্তী আগন্তুকদেরও তিনি অবাঞ্ছিত জ্ঞান করেন নি। তাঁর "ভারত-তীর্থে"র রচনাকাল ১৩১৭। তার বেশ কিছু কাল আগেই থেকেই যে এই ভাবনা তাঁর মনে দানা বেঁধেছে তার প্রমাণ তাঁর অন্য বহু রচনাতেই ছড়িয়ে আছে। ১৩১১ সালে লিখেছিলেন, 'বিধাতা যেন বৃহৎ সামাজিক সম্মেলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড়ো রাসায়নিক কারখানাঘর খুলিয়াছেন।' এই রাসায়নিক কারখানা ঘরে যে-ভারতবর্ষীয় মহাজাতি তৈরি হয়ে চলেছে হাজার হাজার বৎসর ধরে তার প্রায় প্রত্যেকটি উপাদানকেই তিনি সাগ্রহে সাদরে বরণ করেছেন, তাঁর সমসাময়িকেরা অনেকেই যা করতে পারেন নি, আজও অনেকে পারেন না। অধ্যাপক নাগকে লেখা পত্রে তিনি যেন প্রায় হতাশ প্রশ্ন করেছেন যে 'এক-পক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে?' কিন্তু এর উত্তরও তো নিজেই দিয়ে রেখেছিলেন আরো ২৪ বৎসর আগেই।

১৩০৫ সালে লেখা "কোট বা চাপকান" প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটি জাতি দাঁড়াইয়া যায় তবে তাহা কোনোমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না। যদি বিধাতার কৃপায় কোনো দিন সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা এক হইতে পারে, তবে হিন্দুর সহিত মুসলমানের এক হওয়া বিচিত্র হইবে না। হিন্দু-মুসলমানে ধর্মে নাও মিলিতে পারে, কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে—আমাদের শিক্ষা আমাদের চেষ্টা আমাদের মহৎ স্বার্থ সেই দিকে অনবরত কাজ করিতেছে।'

করিতেছে কি? এই "মহৎ স্বার্থ"-টি রবীন্দ্রনাথ যেমন করে বুঝেছিলেন এবং বোঝাতে চেয়েছিলেন তাকে যদি আমরা গ্রহণ করতাম এবং যদি যথার্থই সচেতনভাবে আমাদের চেষ্টা সেই "মহৎ স্বার্থ"-রক্ষায় অনবরত কাজ করত তাহলে সেদিন ভারত-বিভাগের দাবি আর আজ এত রকমের বিচ্ছিন্নতার দাবি এমন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠত বলে মনে হয় না। কে কোন্ রাজ্যে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে নিরন্তর এই ভয়, আর সংখ্যা-গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক মানচিত্রের রেখাগুলি ক্রমাগত নতুন করে আঁকতে হবে—প্রত্যেকেরই এই নির্বোধ আর আত্মক্ষয়ী দাবি আমরা ঠেকাতে পারতাম যদি প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের কথাগুলিকে কিছুটা বুঝতে চেষ্টা করতাম। সৎ কবি বলেই সমসাময়িক কোলাহলের ঊর্ধ্বে উঠে আত্মস্থ হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি এমন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার থেকে যখন বাঙালি মুসলমান নিরুত্তাপ উদাসীনতায় সরে রইলেন তখনই তাঁর চোখ খুলল। তিনি এই সমস্যাকে তলিয়ে বুঝলেন এবং আর-পাঁচজন হিন্দুর মতোই মুসলমান সমাজকে সুবিধাবাদী এবং আনুগত্যের বিনিময়ে বিদেশী শাসকের কাছ থেকে বিশেষ প্রশ্রয়প্রার্থী বলে গাল দিলেন না। বরং লিখলেন, 'সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া, ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম। সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি।'

বরং আমাদের আত্মীয়তার তাগিদটাই যে সুবিধাবাদী ছিল, ভিতর থেকে ভেদবুদ্ধিকে দূর না করে আত্মীয়তার দোহাই পাড়াটা যে ভণ্ডামি—একথা যত অপ্রিয়ই শোনাক, তিনি তো বলতে ছাড়েন নি। বরং প্রায় অভিশাপের ভাষায় বলেছেন, 'এই পাপের অনিষ্ট অন্তরের গভীরতম স্থানে নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় সঞ্চিত হইতে থাকে।' সেই প্রায়শ্চিত্তের সবটুকু যে তাঁকে দেখে যেতে হয় নি এই তাঁর মহাভাগ্য।

মাঝে-মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি যে অসাধারণ কোনো ব্যক্তি ঠিক পথটা যথাসময়ে বাতলে দিলেও সমাজ কেন সে পথে চলতে পারে না? জনতাকে কোনো একটা পথে পরিচালন করার জন্য যে সম্মোহিনী ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, হয়ত তা তাঁর যথেষ্ট ছিল না। নয়ত আমাদের দুর্বল স্থান-গুলি কোথায়, কোথায় আমাদের উপর চোট আসতে পারে এবং সেই চোট ঠেকাবার উপায় কী—সবই তো তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন। তবু আমরা সেই চোট ঠেকাতে পারি নি, এটাই ঐতিহাসিক সত্য। উনি বলেছিলেন, 'বাহির হইতে হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না।—আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনা অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারি নি, যেহেতু ভেদবুদ্ধির পাপকেও নিরস্ত করতে পারি নি।

এই ভেদবুদ্ধির পাপ দূর না করেই স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ায় রবীন্দ্রনাথের খুব সঙ্গত এবং খুব স্পষ্ট আপত্তি ছিল। কারণ ওঁর মনে হয়েছিল যে 'এই কাজটা মুলতবি হয়ে পড়ে আছে শত শত বৎসর ধরে।' আগের কাজ আগে সেরে নেওয়াটাই তাঁর বেশি দরকার বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা হাতে-হাতে ফল পেতে চান। দীর্ঘ দিন ধরে সমাজসংস্কারের ধৈর্য তাঁদের থাকে না। তাই তাঁদের যুক্তি ছিল যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতর দিয়েই এই ভেদবুদ্ধিকেও দূর করা যাবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে নামলেই পারস্পরিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপরিচয়, অবিশ্বাস এবং অন্ধ লোকাচারের বাধাগুলি দূর হয়ে যাবে। এই যুক্তিটাও একেবারে ফেলে দেবার মতন নয়, সে কথা ঠিক। তবে কাছাকাছি এসে হাত মিলিয়ে কাজ করতে নেমে যে আবার আচারের প্রাকারে কঠিন ধাক্কা খাবার আশঙ্কা থাকে, পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হতে থাকে, একথাও তো ভেবে দেখা দরকার ছিল। 'লোকহিত' করতে গিয়ে মাঝে-মাঝে কেমন অহিত হত সে কথাও তিনিই বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছু কাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ বেদনার সঙ্গে লক্ষ করলেন যে হিন্দুর কাছে মুসলমান যে অশুচি আর মুসলমানের কাছে হিন্দু যে কাফের—স্বরাজপ্রাপ্তির লোভেও একথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউই ভুলতে পারে নি।

অন্তরে স্বাধীনতার চর্চা করব না, অন্তঃপুরে মেয়েদের স্বাধীনতা দেব না, দেশের এক বিরাট জনসংখ্যাকে পায়ের তলায় চেপে রাখব অথচ সমাজের ওপর তলার ভদ্রলোকের জন্য স্বাধীনতা প্রার্থনা করব, এই আচরণের মধ্যে যে কতখানি অসঙ্গতি আর আত্মবিরোধ রয়েছে তা বার-বার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। তা ছাড়াও বলেছেন যে দশটি আঙুলকে পরস্পরে সন্নিবদ্ধ করে অঞ্জলি বাঁধার পর যদি কিছু গ্রহণ করা যায় তবেই তা অঞ্জলিতে থাকে নয়ত আঙুলের ফাঁক দিয়ে সব গলে পড়ে যায়। স্বাধীনতা যদি কেউ হাতে তুলেও দেয় তবু তা আমাদের বিচ্ছিন্ন অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে যে গলে পড়ে যাবে সেটুকু দেখতে পাবার মতন দূরদর্শিতা তাঁর ছিল।

ভারতবর্ষীয় জাতি বলতে কাকে বুঝব সেই প্রশ্নে আর-একবার ফিরে আসা যাক। আসামে আজ কে ভারতবাসী আর কে ভারতবাসী নয়, তার বিচার করতে বসে অহমিয়াভাষী নাগরিকরা যখন বিভাজন-বর্ষ নিয়ে দর কষাকষি করেন, কিংবা ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত যাঁরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসামে এসেছিলেন তাঁদের যদি-বা ভারতীয় বলে মেনে নিতে রাজি থাকেন তবু ১৯৭১ সালের পর যাঁরা এসেছেন তাঁদের বিদেশী বলে বহিষ্কার করবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন আমরা সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ বোধ করি। কিন্তু সমস্ত কাণ্ডটায় ইতিহাসের যে একটা নিষ্ঠুর করুণ পুনরাবৃত্তি আছে সেটা মনে হয় আমাদের অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তাই হয়ত স্মরণ করিয়ে দেওয়া অন্যায় হবে না যে ভারত-ইতিহাসের ধারাতে আগেও অনুরূপ একটি বিভাজন-বর্ষ নির্ধারণ করে রেখেছেন অনেক ভারতবাসী। যে বৎসরে আফগানিস্তানের মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন সেই ১১৮৬ সালটিকেই মোটামুটি এইরকম একটা বিভাজন-বর্ষ জ্ঞান করেন কেউ-কেউ। কেউ বা সেটাকে

~ www.amarboi.com ~

আরো দেড়শ বৎসর পিছিয়ে দিয়ে গজনীর লুঠেরা সুলতান মাহমুদের প্রথম আক্রমণের সালটিকেই বিভাজন-কাল ধার্য করেন। অর্থাৎ তারপর থেকে ঐ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পার হয়ে যাঁরা স্থায়িভাবেও এসেছেন তাঁদের যথার্থ ভারতবাসী এবং তাঁদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলনে উপজাত নবসংস্কৃতিকেও ভারতীয় সংস্কৃতি বলে স্বীকার করায় অনেকের মনেই প্রতিরোধ রয়েছে। আমরা অনেকেই যে-ভারতীয় ঐতিহ্য নিয়ে গৌরব করি, যার পুনরুজ্জীবন কামনা করি, সেই ঐতিহ্য এর পূর্ববর্তী কালের। তাই দেখা যাচ্ছে যে কে ভারতবাসী আর কে ভারতবাসী নয় এবং কে-ই বা এর বিচার করতে অধিকারী, এই মামলার প্রথম স্ব-নিযুক্ত বিচারক কিন্তু আসাম ছাত্রসভাই নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় পুনর্জাগরণের দিনেও এই প্রশ্নের বিচার একবার হয়ে গিয়েছিল। অন্তত কয়েকটি প্রবল কণ্ঠ মুসলমানের বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছিল সেদিন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রশ্ন করেছেন, 'অতীতের সেই পর্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে। বিধাতা কি তাহাকে এই কথা বলিতে দিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস।' এবং তারপর একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে 'হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন সেই সময়ে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এদেশে প্রবেশ করিল, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এদেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।'

এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্মরণ রাখার যোগ্য রবীন্দ্রনাথের সেই অভিমত যে, 'একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড 'আমরার' মধ্যে যে-কেহই মিলিত হউক, তাহার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ইংরাজ আরও যে-কেহ আসিয়াই এক হউক না—তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখাবে কে থাকিবে আর কে না-থাকিবে।' এই দীর্ঘ বাক্যটি একটি দোধারী তলোয়ার। বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিতাড়নবাদী দুই দলকেই দুদিকে কাটে।

রবীন্দ্রনাথ যদিও ঐ উদ্ধৃতপত্রে বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলমানে ধর্মে না-ও মিলিতে পারে' তবু একথা মোটেই সত্য নয় যে এই দুই ধর্মের দূরত্বকে তিনি অসেতুবন্ধ্য জ্ঞান করতেন। এই দুই সমাজের মানুষ এত শত বৎসর ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হয়ে বাস করার পরেও এদের দূরত্ব কেন ঘুচছে না তা আলোচনা করতে গিয়ে অনেকবার বলেছেন যে আর্যরা যে অর্থে বহিরাগত, ইংরেজরা যে অর্থে বহিরাগত, এদেশের অধিকাংশ মুসলমান তো সে অর্থে বহিরাগত নয়—তাঁরা এই মাটিরই সন্তান, কেবল একটি বহিরাগত ধর্মে দীক্ষিত। এই বহিরাগত ধর্মটি তুলনায় নবীন এবং প্রবল বলে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দুধর্মের উপর এর আঘাতও লেগেছিল প্রচণ্ড জোরে। তখন আর-একবার আত্মরক্ষার তাগিদে হিন্দু সমাজকে নিষেধের এবং বিদ্বেষের প্রাচীর উঁচু করে গাঁথতে হয়েছিল। হিন্দুধর্মের অসাধারণ গ্রহিষ্ণুতা সত্ত্বেও এই সাত-আট শ বছরে ইসলামকে গ্রাস ও পরিপাক যে করতে পারে নি হিন্দুধর্ম তার থেকে একথাও প্রতিষ্ঠিত হয় যে দুই ধর্মের মধ্যে কিছু মৌলিক বৈপরীত্য আছে যার নিশ্চি মিশ্রণ সম্ভব নয়। তবু সেই প্রাচীর ডিঙিয়েই এবং সেই বৈপরীত্যকে আত্মস্থ করেই কিছু সমন্বয়ের কাজও হয়ে চলেছিল প্রাণের স্বভাবধর্মে।

ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন 'ভারতবর্ষের যখন আত্মরক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন।... ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিলেন, মুসলমান ধর্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়। দেখিয়েছিল, ভারতবর্ষের মর্মস্থলে সত্যের এমন একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত আছে যা সকল সত্যকেই আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে...'। এই ভাবনাকেই আরো একটু প্রসারিত করে "আত্মশক্তি ও সমূহ"-এ বলেছেন, 'হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মাঝখানে তখন এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল; নানকপন্থী, কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানাস্থানে ধর্ম ও আচার লইয়া যেসকল ভাঙাগড়া চলিতেছে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাখেন না। যদি রাখিতেন তো দেখিতেন এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্য সাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ হয় নাই।'

অন্যপক্ষে সমাজের উচ্চতম এবং সচেতন স্তরের জন্য ব্রাহ্মসমাজেরও অনুরূপ একটি ভূমিকা ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। 'ব্রাহ্মসমাজকে তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে মানব-ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ করে নিজেকে উপলব্ধি করবার' জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে 'ব্রাহ্মসমাজের' একটি 'ঐতিহাসিক তাৎপর্য' এই ছিল যে 'মুসলমান ধর্মের যেটি সত্য' সেই সত্যকে 'ভারতবর্ষের মর্মস্থলে সঞ্চিত বিপুল যে সাধনা আছে' তারই আত্মীয় বলে প্রতিষ্ঠা করা। ব্রাহ্মসমাজ যে এই ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য প্রবল উদ্যমে অগ্রসর হয়ে আসে নি, সেটা আমাদের সবার পক্ষেই এক পরম দুর্ভাগ্য এবং ওই সমাজের পক্ষে তো বটেই। আবার এই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ যতটুকু সুকৃতি পূর্বেই অর্জন করেছিল তাকে মুসলমান সমাজ তো নয়ই, এমন কি হিন্দুসমাজও যে যথেষ্ট স্বীকৃতি দেয় নি, একথাও স্বীকার করা ভালো। ভারতের ধর্মসাধনার ইতিহাসে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজের যে বিরাট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা হতে পারত, যা হওয়া উচিত ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, সেটা হয় নি বলেই ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর-এক প্রজন্মকালের মধ্যেই লুপ্ত হবে। যদি না অবশ্য কেউ দাবি করেন যে ইতিপূর্বেই তা হয়ে সেরেছে। এখন যত দিন না হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজকে সম্পূর্ণ পরিপাক করে ফেলছে ততদিন আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় marginal man বা প্রত্যন্তবাসী মানুষ হয়ে থাকতে হবে গুটি কয়েক ব্রাহ্মকে যাঁরা আজও অবশিষ্ট আছেন।

এখানে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি যা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়, যেহেতু কথাটা রবীন্দ্রনাথের কীর্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। আমি গত বৎসরে একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম কয়েক দিনের জন্য। বুধবার সকালে মন্দিরে উপাসনার অনুষ্ঠানেও গিয়েছিলাম—পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে। ছাত্রীবয়সের প্রিয় অতীতকে আর-একবার যতটুকু সম্ভব আস্বাদন করার চেষ্টা আর কী? কিন্তু সেদিন সেখানে যা দেখেছিলাম তাতে একটা কথা আমার মনে এসেছিল। আরো একদিকে রবীন্দ্রনাথের স্বল্প সার্থকতা ও প্রচুর ব্যর্থতার কথা। সেদিন মন্দিরে বিশ্বভারতীর অধিকাংশ ভবনেরই ছাত্রছাত্রীরা এবং অধ্যাপকেরাও অনুপস্থিত ছিলেন। পাঠভবন ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। শুনলাম ঐরকমই নাকি হয় আজকাল। তবে বাংলাদেশের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন—নানা ভবনের। সেদিন তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে মনে হয়েছিল যেন তাঁরা মন্দিরের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বেশ তৃপ্তি পান। তখন হঠাৎ লক্ষ করি যে এই বিগ্রহহীন মন্দিরে যে-ঈশ্বরের উপস্থিতি হিন্দুমনকে যথেষ্ট উজ্জীবিত করে না, সেই উপস্থিতিই ফুল ও ধূপের গন্ধে, আলপনার আভাসে, প্রার্থনা ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীতে হয়ত বা আরো পূর্ণতর করে উপলব্ধি করেন মুসলমানেরা। কারণ মুসলমানের নিজস্ব প্রাত্যহিক ধর্মচর্যা বড়ো নিরলঙ্কার। সেদিন আমার মনে এই ভাবনাটাও জেগেছিল যে ধর্মবোধের দিক থেকে বোধহয় বাঙালি মুসলমান রবীন্দ্রনাথকে অন্তরের আরো গভীরে গ্রহণ করতে পারবেন, বাঙালি হিন্দুর তুলনায়। দেবেন্দ্রনাথের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির যে অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দুরই অন্তরের ধন হয়ে উঠতে পারছে না, একটা অভাববোধ থেকে যাচ্ছে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শান্তিনিকেতনের গা ঘেঁষে অরবিন্দ-নিলয়, সাধুবাবার আশ্রম ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা। সাঁই-বাবা, মোহনানন্দরাও দূরে নেই বলেই শুনি। অর্থাৎ হিন্দুমনের পক্ষে রাবীন্দ্রিক ধর্মচর্চা যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক নয় কিন্তু মুসলমানের মনের কাছে হয়ত বা যথেষ্টর চেয়ে একটু বেশিই তৃপ্তিদায়ক। কথাটা কি ভেবে দেখবার মতন নয়?

হিন্দু-মুসলমানের মিলন অপেক্ষা করে আছে মনের পরিবর্তনের জন্য, যুগের পরিবর্তনের জন্য এ ছাড়া অন্য পন্থা নেই—আগেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-মুসলমানের বিভেদটাকে যখন ক্রমে রাজনৈতিক দাবার শতরঞ্জের উপর বিধিমত সাজিয়ে ফেলা হচ্ছিল তখন উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ সুবুদ্ধির দোহাই পেড়ে ধর্মের দোহাই পেড়ে হৃদয়ের পরিবর্তনের কথাই বলে চলেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল 'রাষ্ট্রিক অধিকার সম্বন্ধে একগুঁয়েভাবে দরকষাকষি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে মনকষাকষিকে অত্যন্ত বেশি দূর এগোতে দেওয়া শত্রুপক্ষের আনন্দবর্ধনের প্রধান উপায়।' তার পরেও বুঝিয়ে বলেছেন, 'আমার বক্তব্য এই যে উপস্থিত কাজ-উদ্ধারের খাতিরে আপাতত নিজের দাবি খাটো করেও একটা মিটমাট করা সম্ভব হয় তো হোক, কিন্তু তবু আসল কথাটাই বাকি রইল। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালি-দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চিরকালের প্রয়োজন মিটবে না। এমন কি পলিটিক্সেও এ তালিকাটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই, ঐ ফাঁকির জোড়টার কাছে বারে বারে টান পড়বে। যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে ঐ গোড়ায়, নইলে কিছুতেই কল্যাণ নেই।'

একটা কথা রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন; করবার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ছিল কিনা সেটা আমাদের ভেবে দেখা দরকার, যে 'হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

'আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে—ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব।...

এই 'বিধানতৃনির্দিষ্ট নিয়োগ'-টিই যে সেই পূর্ব-বর্ণিত 'মহৎ স্বার্থ' একথা না বলে দিলেও চলে। ধর্মের দেশে ধর্মের ভাষা বলাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। 'বিধাতৃনির্দিষ্ট নিয়োগ', Divine will ইত্যাদি ভাষা সম্ভবত জাতীয় সংহতিকে পুষ্ট করার ইচ্ছাকে একটা অলৌকিক শক্তি জোগায়। যাই হোক এই 'নিয়োগের' লক্ষ্যে আছে যুগপরিবর্তন আর উপায় হল মনের পরিবর্তন।

হৃদয়-পরিবর্তনের কাজ নিজেকে দিয়েই শুরু করতে হয়। আত্মসমালোচনাই আত্মসংস্কারের প্রথম ধাপ। তাই রবীন্দ্রনাথের রচনায় মুসলমানের বিরূপ সমালোচনা যদি বা কৃচিৎ দেখতে পাই, হিন্দুর সমালোচনা আদ্যন্তমধ্য। এটাকে ধৈর্যের সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে গ্রহণ করার মতন মানসিকতা আজও আছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিনা সন্দেহ—সেদিনও যে বিশেষ ছিল না সে তো বলাই বাহুল্য। তারপর থেকে এত ঘা খেয়েও আমরা যে খুব শিখেছি তা তো মনে হয় না, বরং অন্য পক্ষকে উচিতমতন শিক্ষা দিতে হবে—এটাই বর্ধিষ্ণু জনমত।

তবু মুসলমানের তুলনায় হিন্দু যে একটু বেশি আত্মসমালোচনা করতে এবং পরের সমালোচনা সহ্য করতে সক্ষম, এটা কখনও কখনও তার স্বঘোষিত শত্রু-ও স্বীকার করেছে। একটা উপাদেয় উদাহরণ পেশ করি। তৎকালীন মুসলিম লীগের একজন প্রথম সারির নেতা, যিনি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় "ইত্তেহাদ" পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন, সেই আবুল মনসুর আহমদ সাহেব গান্ধীহত্যায় এতদূর অস্থির হয়েছিলেন যে হিন্দুদের অত্যন্ত অশালীন ভাষায় গাল দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রফুল্ল সেন মশাই ও আরো বহু হিন্দু নেতা নাকি প্রবন্ধটি পড়ে তাঁকে—মোবারকবাদ—অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ফলে এই ভদ্রলোক তাঁর "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বৎসর" গ্রন্থে লিখেছেন, 'হিন্দুস্তানে বসিয়া হিন্দুজাতিকে গাল দিয়া সম্মান ও তারিফ পাইলাম। মুসলমানের বিরুদ্ধে এমন কথা বলিলে তা পাকিস্তানেই হোক আর হিন্দুস্তানেই হোক, মহাত্মাজির পিছে পিছেই আমাকে দুনিয়া ত্যাগ করিতে হইত। কাজেই শেষ পর্যন্ত বুঝিলাম হিন্দুজাতি নীচ বটে কিন্তু নীচতা বুঝিবার মত উচ্চতাও তাদের আছে।' বাঁ হাতে দেওয়া প্রশংসাপত্র অবশ্যই, কিন্তু এই মন্তব্যে মুসলমানের নিন্দা, হিন্দুর নিন্দা এবং প্রশংসা সবই যে অকৃত্রিম—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিরোধের ধার ক্ষইয়ে দেবার জন্য আত্মসমালোচনা সবচেয়ে কার্যকর উপায়। আত্মসমালোচনায় অসাধারণ সৎসাহস ও তীক্ষ্ণ আত্মানুসন্ধান দেখেছি রবীন্দ্রনাথে, তাই তাঁর ছোট একটি বিচ্যুতিরও উল্লেখ করি। "কথা ও কাহিনী"-র 'হোরিখেলা' কবিতাটি আমাকে অল্প বয়সেই খুব বিচলিত করেছিল। শিশুপাঠ্য রামায়ণ-মহাভারতের কল্যাণে এদেশের শিশুরাও তো জানে যে, শত্রু যদি নিরস্ত্র হয় বা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তাহলে রণক্ষেত্রেও কোনো যথার্থ বীর তাকে হত্যা করে না। অথচ যে রাজপুতরা জগতে বীরত্বের আদর্শ, যে রাজপুত রমণীর অসাধারণ সম্ভ্রমবোধ তাকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করত সেই রাজপুত রমণী কী করে পাঠান... খাঁকে কপট হোলিখেলায় আহ্বান করে সানুচর তাকে এমন ক্রুরভাবে হত্যা করতে পারল? যে নীতি বিশুদ্ধ লেখনীর মহৎ সৃষ্টি গুরু গোবিন্দের... শিক্ষা" কিংবা আখ্যানকাব্য "সতী" কিংবা "গান্ধারীর আবেদন" সেই একই লেখনীর সৃষ্টি এই "হোরিখেলা" একথা ভাবতে ভালো লাগে না। 'যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিলো সে পথ দিয়ে ফিরলো নাকো তারা'—শেষ পঙ্‌ক্তির এই [illegible]টুকুতে ছলনাময়ী আস্থাভঙ্গকারিণীদের প্রতি যথেষ্ট ধিক্কার যে নেই, এতে আমাদের বিচারবোধ আহত

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়, স্বীকার না করে উপায় নেই। সম্প্রতি আরো বিমূঢ় বোধ করলাম শুনে যে এই কাব্যটিকেই জাতীয় সংহতির উপজাত হিসাবে নৃত্যগীতসহযোগে পেশ করছেন মমতাশঙ্করের দল। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সুবিচার করেন নি সেখানে অপরে কিভাবে অবিচারের কুশাঙ্কুর উপড়ে ফেলবে বুঝতে পারছি না।

যাই হোক, যে কোনো দ্বন্দ্বে আত্মপরনিরপেক্ষভাবে সুবিচার করার চেষ্টা থাকলে অন্যপক্ষের উপরেও একটা নৈতিক চাপ পড়ে তার ফলে। তা ছাড়া, প্রথমে নিজেদের সংশোধন করে নেবার পরেই তো বিরুদ্ধ পক্ষের সংশোধন দাবি করতে পারি আমরা। এইরকম একটা মনোভাবের সঙ্গে-সঙ্গে আরো একটা কথাও রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল যে, সারা ভারতে হিন্দুই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ, শিক্ষায় দীক্ষায় আর্থিক প্রতিষ্ঠায় বেশি অগ্রসর, অতএব বিরোধ মেটাবার কাজে যদি কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করতে হয় তবে হিন্দুই আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে একধাপ এগিয়ে যেতে পারেন। তাই চাকুরির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে প্রচণ্ড কোন্দলের মাঝখানে দাঁড়িয়েও বলতে পেরেছেন, 'মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এত দিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।... কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, তখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব।'

এই ঐক্যের প্রশ্নে আর-একটা কথাও পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন, যেহেতু বেশ বড় একটা গোষ্ঠী থেকে দাবি উঠেছে যে ভারতীয় ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি হতে পারে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান। ঐ যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু হইবে'—এর অর্থ কী? উনিও কি ঐ-জাতীয় দাবিরই প্রবক্তা? অর্থটা কিন্তু উনি নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন পরবর্তী বাক্যে 'তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।' কিন্তু এর আরো একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন এবং সেই ব্যাখ্যা আমরা পাই "আত্ম-পরিচয়" প্রবন্ধে। ব্রাহ্মরা নিজেদের হিন্দু বলবেন কিনা এই সংশয়ের নিরসন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'হিন্দু-সমাজের বহুস্তরবদ্ধ কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্যামী কাজ করিতেছেন তিনি জানেন তাহা হিন্দু-সমাজের পরিণাম।' তাই রবীন্দ্রনাথের মতে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু-

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমাজেরই অঙ্গ। আবার কোনো কোনো প্রসঙ্গে দেখছি 'হিন্দু' এবং 'ভারতবর্ষীয়' তাঁর কাছে সমার্থক—বরং এইভাবে বলা যায় কেবল তথাকথিত হিন্দুই ভারতবর্ষীয় নয়, ভারতবর্ষীয়-মাত্রই হিন্দু। যে অর্থে এককালে মার্কিন দেশে ভারতবর্ষীয় মাত্রই Hindoo বলে পরিচিত ছিল।

নিজের যুক্তির জের টেনে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তবে কি মুসলমান বা খৃস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দু-সমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই। কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খৃষ্টান। খৃষ্টান তাঁহাদের রং, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাঁহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খৃষ্টান, এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব একই পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে। বরঞ্চ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল ও সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে তাহা সত্যের বাধা—তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি—এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত অসংগত, তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধে।'

আবুল মনসুর সাহেবরা প্রায় এক দশকের মধ্যেই দেশের নব্বুই ভাগ মুসলমানকে তাঁদের সর্বনাশা দ্বিজাতিতত্ত্ব লওয়াতে পেরেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ যুক্তি এবং তথ্য বিস্তার করেও তাঁর এই শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত এক-জাতিতত্ত্ব এমন কি ব্রাহ্মদেরও লওয়াতে পারেন নি—অন্যে পরে কা কথা। তাহলে কোন্ আশায় তিনি সেই পত্রে লিখেছিলেন, 'আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব।' য়ুরোপ যেমন করে মধ্যযুগের ধর্মান্ধতা অতিক্রম করে আধুনিক যুগে এসে পড়েছে সত্যসাধনা এবং জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে, তেমন করে এসেই আমরা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে পারব তাঁর এই ভরসাকে তো য়ুরোপই মিথ্যা—নির্মম মিথ্যা প্রমাণ করে ছেড়েছে। আধুনিকীকরণেও নৃশংস ঘৃণার সমাধান নেই, একথা অর্ধ শতাব্দী আগেই তো আমরা দেখেছি। বরং ঘৃণাকে সর্বব্যাপী করা সহজতর হয়েছে আধুনিক গণমাধ্যমের সাহায্যে। আর সেই ঘৃণার তাণ্ডব কী প্রলয়ঙ্কর হতে পারে আধুনিকতম প্রহরণের সহায়তায়, তাও আমরা দেখেছিলাম হিরোসিমা-নাগাসাকিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাহলে কি বলতে হবে যে সমাজ-পরিবর্তনের কোন্ তত্ত্ব গৃহীত হবে আর কোন্‌টি হবে না তা সেই তত্ত্বের সারবত্তা কিংবা যৌক্তিকতার উপর মোটেই নির্ভর করে না? বরং করে জনমানসের যৌথ প্রবণতার উপরে? কিংবা যে রাজনৈতিক তত্ত্বে কিছু বৈষয়িক প্রাপ্তির প্রত্যাশা থাকে তা যতই কেন ভ্রান্ত হোক, যদি তেমন চিত্তাকর্ষী ভাষায় তাকে পেশ করা হয়। তবে তাই দ্রুত জনমানসকে অভিভূত করতে পারে সম্ভবত বার্ট্রাণ্ড রাসেল মানবচরিত্র বিষয়ে যে নৈরাশ্য সূচক মন্তব্য করেছেন সেটাই যথার্থ যে পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে "sense" বা সুবুদ্ধি যূথবদ্ধ মানুষকে যতটা পরিচালিত করেছে "nonsense" বা নির্বুদ্ধি তার চেয়ে নিয়ন্ত্রিত করেছে অনেক বেশি।

কিন্তু মানুষের সুবুদ্ধির, শুভ-ইচ্ছার উপর আস্থা হারালে, তাকে মঙ্গলের দিকে অনুপ্রাণিত করা যায় এই ভরসা না করতে পারলে, বর্তমানের কারাগার থেকে আমরা উদ্ধার পাব কোন্ পথে? রামজন্ম ভূমি আর বাবরী মসজিদের বিতর্ক যদি লাঠি আর ছোরা ছাড়া নিষ্পত্তি না করা যায়, তাহলে রবীন্দ্রনাথ কিংবা গান্ধীর মতো মানুষের জন্ম তো প্রকৃতির এক নিষ্ফল অর্থহীন কর্ম, নিদারুণ অপচয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

"—বহু দূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।"[১]

কবির এই বিনয়ভাষণকেই কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে অত্যন্ত প্রামাণিক সাক্ষ্য বলে ধরে নিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনের সুখদুঃখ সমস্যাদির অনুধাবনে কবির অক্ষমতার নজির হিসেবে একে উপস্থাপিত করে থাকেন। কিন্তু কবির সুবিস্তৃত রচনাবলীর অনেক বিস্মৃত অংশ, বিশেষ করে তাঁর গদ্য গ্রন্থাবলীর অনেকগুলি রচনা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে কোনো পাঠকের মনেই এই ভ্রম থাকতে পারে না। বস্তুতঃ কবির চিন্তা এবং কল্পনা প্রসারিত হয়েছে সর্বশ্রেণীর মানবের প্রতি, বিশেষ করে সমাজের নিম্নতলের যে মানুষ সর্বহারা অসহায়, ওদের কথা চিন্তা করেই কবির অন্তর সর্বদা করুণাকাতর এবং ভাবমন্থর হয়ে উঠেছে।

কবি কিন্তু সর্বদা অবাস্তব স্বপ্নলোকেও বিচরণ করেন নি। বাস্তব জীবনই তাঁর ধ্যানের বিষয়বস্তু, মর্ত্য পৃথিবীই তাঁর চির কামনার ধন—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।[২]

জন্মদিনে, ঐকতান
২ কড়ি ও কোমল, ঐ

~ www.amarboi.com ~

এই ছিল কবির জীবনের মূল মন্ত্র। কাজেই গভীর মর্ত্যবাদী বাস্তব-সচেতন কবিমন স্বভাবতঃই তাঁর সমকালীন ও স্থানিক সমস্যাবলী সম্পর্কেও কখনো উদাসীন থাকতে পারেনি। তবে রবীন্দ্রনাথ সর্বোপরি কবি, তাই হয়তো সমসাময়িক কোনো ঘটনার আঘাতে কবিচিত্ত মথিত হয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সংগীতের প্রস্রবণ; এক অপর্ব করুণার ধারা কিংবা বেদনার রক্ত-শতদল। যেমন 'এবার ফিরাও মোরে', 'সামান্য ক্ষতি', কিংবা 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটি। কিন্তু, কবিতা গল্প ছাড়াও গদ্য প্রবন্ধের সাদা-মাটা ভাষায়ও তিনি স্থানিক ও সমসাময়িক সমস্যাবলী নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। তেমনি আলোচিত সমস্যাবলীর মধ্যে একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ও তজ্জনিত সমস্যা।

দুঃখের বিষয়, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কী চিন্তা করেছিলেন কিংবা মুসলিম সমাজ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কিরূপ ছিল এ বিষয়ে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই বলেই মনে হয়। এ সম্বন্ধে আমি আপাতত নিজে মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকে, কবির নিজের কথা থেকেই তাঁর মতামত তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

ঐতিহাসিক সম্পর্ক

প্রথমে দেখা যাক এই অঞ্চলের সেকালের মুসলমান বাদশাহী শাসন সম্পর্কে কবি কী মনোভাব পোষণ করতেন। ইংরেজ রাজত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিলেন, তাহার পরে একটি কোম্পানী বসিয়াছিল, এখন একটি জাতি বসিয়াছে। আগে ছিল এক, এখন হইয়াছে অনেক।—

বাদশা যখন ছিলেন, তখন তিনি জানিতেন সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁরই, এখন ইংরেজ জাত জানে ভারতবর্ষ তাহাদের সকলেরই। একটা রাজপরিবার মাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজ জাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।—

বাদশাহের আমলে আমরা উজীর হইয়াছি, সেনাপতি হইয়াছি, দেশ শাসন করিবার ভার পাইয়াছি, এখন যে তাহা আমাদের আশার অতীত হইয়াছে, ইহার কারণ কী? অন্য গূঢ় বা প্রকাশ্য কারণ ছাড়িয়া দাও, একটা কারণ আছে সেত স্পষ্টই দেখিতেছি। ইংলণ্ড সমস্ত ইংরেজকে অন্ন দিতে পারে না—ভারতবর্ষে তাহাদের জন্য অন্নসত্র খোলা আবশ্যক। একটা জাতির অন্নের ভার অনেকটা পরিমাণে আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে; সেই অন্ন নানারকম আকারে নানারকম পাত্রে যোগাইতে হইতেছে।"[৩]

রাজা প্রজা, বহু র[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯১২ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত দিল্লী দরবারের উদ্যোগ কালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

"দিলদরাজ মোগল সম্রাটদের আমলে দিল্লীতে দরবার জমিত। আজ সে দিল নাই, সে দিল্লী নাই, তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে।...

"পূর্বেকার দরবারে সম্রাটেরা যে নিজের প্রতাপ জাহির করিতেন, তাহা নহে; সে সকল দরবার কাহারো কাছে তারস্বরে কিছু প্রমাণ করিবার জন্য ছিল না; তাহা স্বাভাবিক। সে সকল উৎসব বাদশাহ নবাবদের ঔদার্যের উদ্বেলিত প্রবাহ স্বরূপ ছিল, সেই প্রবাহ বদান্যতা বহন করিত, তাহাতে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিত, দীনের অভাব দূর হইত, তাহাতে আশা এবং আনন্দ দূর দূরান্তরে বিকীর্ণ হইয়া যাইত। আগামী দরবার উপলক্ষে কোন পীড়িত আশ্বস্ত হইয়াছে, কোন দরিদ্র সুখ স্বপ্ন দেখিতেছে? সেদিন যদি কোনো দুরাশাগ্রস্ত দুর্ভাগা দরখাস্ত হাতে সম্রাট প্রতিনিধির কাছে অগ্রসর হইতে চায়, তবে কি পুলিশের প্রহার পৃষ্ঠে লইয়া তাঁহাকে কাঁদিয়া ফিরিতে হইবে না?

"তাই বলিতেছিলাম আগামী দিল্লীর দরবার পাশ্চাত্য অত্যুক্তি, তাহা মেকি অত্যুক্তি। এদিকে হিসাব কিতাব এবং দোকানদারিটুকু আছে—ওদিকে প্রাচ্য সম্রাটের নকলটুকু না করিলে নয়।"[৪]

উক্ত প্রবন্ধেরই অন্যত্র কবি বলছেন "আকবর শাহজাহান প্রভৃতি বাদশারা নিজেদের কীর্তি নিজেরা রাখিয়া গেছেন, এখনকার দিনে রাজকর্মচারীরা নানা ছলে নানা কৌশলে প্রজাদের কাছ হইতে বড় বড় কীর্তিস্তম্ভ আদায় করিয়া লন। এই যে সম্রাটের প্রতিনিধি রাজাদিগকে (দেশীয় রাজ্যের) সালাম দিবার জন্য ডাকিয়াছেন, ইনি নিজের দানের দ্বারা কোথায় দীঘি খনন করাইয়াছেন, কোথায় পান্থশালা নির্মাণ করিয়াছেন, কোথায় দেশের বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্পচর্চাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন? সে-কালের বাদশারা নবাবরা, রাজকর্মচারীগণও এই সকল মঙ্গলকার্যের দ্বারা প্রজাদের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ রাখিতেন।"

রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত উক্তিগুলি থেকে আশা করি নিশ্চয়ই এইটে স্পষ্ট হবে যে, কবি সুশাসক, দানশীল, ও 'দরাজ দিল' নবাব বাদশাহের প্রতি যথার্থ এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনের তুলনায় সে আমলের মুসলমান শাসনকে অনেক দিক থেকে শ্রেয় ও বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। কবি মনে করতেন সেকালের নবাব বাদশাহের সঙ্গে তাঁদের সবশ্রেণীর প্রজারই হৃদয়ের একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ

[৪] রাজা প্রজা, অত্যু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিল যেটা ব্রিটিশ শাসকগণ কখনও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, 'দিল দরাজ' বাদশাহদের এমনি একটা ঔদার্য এবং মহত্ত্ব ছিল যেটা বণিক বৃত্তিধারী ব্রিটিশ জাতির চরিত্রের বহির্ভূত। ব্রিটিশদের মধ্যে যেটা ছিল সেটা উচ্চশ্রেণীর বণিকোচিত সততা ও চুলচেরা হিসাব নিকাশে পারদর্শিতা। সব কিছু তাঁরা যেন নিক্তির মাপে ওজন করে যাচাই করেছেন, তার মূলে রয়েছে ধীর স্থির কুশলী বণিকবুদ্ধি, হৃদয়ের স্থান তাতে ছিল না। হৃদয়ের যে বৃত্তির তাড়নায় মানুষ কখনও অল্পেতে বিচলিত হয়ে একটা অন্যায় অবিচার করে বসতে পারে; এক, মুহূর্তে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে প্রতিপক্ষের মস্তক বিচুর্ণিত করতে পারে পরমুহূর্তেই আবার সেই ব্যক্তিকেই বুকে তুলে উল্লাসে নৃত্য করতে পারে, অজস্র বদান্যতায় আপনকৃত অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে অগ্রসর হয়, সেই বিচিত্র এবং প্রবল হৃদয়বৃত্তির সংবাদ ইংরেজ অবগত নয়। সে রকম বিচিত্র এবং বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন সে আমলের নবাব বাদশাহগণ। এইটেই কবি বলতে চেয়েছেন এবং এর মধ্যে দিয়ে তাঁর মুসলমান শাসকদের প্রতি বিদ্বেষরহিত এক সমদর্শী মনোভাবই যে শুধু প্রকাশ পেয়েছে, তা নয়, উপরন্তু তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাশীলতা এবং প্রীতির ভাবও প্রকাশিত হয়েছে।

আরও বহুস্থলে মুসলমান আমলের প্রতি কবির এই শ্রদ্ধার ভাব দেখা গেছে। নিখিলনাথ যায় মহাশয়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' নামক গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

"মুসলমানদের রাজত্ব গিয়াছে, অথচ কোথাও তাহার জন্য স্থান শূন্য নাই। ইংরাজ রাজত্বের রেলের বাঁশি, স্টিমারের বাঁশি, কারখানার বাঁশি চারিদিকে বাজিয়া উঠিয়াছে—চারিদিকে আফিস ঘর, আদালত ঘর, থানা ঘর মাথা তুলিতেছে; ইংরাজের নূতন চুনকাম করা ফিটফাট ধবধবে প্রতাপ দেশ জুড়িয়া ভিত্তি গাড়িয়াছে—কোথাও বিচ্ছেদ নাই। তথাপি নিখিলবাবুর 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এই নূতন কর্ম-কোলাহলময় মহিমা মরীচিকাবৎ নিঃশব্দে অন্তর্হিত, তাহার পাটের কলের বাঁশি নীরব, কেবল আমাদের চতুর্দিকে মুসলমানদের পরিত্যক্ত পুরীর প্রকাণ্ড ভগ্নবিশেষ নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া। নিঃশব্দ নহবৎখানা, হস্তীহীন হস্তীশালা, প্রভুশূন্য রাজতক্ত, প্রজাশূন্য আম-দরবার, নির্বাণদীপ বেগমমহল একটি পরম বিষাদময় বৈরাগ্যময় মহত্ত্বে বিরাজ করিতেছে।"[৫]

হৃদয়ের আবেগ-কম্পিত অনুরাগের স্পর্শেই যে কবির ভাষা এমন স্পন্দিত হয়ে উঠেছে, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এমন কথা শুধু তিনিই লিখতে পারেন, যাঁর সে

[৫] ভারতী (পত্রিকা), [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমলের ইতিহাস, এমনকি, তার ভগ্ন কীর্তি চিহ্নগুলির প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ রয়েছে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথই শুধু সাহস করে লেখককে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন—

"শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'সিরাজদ্দৌলা' পাঠ করিয়া কোন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্র ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন।

"স্বজাতি সম্বন্ধে পরের নিকট হইতে নিন্দোক্তি শুনিলে ক্রোধ হইতেই পারে। সমূলক হইলেও।

"কিন্তু আমাদের সহিত উক্ত পত্র-সম্পাদকের কত প্রভেদ। আমাদিগকে বিদেশী লিখিত নিন্দোক্তি বাধ্য হইয়া অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিতে হয়।...

"প্রথম শিক্ষাকালে ইংরাজের গ্রন্থ আমরা বেদবাক্য স্বরূপ গ্রহণ করিতাম। তাহা আমাদিগকে যতই ব্যথিত করুক—তাহার যে প্রতিবাদ সম্ভবপর, তাহার যে প্রমাণ আলোচনা আমাদের আয়ত্তগত এ কথা আমাদের বিশ্বাস হইত না। নীরবে নতশিরে আপনাদের প্রতি ধিক্কার সহকারে সমস্ত লাঞ্ছনাকে সম্পূর্ণ সত্যজ্ঞানে বহন করিতে হইত।

"এমন অবস্থায় আমাদের দেশের যে কোন কৃতি-গুণী-ক্ষমতাশালী লেখক সেই মানসিক বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে অন্ধ অনুবৃত্তি হইতে মুক্তি-লাভের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছেন, তিনি আমাদের দেশের কৃতজ্ঞতাপাত্র।"[৬]

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় রবীন্দ্রনাথ কেমন করে নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলের ইতিহাসের সঙ্গে নিজের ঐক্য অনুভব করেছেন; মুসলমান নবাবের গৌরবকে নিজের গৌরব বলে—তার অপমানকে নিজের অপমান বলে স্বীকার করেছেন।

নবাব সিরাজদ্দৌলার নিজের সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা আদৌ অন্যান্য লেখকদের মতো বিদ্বেষ-দুষ্ট নয়, বরং এক অপক্ষপাত ন্যায়দর্শী সত্যদৃষ্টির পরিচায়ক

"শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে ঐতিহাসিক রহস্যের যেখানে যবনিকা উত্তোলন করিয়াছেন, সেখানে মোগল সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ প্রাসাদদ্বারে ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় অত্যন্ত দীনভাবে দণ্ডায়মান।...

ভারতী, শ্রাবণ, ১৩০৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এমন সময়ে সিরাজদ্দৌলা যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং ইংরেজের স্বেচ্ছাচারিতা দমন করিবার জন্য কঠিন শাসন বিস্তার করিলেন।

রাজমর্যাদাভিমানী নবাবের সহিত ধনলোলুপ বিদেশী বণিকের দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিল। এই দ্বন্দ্বে বণিক পক্ষে গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। সিরাজদ্দৌলা যদিও উন্নত চরিত্র মহৎ ব্যক্তি ছিলেন না, তথাপি এই দ্বন্দ্বের হীনতা মিথ্যাচার প্রতারণার উপরে তাঁহার সাহস ও সরলতা, বীর্য ও ক্ষমা রাজোচিত মহত্ত্বে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।"[৭]

কবির হৃদয়ের অনুরাগ ও সহানুভূতি যে কার প্রতি, উপরি উদ্ধৃত উক্তি থেকে তা বুঝে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধে হয় না। ইংরেজের সঙ্গে তুলনায় কিছুটা যেন তাঁর সমদর্শী বিচারশীলতাকে অতিক্রম করেই তাঁর অন্তরের উদ্বেলিত প্রীতিরস নিষিক্ত হয়েছে এই বহুনিন্দিত কলঙ্ককালিমা লিপ্ত হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রতি।

এদেশের বিদেশী মুসলমানদের আগমন ও শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সকলেরই জানা আছে। বলাবাহুল্য, সর্বদেশের সর্বকালের সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসের মতোই তা কেবল প্রেম আর গলাগলি কোলাকুলির কাহিনীই নয়, সে কাজে তরবারিরও যথেষ্ট প্রয়োজন হয়েছিল। অমুসলমান কোন ভারত সন্তানের কাছেই সে কাহিনী প্রীতিকর হতে পারে না। তবু মুসলমান কর্তৃক এই ভারত বিজয় সম্পর্কে বলতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য সংযম, ব্যবস্থিতচিত্ততা ও ন্যায়দর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন

"ভারতবর্ষে মুসলমান প্রবেশের অনতিপূর্বে খ্রীস্ট-শতাব্দীর আরম্ভ কালে ভারত ইতিহাসে এক রোমাঞ্চকর মহাশূন্যতা দেখা যায়। দীর্ঘ দিবসের অবসানের পর একটা যেন চেতনাহীন সুষুপ্তির অন্ধকার সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল—সেটুকু সময়ের কোন জাগ্রত সাক্ষী, কোন প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া যায় না।—

"এদিকে অনতিপূর্বে ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বহুতর খণ্ডবিচ্ছিন্ন জাতি মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচণ্ড আকর্ষণবলে একীভূত হইয়া মুসলমান নামক এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। তাহারা যেন ভিন্ন ভিন্ন দুর্গম মরুময় গিরিশিখরের উপরে খণ্ডতুষারের ন্যায় নিজের নিকটে অপ্রবুদ্ধ এবং বাহিরের নিকটে অজ্ঞাত হইয়া বিরাজ করিতেছিল। কখন প্রচণ্ড সূর্যের উদয় হইল এবং দেখিতে দেখিতে নানা শিখর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তুষারস্রুত বন্যা একবার একত্রে স্ফীত হইয়া সহস্রধারায় জগৎকে চতুর্দিকে আক্রমণ করিতে বাহির হইল।"[৮]

---

[৭] ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫

ভারতী, শ্রাবণ, ১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ তো আক্রমণের ইতিহাস নয়; এ যে প্রশস্তি। সে প্রশস্তি একদিকে যেমন 'মহাপুরুষ মহম্মদের' চরিত্রের প্রতি, তেমনি অপরদিকে 'বিশ্ববিজয়োদ্দীপ্ত নবীন বলে' বলীয়ান মুসলমান জাতির প্রতি। কোন বিজিত জাতির লেখকের মধ্যে বিজেতা জাতির প্রতি এমনি উদার এবং শ্রদ্ধাশীল মনোভাব আর কোথাও দেখা গেছে বলে জানি না।

ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ক

মহাপুরুষদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

"মহাপুরুষেরা ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, আর আমরা তাহার মধ্য হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্মটা লই না। কারণ বিধাতার বিধানে ধর্ম জিনিসটাকে নিজের স্বাধীন শক্তির দ্বারাই পাইতে হয়, অন্যের কাছ হইতে আরামে ভিক্ষা মাগিয়া লইবার জো নাই। কোন সত্য পদার্থই আমরা আর কাহারও কাছ হইতে কেবল হাত পাতিয়া চাহিয়া পাইতে পারি না। যেখানে সহজ রাস্তা ধরিয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছি, সেখানেই ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তেমন করিয়া যাহা পাইয়াছি তাহাতে আত্মার পেট ভরে নাই, কিন্তু আত্মার জাত গিয়াছে।"[৯]

আমাদেরও হয়েছে তাই। আমরাও ধর্মকে বাদ দিয়ে সম্প্রদায় নিয়ে আছি, তাইতো আমাদের মধ্যে দলাদলি ও বিরোধের অন্ত নাই। নইলে ধর্মে ধর্মে তো বিরোধের কিছু ছিল না, কারণ সব ধর্মের আদর্শই তো এক; সব ধর্মই সেই এক মঙ্গলময়ের কাছে আত্মনিবেদনের দীক্ষাই মানুষকে দিয়ে এসেছে। যাঁরা ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ, তাঁদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই, সম্প্রদায়বোধের অহমিকা যাঁদের বেশী, বিরোধ সৃষ্টি করেন তাঁরাই।

এই দূরপনেয় সম্প্রদায়বোধই ভারতবর্ষে বিভেদ ও বিরোধের মূল কারণ। সম্প্রদায়বোধের অহমিকায় উদ্বুদ্ধ এই দেশের এক সমাজ নিজেদের চতুষ্পার্শ্বে আচারের এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ও বেড়াজাল রচনা করে রেখেছিল, যাতে মানুষে মানুষে শুধু বিভেদেরই সৃষ্টি হয়েছে, মিলনের পথ হয়েছে রুদ্ধ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক কালেই হিন্দু-মুসলমান, এ দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণের এই ইতিবৃত্ত সম্পর্কে কবির কী অভিমত এবারে আমরা তাই আলোচনা করব।

---

[৯] চারিত্রপূজা, মহাপুরুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ কথা সত্য যে তৎকালীন ভারতবর্ষের (১৯০০-১৯৪৭ পর্যন্ত) একটা প্রধান, বোধহয় সর্বপ্রধান, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ছিল হিন্দু-মুসলিম সমস্যা। রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন এ বিষয়ে স্বভাবতঃই উদাসীন থাকতে পারেনি। ১৩১৫ (১৯০৮) সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড় সমস্যা যে কী অল্পদিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা সেদিন মনে করিয়াছিলাম, পার্টিশন ব্যাপারে আমরা যে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইয়াছি, ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতি নিমকের সম্বন্ধ কাটিব এবং দেশের বিলাতি বস্ত্রহরণ না করিয়া জল গ্রহণ করিব না। পরের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা যেমনি করিয়াছি অমনি ঘরের মধ্যে এমন একটা গোল বাধিল যে এমনতর আর কখনো দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে বীভৎস হইয়া উঠিল।"[১০]

হিন্দু নেতাদের মতো রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যাকে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে বা ধামাচাপা দিতে চান নি। এমন কি মুসলমানরা 'প্রতিপক্ষ' বলে তিনি তাদের মধ্যে অহেতুক দোষ অন্বেষণ করতেও যান নি। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অপক্ষপাত দৃষ্টিতে এই সমস্যার বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং এর মূল কারণ অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছেন। উক্ত প্রবন্ধেই তিনি বলেছেন—

"এই ব্যাপার আমাদের পক্ষে যতই একান্ত কষ্টকর হউক কিন্তু আমাদের এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। এ কথা আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবেই জানা আবশ্যক ছিল, আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক, এই বাস্তব সত্যটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতেই যাই না কেন এই বাস্তবটি আমাদিগকে কখনই বিস্মৃত হইবে না। একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।"

এই উক্তি, মনে রাখা দরকার, ১৯০৮ সনের; অর্থাৎ যখন স্বয়ং কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেসের গোঁড়া সমর্থক এবং তার পরও বহু বৎসর পর্যন্ত তিনি ছিলেন "হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের অগ্রদূত"। এ প্রসঙ্গে আমি কায়েদে আজমের একটি জীবনী থেকে খানিকটা অংশ তুলে দিচ্ছি

"১৯১৩ সন জিন্নার জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর তাঁরই প্রভাবে মুসলিম লীগ প্রায় কংগ্রেসের অনুরূপ আদর্শ গ্রহণ করে। লীগের আদর্শ

প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৫ (রাজা-প্রজা, সমস্যা)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘোষণা ক'রে যে মুসাবিদা তৈরী হয়, তার মধ্যে এই কথাই বিশেষভাবে বলা হয় যে, সংস্কার দ্বারা বর্তমান শাসতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এই পরিবর্তন সাধিত হবে ঐক্যের ভিতর দিয়ে জনগণের মনে এক অপূর্ব চেতনার সঞ্চার ক'রে। লীগের এই আদর্শ রচনার মধ্যে আগা খান, মৌলানা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ দেশমান্য নেতাদের হাত থাকলেও জিন্নার প্রভাব ও মতাদর্শ বিশেষভাবেই কাজ করেছে।"[১১]

তারপর ১৯২৮ সন পর্যন্ত কায়েদে আজম এই 'ঐক্যে'র জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছেন। অবশেষে হতাশ হয়ে ১৯২৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে আহূত মুসলিম লীগের এক সম্মেলনে কায়েদে আজম তাঁর বিখ্যাত ১৪ দফা দাবী পেশ করেন এবং মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন।

এর অন্ততঃ কুড়ি বৎসর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের 'স্বাতন্ত্র্য' উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং "আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এই বাস্তবটিকে" স্বীকার করেছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যকে "বাস্তব সত্য" বলে মেনেছেন এবং এই সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকার বিরুদ্ধে, কোনো রকম জোড়াতাড়া দিয়ে তার প্রতিকারের চেষ্টা করার বিরুদ্ধে বার বার সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন।

কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ আবার প্রবাসীতে লিখছেন

"ম্যাপে দাগ টানিয়া, হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ, বাঙালী হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গিয়াছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই; দুই পক্ষ এক রকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।"[১২]

অর্থাৎ মুসলিম নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত তখনও যে সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং হিন্দু-মুসলমানের মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথ অত আগে থেকেই সেই পার্থক্যের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে তজ্জনিত সমস্যার আলোচনায় যত্নবান হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যেকার এই পার্থক্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করতেও চেষ্টা করেছেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিরোধ দূর করতে হলে বিরোধের প্রকৃত

রশীদ, কায়েদে আজম

প্রবাসী, শ্রাবণ, ১...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কারণটিও জানা প্রয়োজন। আর বিরোধের অবসান সম্ভব পার্থক্যকে অস্বীকার করে বা তার ওপর প্রলেপ দিয়ে নয়; পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে পরস্পরের যথার্থ স্বাতন্ত্র্য ও ইচ্ছাকে সম্মান করেই প্রকৃত সমঝোতা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের মতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে 'পার্থক্যের' মূল উপাদান রয়েছে দুটি (ক) ধর্মীয় ও সামাজিক পার্থক্য, (খ) অর্থনৈতিক পার্থক্য।

কবির ভাষায়-ই শোনা যাক

"আমাদের আর একটি প্রধান সমস্যা হিন্দু মুসলমান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যতঃ আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমানির্দেশ করছে। সেই ধর্মই তাদের মানববিশ্বকে সাদা কালো ছক কেটে দুই সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করছে—আত্ম ও পর। সংসারে সর্বত্রই আত্মপরের মধ্যে কিছু পরিমাণ স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই ভেদের পরিমাণটা অতিমাত্রা হলেই তাতে অকল্যাণ হয়।... এই ভেদের মাত্রা যে জাতির মধ্যে অন্তরের দিক থেকে যতই কমে এসেছে সেই জাতি ততই উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলিয়া পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বাহিরে উভয়েরই জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে।—আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে।"[১৩]

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

"ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, এ কথা মানতেই হবে।... আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলেছি, মুসলমানের ত্রুটিবিচারটা থাক—আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্য যেন লজ্জা স্বীকার করি। অল্প বয়সে যখন জমিদারী সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম, আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তপোষে গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে একধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের জন্য; আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। অথচ এই ম্যানেজার আধুনিক দেশাত্মবোধী দলের।"[১৪]

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ (কালান্তর, সমস্যা)
প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৮, হিন্দু-মুসলমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এখানে হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃই হিন্দু সমাজের অনুদারতাকে দায়ী করেছেন। বাহ্য আচারের প্রাধান্যমূলক হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিলন চেষ্টায় মুসলমানরা যে যুগ যুগ ধরে প্রচুর বাধা পেয়ে এসেছে একথা সত্যি। কিন্তু "হিন্দুর তরফ থেকে" একমাত্র রবীন্দ্রনাথই এই সত্যকে স্বীকার করেছেন। হিন্দু সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। আর বহুস্থলে কবির এই স্বীকৃতি এবং স্পষ্টোক্তির নির্দেশন রয়েছে। যেমন—

"হিন্দুসমাজের আচার নিয়েছে ধর্মের নাম। এই কারণে আচারের পার্থক্য পরস্পরের মধ্যে কঠিন বিচ্ছেদ ঘটায়।... মাংসাশী বাঙালীকে নিরামিষ প্রদেশের প্রতিবেশী আপন বলে মনে করতে কঠিন বাধা পায়।... যে চিত্তবৃত্তি বাহ্য আচারকে অত্যন্ত বড় মূল্য দিয়ে থাকে তার মহত্ত্ববোধ সংকীর্ণ হতে বাধ্য। রাষ্ট্রসম্মিলনীতেও এই অভাব কথায় কথায় ধরা পড়ে এবং দেখা যায়, আমরা যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াই তা সংস্কারগত অতি সূক্ষ্ম এবং সেইজন্য অতি দুর্লঙ্ঘ্য।[১৫]

হিন্দুসমাজের এই 'আচার'-পরায়ণতা দুর্জয় প্রাকারের মতো শুধু মুসলমানদের নয়, মানবজাতির অন্যান্য অংশকেও যেন দারুণ অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেকিয়ে রেখেছিল, আর এই দুর্ভেদ্য পাষাণই জিন্নাহ্ সাহেবের মতো দুর্ধর্ষ কর্মী, মাওলানা মোহাম্মদ আলীর মতো উদার প্রেমিকের সমস্ত মিলন প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এইটে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এই সত্যকে স্বীকৃতি দেবার মতো উদারতা এবং সৎসাহসও তাঁর ছিল।

কবি আরও বলেছেন—

"অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসলমানদের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে; ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানদের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অপর পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে। এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে হিন্দু যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ—এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল।"[১৬]

---

[১৫] প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩[illegible]
শান্তিনিকেতন ([illegible] শ্রাবণ, ১২৯[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উক্ত প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরও কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আচারে ব্যবহারে মুসলমান অন্য সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খেলাফত উপলক্ষ্যে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার যচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে।"[১৭]

লক্ষ্য করবার বিষয়, আচারের গণ্ডী দ্বারা আবদ্ধ বলে হিন্দু সমাজের নিন্দা তো রবীন্দ্রনাথ করেইছেন, উপরন্তু সেই সমাজের প্রতি 'প্রতিক্রিয়াশীল' 'সংকীর্ণ চিত্তবৃত্তি' সম্পন্ন ইত্যাদি কঠোর মন্তব্য করতেও বিরত হননি। হিন্দু-মুসলমানে যে মিলন সম্ভবপর হয়নি তার জন্য রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃই হিন্দু-সমাজকে প্রধানভাবে দায়ী করেছেন; কারণ মুসলমান তবু হিন্দুকে কাছে টানতে পেরেছে কিন্তু 'হিন্দু মুসলমানকে কাছে টানতে পারেনি।"

হিন্দু সমাজের আচারের নামে এই অনাচার কখনও কখনও কী উগ্ররূপ ধারণ করতে পারে ও কতটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে, তার পরিচয়ও রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন—

"আমাদের দেশে এমন অসংখ্য লোক আছে, মুসলমান কুয়ো থেকে জল তুলতে এলে মুসলমানকে মেরে খুন করতে যারা কুণ্ঠিত হবে না।"[১৮]

যে চরকা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি, উপরিউক্ত মন্তব্য করেছেন, সেই চরকা সম্বন্ধে তাঁর মতামতের অংশবিশেষ তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না—

"জলের শুচিতা রক্ষার ধর্মবিধি মানুষের প্রাণহিংসা না করার ধর্মবিধিকে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। আমাদের দেশে নিত্যধর্মের সঙ্গে আচার ধর্মকে মিলিয়ে দেওয়ার দ্বারা এ রকম দুর্গতি যে কত ঘটছে, তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের এই মজ্জাগত সনাতন অভ্যাসেরই জোরে আজ চরকা-খদ্দর—সর্বপ্রধান স্বারাজ্যিক ধর্মকর্মের বেশে গদা হাতে বেড়াতে পারল কেউ তাতে বিস্মিত হল না।—যে আচারপরায়ণ সংস্কারের অন্ধতা থেকে আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতা রীতির উৎপত্তি, সেই অন্ধতাই আজ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে চরকা-খাদ্দরিক অস্পৃশ্যতা জাগিয়ে তুলছে।"[১৮]

---

[১৭] শান্তিনিকেতন (পত্রিকা), শ্রাবণ, ১৩২৯

চরকা, সবুজপত্র, ১৩২৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবি বলতে চান, অস্পৃশ্যতা বা ছুঁৎমার্গ যেমন এক প্রকার গোঁড়ামী তেমনি চরকা-খদ্দরও আরেক প্রকারের গোঁড়ামী। এ-ও একটা আচার প্রাধান্য; বুদ্ধি ও বিবেককে ছাঁচে ফেলে ঢালাই করে নিয়ে নিজেদের এক বিশেষ দল গড়ে তোলা—ইংরেজীতে যাক বলে Regimentation. বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার Regimentation-এরই বিরোধী।

হিন্দু সমাজের শুচিবাই বা 'অস্পৃশ্যতা'ই যে মুসলমান সমাজকে আপন করে নেবার একটা প্রবল বাধা ছিল তাই দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরেক জায়গায় লিখেছেন—

"হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগিকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।—

"আমরা আপিসে ও বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি, সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তাহা মানি; তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, তত হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।"[১৯]

অস্পৃশ্যতার ভেদ-বুদ্ধির অপমান যে, যে-কোনো মানুষের অন্তরকেই স্পর্শ করতে বাধ্য, এ কথা আর কেউ না বুঝে থাক, রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। কাজ উদ্ধারের সময় মুসলমানদের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে বলব, 'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই' আর মানুষ হিসেবে তাদের অপমান করে দূরে ঠেকিয়ে রাখব, এটাকে এক প্রকার ভণ্ডামী বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তার নিন্দা করেছেন। সে কাথায় আমরা পরে আসছি।

তার আগে, যে কোরবানী নিয়ে হিন্দুদের এত অসহিষ্ণুতা এবং যার জন্য হিন্দু-মুসলমানে বার বার দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে সেই কোরবানীর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কী বলেন দেখা যাক

"আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোরবানী নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করিনি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে

[১৯] কালান্তর, লোক...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দুদের মনে অকারণ আঘাত না লাগে তারা তখনই তা মেনে নিলে। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটেনি।"[২০]

শুধু তাই নয়, কোরবানী বন্ধ করবার চেষ্টা হিন্দুদের পক্ষে অন্যায় জেদ ও জবরদস্তি একথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কারণ 'ধর্মের, নামে পশুহত্যা' তারাও করে থাকে

"বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায় এবং সেটাকে জোর করিয়া অন্য ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনো কালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্য ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না।"[২১]

এর চাইতে উদারতা এবং সমদর্শিতার কথা আর কী হতে পারে। বরং মনে হয় রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে হিন্দুদের প্রতি কখনও কখনও কিছুটা কঠিন আঘাতই করে ফেলেছেন। তবে ন্যায়পরায়ণ চরিত্রের ধর্মই এই রকম, সে আঘাত করতে হলে নিজেকেই প্রথম আঘাত করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মুসলমানের ত্রুটি-বিচারটা থাক', নিজেদের ত্রুটিই পূর্বে দেখা কর্তব্য। তিনি এও নিশ্চয়ই জানতেন যে মুসলমানের ত্রুটি আলোচনা করতে গেলে তাঁকে পদে পদে ভুল বোঝার সম্ভাবনা। মুসলমানদের সমালোচনা বিশেষ কিছু না করা সত্ত্বেও তাঁকে সে তেমনি ভুল বোঝার অবসান হয়েছে তা যদিও বলা যায় না।

যারা ক্ষুদ্র আচারকে নিত্যধর্ম, মানবধর্মের ওপরে স্থান দিয়েছে তাদের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন—

"ধর্ম যাদের পৃথক করে তাদের মেলবার দরজায় ভেতর থেকে আগল দেওয়া। কথাটা পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করি। সকলেই বলে থাকে, ধর্ম শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে যা আমাদের ধারণ করে। অর্থাৎ, আমাদের যে সকল আশ্রয় ধ্রুব তারা হচ্ছে ধর্মের অধিকারভুক্ত। তাদের সম্বন্ধে তর্ক নেই। এই সকল আশ্রয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।...

"কিন্তু সংসারের এমন একটা বিভাগ আছে যেখানে পরিবর্তন চলছে, যেখানে আকস্মিকের আনাগোনার অন্ত নেই; সেখানে নূতন নূতন অবস্থার সঙ্গে নূতন করে বারে বারে আপোষ নিষ্পত্তি না করলে আমরা বাঁচি নে। এই নিত্য

হিন্দু-মুসলমান, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৮

কালান্তর, ছোটো ও বড়ো, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধ্রুবকে অধ্রুবের জায়গায়, অধ্রুবকে ধ্রুবের জায়গায় বসাতে গেলে বিপদ ঘটবেই।

"ধর্ম যখন বলে 'মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো' তখন কোনো তর্ক না করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব। ধর্মের এ কথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতোই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে 'মুসলমানের ছোঁওয়া অন্ন গ্রহণ করবে না' তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে 'কেন করব না।' এ কথাটা আমার কাছে ঘড়ার জলের মতো অনিত্য, তাকে রাখব কি ফেলব সেটার বিচার যুক্তির দ্বারা। যদি বল এসব কথা স্বাধীন বিচারের অতীত, তা হলে শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে বিচারের যোগ্য বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার ধিক্কার আছে—যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। তারা পাণ্ডাকে বেশী ভয় ও শ্রদ্ধা করে, এমনি করে তারা দেবপূজার অপমান করতে কুণ্ঠিত হয় না।"[২২]

রবীন্দ্রনাথের মতে হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রাচার যখন মুসলমানকে অস্পৃশ্য বলে দূরে রাখে তখন ঐ তথাকথিত ধর্ম মানুষের নিত্যধর্মের অবমাননা করে। রবীন্দ্রনাথ এই তথাকথিত ধর্মের অনুশাসনকে অমান্য করে 'মুসলমানের ছোঁওয়া অন্ন গ্রহণ' করতে প্রস্তুত; শুধু তাই নয়, হিন্দু-শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের সামনে দাঁড়িয়েই সেই শাস্ত্রকে ধিক্কার দিতে পর্যন্ত পরান্মুখ হননি।

মুসলমান সমাজকে পর ভেবে দূরে সরিয়ে রাখার বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজকে সতর্ক করে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন যে এর ফল ভয়ানক অশুভ হতে বাধ্য

"ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা সফল হবে, তা'হলে বড়োই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতে পারে, কিন্তু ছাদ রক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়। আমাদের সবচেয়ে বড়ো অমঙ্গল বড়ো দুর্গতি ঘটে যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে অথচ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নেই, অথবা সেই সম্বন্ধ বিকৃত।—

"এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্বন্ধ থাকবে না, হয়তো বা প্রয়োজনের থাকতে পারে—সেইখানেই যে ছিদ্র, ছিদ্র নয়, কলির সিংহদ্বার। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানেই আকাশ ভেদ করে ওঠে অমঙ্গলের জয়-তোরণ।"[২৩]

কালান্তর, সমস্যা

প্রবাসী, মাঘ, ১[illegible]৩

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিরপেক্ষ পাঠকই বিচার করবেন কবির কথা কতদূর সত্য বা অসত্য প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু এমনি বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজ তাঁর কথা তখন কানে তোলেন নি। বরং তাঁরা চরকা-খদ্দর দিয়ে ভারতকে এক সূত্রে বেঁধে ফেলার অবাস্তব স্বপ্নে মশগুল ছিলেন; শুধু তাই নয়, সবাইকে 'আল্লাহু আকবর' আর 'বন্দে মাতরম' বলিয়ে নিয়ে রাতারাতি এক করে ফেলবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু যাদের মধ্যে আন্তরিক অনৈক্য রয়েছে, রয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি বহুবিধ বৈষম্য, তাদের এমনি শুধু মুখের কথায় এক করা যায় না, এমন কি 'ঈশ্বর আল্লা এক হ্যায়' বললেও নয় (ঈশ্বর আর আল্লাহর বোধ—conception সত্যিই এক তো নয়)। রবীন্দ্রনাথের উক্তির এই তাৎপর্য।

এই তো গেল সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। অভিমত আশা করি উপরের আলোচনা থেকে এইটে স্পষ্ট হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের মতে, হিন্দু মুসলমানের সামাজিক অনৈক্যের হেতু আসলে হিন্দু সমাজের অনুদার মনোভাব, বিশেষ করে তার আচার ও সংস্কারের বেড়াজাল।

এ প্রসঙ্গে একজন বিশিষ্ট মুসলমান চিন্তাবিদ অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব যা বলেছেন তার খানিকটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি

"এই যে সুপরিচিত সিদ্ধান্ত যে, হিন্দু হিন্দুত্বে নিষ্ঠাবান হলে এবং মুসলমান মুসলমানত্বে নিষ্ঠাবান হলে তাদের মিলন সম্ভবপর হবে, এর উপরে যাদের নির্ভর তারা সাধু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েও অন্ধকারে পা বাড়ান। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে তাদের যাচাই করা উচিত—হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব বলতে তারা কী বোঝেন। কিন্তু তেমনভাবে যাচাই করতে গেলে তাদের অবলম্বন হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব হবে না। হবে এ দু'য়েরই অন্তর্নিহিত সৃষ্টি ধর্ম। অন্যভাবে কথাটা বললে দাঁড়ায়, হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব অতীতে ও বর্তমানে যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল ও করেছে তাই-ই সে-সবের প্রকৃত রূপ এ-কথা অর্থহীন, তার পরিবর্তে এইসব ধর্ম ভবিষ্যতে কিভাবে মানুষের জ্ঞান ও কর্মশক্তির সূতিকাগার হবে—এই-ই হওয়া চাই হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকদেরই বিশেষ সাধনার বিষয়। এই কথাই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীতে---যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র।[২৪]

এখানে শুধু একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, গান্ধীজী ছিলেন প্রথমোক্ত মতের পোষক আর রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়োক্ত মতের সমর্থক। গান্ধীজী ধর্মের নাম করে হিন্দু মুসলমানকে একত্র মেলাতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ উভয়ের স্বাতন্ত্র্য ও মত-

[২৪] কাজী আবদুল ও[illegible] পৃ. ৫৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে, এদের মধ্যেকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে, দুই-এর মধ্যে মৈত্রী (ঐক্য নয়) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজীর নীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের নীতির পরীক্ষা বর্তমানে চলছে।

এবারে হিন্দু-মুসলমানের অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে কবির কি অভিমত দেখা যাক।

হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের একটা প্রধান কারণ সরকারী চাকুরী-বাকুরী ক্ষেত্রে দু'য়ের অসমকক্ষতা; হিন্দুদের প্রাধান্য ও তজ্জনিত মুসলমানদের চিত্তক্ষোভ। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

"আমরা গোড়া হইতে ইংরাজের স্কুলে বেশী মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গভর্নমেন্টের চাকুরী ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশী পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এই রূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোন মতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অসূরায় অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন, তবে অবস্থার অসাম্যবশতঃ জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা যেন আমরা সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি।"[২৫]

আর একটি প্রবন্ধেও কবি লিখেছেন—

"আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষে মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়ে হিন্দুর চেয়ে বেশী দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার এই দাবীতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদমান শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।... সেখানে তাহাদের প্রাপ্যের ভাগ আমাদের চেয়ে পরিমাণে বেশী হইতেছে বলিয়া অহরহ কলহ করিবার ক্ষুদ্রতা যেন আমাদের না থাকে। পদমানের রাস্তা মুসলমানের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সুগম হওয়াই উচিত— সে রাস্তার শেষ গম্যস্থানে পৌঁছিতে তাহাদের কোনো বিলম্ব না হয় ইহাই যেন আমরা প্রসন্নমনে কামনা করি।"[২৬]

---

[২৫] সভাপতির অভিভাষণ, পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনী, ১৩১৪
প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮, পরিচয়, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে যে আসন সংরক্ষণ নিয়ে সাধারণ হিন্দুদের বিদ্বেষের অবধি ছিল না, সেই চাকুরী ও পদমানের বেলায় মুসলমানদের যেন অধিকতর সুযোগ দেওয়া হয়—যাতে তাড়াতাড়ি মুসলমানেরা হিন্দুদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে—এইটেই রবীন্দ্রনাথ প্রসন্নমনে কামনা করেছিলেন। এটা যে মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর সদিচ্ছার মনোভাবই সূচিত করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রাজনৈতিক সম্পর্ক

এবারে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বিষয়ে আসা যাক। অবশ্য সমাজনীতি আর রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা নয়; তাই সমাজনীতি আলোচনা প্রসঙ্গেও রাজনীতির কিছু কিছু আলোচনা আমাদের করতে হয়েছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত আমি আলাদা করে তুলে ধরতে চাই।

তখন বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হয়ে পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলা ও আসাম এই দুটি প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছে। এতে মুসলমানদের সায় ছিল তা বলাই বাহুল্য। ঢাকায় নবগঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী বসেছে। সে ১৯০৫ সালের কথা। ১৯০৬ সালে ঢাকাতেই মুসলিম লীগের উদ্বোধন হল। হিন্দুসমাজে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হল বঙ্গভঙ্গকে প্রতিরোধ করবার জন্যে। অবশেষে তাঁদের আন্দোলন জয়যুক্তও হল। ১৯১২ সালে দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ আবার যুক্ত হবে। এমনি করেই গড়ে ওঠে হিন্দু সমাজের স্বদেশী আন্দোলন। এই আন্দোলনে একদা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন; পরে তিনি বিরক্ত হয়ে আন্দোলনের সংশ্রব বর্জন করেন।

১৩১১ জ্যৈষ্ঠ (১৯০৪) সংখ্যা বঙ্গ-দর্শনে 'বঙ্গ-বিভাগ' নামক সম্পাদকীয় মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আন্তরিক ঐক্য উদ্বেল হইয়া উঠিবে—তখনই আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপার্শ্বে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাহার প্রসারিত ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন। এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে।"[২৭]

বঙ্গ-দর্শন, জ্যৈষ্ঠ [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কবির এই বিশ্বাস টলে গেছে। উক্ত পত্রিকাতেই ঠিক চার বছর পরে (তখনও 'বঙ্গভঙ্গ' রহিত হয়নি) রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"চক্ষু বুজিয়া এ-কথা বলিলে ধর্ম শুনিবে না যে, আমাদের আর সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে এখন কেবল ইংরেজকে বাদ দিতে পারিলেই বাঙালীতে পাঞ্জাবীতে মারাঠিতে মাদ্রাজিতে হিন্দুতে মুসলমানে মিলিয়া একমনে একপ্রাণে এক স্বার্থে স্বাধীন হইয়া উঠিবে।

বস্তুত আজ ভারতবর্ষে যেটুকু ঐক্য দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভকে আসন্ন জ্ঞান করিতেছি তাহা যান্ত্রিক, তাহা জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্ন জাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবধর্ম বশতঃ ঘটে নাই—পরজাতির এক শাসনই আমাদিগকে বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।"[২৮]

বস্তুতঃ এর প্রায় এক বৎসর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের একটি লেখায় দেখা যায়, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে যে একটি সত্যিকার ঐক্য জন্মেনি, বরং অনেক ছলনা ও পাপ লুকিয়ে আছে এদের এই সম্পর্কের ভেতর, এ কথাই কবি উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন—

"আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যিই হয় তবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন। দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না, ইংরেজকে আমরা এতবড় নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে।

"মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই—আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে—অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্কার দিতে হইবে।

"হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই।

"অভ্যস্ত পাপের সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য থাকে না। এই জন্যে সেই শয়তান যখন উগ্রমূর্তি ধরিয়া উঠে তখন সেটাকে মঙ্গল বলিয়াই জানিতে হইবে। হিন্দু-

---

বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩ ... থেকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুসলমানের মাঝখানটাতে যে কতোবড়ো একটা কলুষ আছে এবার তাহা যদি এমন বীভৎস আকারে দেখা না দিত, তবে ইহাকে আমরা স্বীকারই করিতাম না, ইহার পরিচয়ই পাইতাম না।...

"আর মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়, আমরা বিরুদ্ধ।

"আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক ক্ষেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ দুঃখে মানুষ—তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এই পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।

"আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাসে হিন্দু-মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।

"তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয়, তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ—স্বজাতি—স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতি রক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরকাল অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে।"[২৯]

হিন্দু সমাজের কোনো লেখক তো দূরের কথা, কোনো তৃতীয় পক্ষভুক্ত লেখকও এমন করে লিখতে পারতেন না। এ যে মুসলমান সমাজের অন্তরের চাপা বিক্ষোভ, যে কথা এখন সে নিজেও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি, তার সেই অবচেতন মনের কথা। রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় কবি-মন তাঁর [illegible]ভাবশীল সর্ববিস্তারী

প্রবাসী, শ্রাবণ, [illegible] তকার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সহানুভূতি দ্বারা তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং যা তিনি অনুভব করেছিলেন, তা অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করেও গেছেন। আগেই বলেছি তখন পর্যন্ত মুসলমান রাজনীতিকগণ হিন্দু-মুসলিম মিলনের আশাতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন; সত্যি বলতে কী মুসলমানদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার মতো কোনো চিন্তানায়কেরও উদ্ভব এ-সমাজে তখনও হয়নি। মুসলমানরা তখন সবেমাত্র সুপ্তি-ভঙ্গের পর জাগতে শুরু করেছে। ১৯০৬ সনে ঢাকায় মুসলিম লীগের পত্তন, তারই সূচনা।

মুসলমান সমাজ রাজনৈতিক, সামাজিক সব দিক থেকেই হিন্দু সমাজ কর্তৃক উপেক্ষিত, অবহেলিত এমনকি লাঞ্ছিত ছিল এই অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই, হিন্দু-সমাজ যখন আন্দোলনের দিনে প্রয়োজনের তাগিদে তাদের হাত মেলাবার আহ্বান জানিয়েছিল, তখন মুসলমান সমাজ যথার্থভাবে তাদের আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। এই সত্য কথাটা রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, একবার নয় বহুবার; এবং সেইদিনে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই তা বলেছিলেন এবং বলা বাহুল্য সেজন্যে বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ স্বদেশী নেতৃবৃন্দের যথেষ্ট অপ্রিয় হয়েছিলেন।

হিন্দু সমাজ ও নেতৃবৃন্দ কর্তৃক মুসলমানদের অবহেলার দৃষ্টান্ত দিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনো দিন দেই নাই। অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামাখা আসিয়া দাঁড়াইলে যে অমনি কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয়, এমনতর ঘটে না; আমরা যে, দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোক জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরূক আমাদের ব্যবহারে এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।"[৩০]

এভাবে সর্বত্র মুসলমানদের দূরে ঠেলে রেখে কেবল বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই' বলে চেঁচালেই মুসলমানদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ ও সবল কাণ্ডজ্ঞানের দ্বারা তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং স্পষ্টভাষায় তা বলেও গেছেন—

প্রবাসী, শ্রাবণ, [illegible] সদুপা[illegible]

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যদি তাহার হিত করিতে যাই, তবে সেই উপদ্রব লোক সহ্য না করিলেই তাহার হিত হইবে।

অল্পদিন হইল এ সম্বন্ধে আমাদের একটা শিক্ষা হইয়া গেছে। যে কারণেই হউক যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া, ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম।

সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদগদ-কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম, সেটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল, কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদি বা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দেই না—সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া, আপন বলিয়া মানিতে না পারি, দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেটা কখনই সফল হইতে পারে না।"[৩১]

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র আরও বলেছেন—

"আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলেম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেননি, বিরুদ্ধ ছিল। জননায়কেরা কেউ কেউ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি, ওরা যোগ দেয়নি। কেন দেয়নি। তখন বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল, সে আশ্চর্য। কিন্তু এতবড় আবেগ শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল। মুসলমানকে স্পর্শ করল না। সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয়নি। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা সমাজের দোহাই দিয়ে গভীর করে রেখেছি। সেটাকে রক্ষা করেও লাফ দিয়ে সেটা পার হতে হবে, এমন আবদার চলে না।"[৩২]

হিন্দু সমাজের বিজাতীয়-সুলভ ব্যবহার মুসলমানদের শুধু পর করে তোলে নি; তাদের বিরুদ্ধ করে তুলেছিল। মুসলমানদের অন্যান্য নেতারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন বলে নিন্দা করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন প্রকৃত

সবুজপত্র, ভাদ্র, ১৩২১, লোকহিত, (কালান্তর)
প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৩, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হিন্দুরাই, তারাই সর্বদা ভেদনীতি অনুসরণ করে মুসলমানদের দূরে ঠেলে রেখেছে। হিন্দুদের বৈষম্যমূলক ব্যবহারই মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

তার ফল হয়েছে কী কবির ভাষাতেই শুনুন

"এক তক্তপোষে বসাতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেকদিন চলে এসেছে; অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে। জাজিমতোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিমপাতা আসনে অন্যে বসেছে। তারপর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, আমরা তোমার ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে। তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হয়ে রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়। বাধা ওই জাজিম-তোলা আসনে বহুদিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোটো নয়। ওখানে অকূল কালাপানি। বক্তৃতামঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই ওটা পার হওয়া যায় না।"[৩৩]

এমনি করে হিন্দুদের অনুদার ব্যবহারের জন্যই (রবীন্দ্রনাথের মতে) হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের সন্দেহ ও বিদ্বেষ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। কিছুদিন পরে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না; পরস্পরকে বিব্রত ও লাঞ্ছিত করাটাই উভয়ের আনন্দ ও উল্লাসের বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

"ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। আমরাও মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময়ে অতিরিক্ত জিদের সঙ্গে ঢাকে কাঠি দিলুম, অপর পক্ষও কোরবানীর উৎসাহ পূর্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুললে, সেটা আপন আপন ধর্মের দাবী মেটাবার খাতির নিয়ে নয়, পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধা নিয়ে।"[৩৪]

এই স্পর্ধার প্রতিযোগিতার ফল হয় দাঙ্গাহাঙ্গামা, শুধু কলিকাতায় বা ঢাকায় নয়, সমস্ত ভারত জুড়ে। এই দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রথমতঃ ঘুষোঘুষি লাঠালাঠিতে পর্যবসিত হত; পরে আরম্ভ হল মাথা ফাটাফাটি; শেষ পর্যন্ত এই সর্বনাশী প্রতিযোগিতা যে কী পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল, তা এত শীঘ্র কারও ভুলে যাবার কথা নয়।

প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৩,

৩৪ প্রবাসী, শ্রাবণ, হিন্দু-মুসলমান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান ও ভারত-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বক্ষণে ও অন্তর্বর্তী কালে পরস্পরের হানাহানি ও রক্তারক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের যে গ্লানিকর ইতিহাস রচিত হয়েছিল, কবি তখনই যেন তা দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন, আরও দেখতে পেয়েছিলেন সেদিন এদেশের বুকে বসে বিদেশী শাসক আমাদের উভয়ের এই তাণ্ডবলীলা দেখে কি ভীষণ অট্টহাস্য করেছিল

"ধরে নেওয়া গেল গোল-বৈঠকের পর দেশের শাসনভার আমরাই পাব। কিন্তু দেশটাকে হাত ফেরাফেরি করবার মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ সন্ধিক্ষণ আছে সিভিল সার্ভিসের মেয়াদ কিছুকাল টিকে থাকতে বাধ্য। কিন্তু সেই দিনকার সিভিল সার্ভিস হবে ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো। মন তার গরম হয়ে থাকবার কথা। সেই সময়টুকুর মধ্যে দেশের লোক এবং বিদেশের লোকের কাছে কথাটা দেগে দেওয়া তার কাছে দরকার হবে যে, ব্রিটিশ রাজের পাহারা আলগা হবা মাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারিদিকেই ফণা তুলে আছে, তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্বভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের আপন লোকদেরকে দিয়েও একথা কবুল করিয়ে নেবার ইচ্ছা তার স্বভাবতই হবে যে, আগের আমলে অবস্থা ছিলো ভালো। সেই যুগান্তরের সময় যে যে-গুহায় আমাদের আত্মীয়-বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে, সেইখানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।"[৩৫]

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই যে দুর্লঙ্ঘ্য বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়েছিল, এর একমাত্র পরিণতি কী হতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার দৃষ্টি দ্বারা তা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল (যার কারণ পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে)—তার একমাত্র যুক্তিসংগত এবং স্বাভাবিক মীমাংসা ও ফয়সালা (conclusion)—পরস্পরের 'স্বাতন্ত্র্যে'। তিনি বলেছেন মুসলমানদের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের বিকাশের চেষ্টাই হবে স্বাভাবিক ও 'সংগত' এবং উভয় সম্প্রদায়ের দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধের স্থায়ী মীমাংসা রূপে এই পন্থাই বাঞ্ছনীয় বলে নির্দেশ করে গেছেন

"আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখন প্রবল হইল, অর্থাৎ যখনই নিজেদের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেতনার উদ্রেক হইল তখনই আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সঙ্গে এক করিয়া

---

[৩৫] প্রবাসী. শ্রাবণ, ১[illegible] হি[illegible]মুসলমান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজন সাধনের আগ্রহবশতঃ সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি, তবে সে-ও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।

"হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাদিগকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি—আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি, তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই, তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। যেখানে দুই পক্ষের মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে সেখানে যদি তাহারা শরিক হয়, তবে কেবল ততদিন পর্যন্ত তাহাদের বন্ধন থাকে যতদিন বাহিরের কোন বাধা অতিক্রমের জন্য তাহাদের একত্র আবশ্যক হয়,—সে আবশ্যকটা অতীত হইলেই ভাগ বাঁটোয়ারার বেলায় উভয় পক্ষেই ফাঁকি চলিতে থাকে।

মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অঙ্ক বেশী হইবে বটে, কিন্তু লাভের অঙ্ক তাহার পক্ষে বেশী হইবে কিনা, মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের একথা বলা অসংগত নহে যে, আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড়ো হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।...

একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুশী হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল, সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানিত্ব মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমান রূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।

আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক; একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়।

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াও মিলন হইবে, সে কাজটা কঠিন—কারণ সেখানে কোন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে, কিন্তু যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে; পরিমাণের দিকে চাহিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ!...

মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে, এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।"[৩৬]

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯১১ইং সনে। তখন মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের কথা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের কথা মুসলমানরাই ভাবতে পারেনি। কবি কিন্তু তাঁর দূরদৃষ্টির দ্বারা ঠিকই বুঝতে পেয়েছিলেন, কী হতে যাচ্ছে এবং কী হওয়াটা বাঞ্ছনীয়।

এর ঠিক ৩১ বৎসর পরে যখন ক্রীপস্ মিশন এদেশের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার মীমাংসা বা 'ভাগ্য-নির্ধারণে'র জন্য ভারতে আসেন, তখন, ১৯৪২ইং সনের ১১ই এপ্রিল তারিখে তৎকালীন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি নয়াদিল্লীতে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন

"The Musalmans, after 25 years of genuine efforts for re-conciliation of the two major communities and the bitter experience of the failure of such efforts, are convinced that it is neither just nor possible in the interest of peace, happiness of the two peoples to compel them to constitute one Indian Union, composed of the two principal nations,—Hindus and Moslems which appears to be the main object of His Majesty's Government, as adumbrated in the preamble of the draft declaration...

...So far as the Moslem League is concerned it has finally decided that the only solution of India's constitutional problem is the partition of India into independent zones... With conditions as they are it will be not only futile but on the contrary may exacerbate bitterness and animosity amongst the various elements in the country...

অর্থাৎ—

"পঁচিশ বছর ধরে দু'টি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন স্থাপন করবার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টার পর এবং এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে, মুসলমানরা

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৮, হিন্দু-মুসলমান (পরিচয়)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে, ব্রিটিশ সরকারের খসড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী এই দু'টি প্রধান জাতিকে এক অখণ্ড ভারত রাষ্ট্র গঠন করতে বাধ্য করা তাদের পারস্পরিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল নহে।—মুসলিম লীগের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতকে বিভক্ত করে স্বতন্ত্র অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করাই ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।—পরিকল্পনায় যে সমস্ত শর্ত রয়েছে, সেগুলি একদিকে যেমন ব্যর্থ হতে বাধ্য, তেমনি অপর দিকে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে তিক্ততা ও বিদ্বেষ সৃষ্টিতেও সহায়তা করতে পারে।"

প্রায় এই কথাগুলিই কি বলেন নি রবীন্দ্রনাথ এর ৩১ বছর আগে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রপ্রবন্ধ মুসলমান ও হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক

হুমায়ুন আজাদ

এ-উপমহাদেশের একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, শত শত বছরের সহঅবস্থানও এ-দেশের দু'টি প্রধান অধিবাসী, হিন্দু এবং মুসলমানকে মিলিত করতে পারে নি। তারা কাছাকাছি বসবাস করেছে, অভিন্ন আলোবাতাস খাদ্য সংগ্রহ করেছে প্রাণ ধারণের গাঢ় প্রয়োজনে, তবু পরস্পরের সঙ্গে প্রগাঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে নি। বিভিন্ন বিরোধী বাতাস এসে তাদের পৃথক, দুর্বল করে গেছে। রবীন্দ্রনাথের বহুকথিত ভারততত্ত্বের সারবাণী হলো, বৈচিত্র্য এবং অনৈক্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এ-তত্ত্ব লাভ করেছেন তিনি ভারতের ইতিহাস পাঠ করে এবং স্রষ্টাকে বিশ্বাস করার মতোই তিনি এ-তত্ত্বে বিশ্বাসবান ছিলেন। কিন্তু হিন্দুমুসলমানের বৈরিতা তাঁর এ-তত্ত্বকে অনেকটা বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। মুসলমান সম্বন্ধে তাঁর সমগ্র চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে দুটি দিক লাভ করি।

ক. মুসলমান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা

খ. হিন্দুমুসলমান সমস্যা, তার কারণসমূহ এবং সমাধান

তাঁর চিন্তাধারার কালানুক্রমিক পরিচয় নেয়া যাক।

ক. মুসলমান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা

কালান্তর গ্রন্থের 'কালান্তর' প্রবন্ধে (১৩৪০, ১৯৩৩) তিনি ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের স্তরবদলের হিশেব নেন এবং এদেশের জীবনে ও ইতিহাসে মুসলমান বিজয়ের অভিঘাত বর্ণনা করেন। এটি তাঁর অতি পরিণত বয়সের রচনা, সেহেতু মূল্যবান। মুসলমানদের আগমনপূর্ব ভারতবর্ষ সীমাবদ্ধ ছিলো চণ্ডীমণ্ডপ, যাত্রাসংকীর্তন, রামায়ণ পাঠ এবং কবিগানের আসরে। বহির্বিশ্ব অচেতন এদেশে প্রথম আঘাত হানে মুসলমান। সেই মুসলমান অনাধুনিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> কিন্তু সে-মুসলমান প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্যসংগঠন করেছে, কিন্তু তার চিত্রের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এই জন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তাঁর সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল—কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর এক বাঁধা মতের। রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয় নি, তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে।[১]

প্রভাবটাও তিনি লক্ষ্য করলেন। তাঁর মত ; ভদ্রসমাজ ফার্সির চর্চা করলেও 'বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে' ফার্সির স্বাক্ষর পড়ে নি।[২] প্রভাব যে-টুকু পড়েছে, তা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে। বৈষ্ণব পদে কোনো প্রভাব পড়েনি, যদিও বাংলা ভাষায় ফার্সি শব্দ অকিঞ্চন নয়। তিনি বলেছেন মঙ্গলকাব্যে 'মুসলমান রাজ্য শাসনের বিবরণ আছে, কিন্তু তার বিষয়বস্তু কিংবা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখিনে।[৩] তিনি দুটি বন্ধ্যা সভ্যতার স্বরূপ তুলে ধরে দেখান, উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষে নতুন কোনো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় নি, যাতে পূর্বতন সীমা ভেঙ্গে যেতে পারে। তারা পরস্পরের পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে, কিন্তু পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে। তাই ভারতবর্ষীয় চণ্ডীমণ্ডপ ভেঙে গেলো না, পরিধি, বিস্তৃত হলো না।[৪] অর্থাৎ মুসলমান কালান্তর সাধন করতে পারে নি, এর কারণ উভয় সম্প্রদায়ের মানসিক শক্তির দুর্বল সমকক্ষতা। ইংরেজ এবং মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি ১৮৯৩ (১৩০০) সালে বলেছেন

> মুসলমান রাজা অত্যাচারী ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে সমকক্ষতার সাম্য ছিল। আমাদের দর্শন কাব্য আমাদের কলাবিদ্যা, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে রাজায়-প্রজায় আদানপ্রদান ছিল। সুতরাং মুসলমান আমাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত, কিন্তু অসম্মান করা তাহার সাধ্য ছিল না। মনে মনে আমাদের আত্মসম্মানের কোনো লাঘব ছিল না, কারণ বাহুবলের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই অভিভূত হইতে পারে না।[৫]

তাঁর কাম্য ছিলো রাজাপ্রজায় হৃদয়সম্মিলন, ইংরেজ আমলে তা ঘটে নি। অত্যাচার সত্ত্বেও মুসলমান আমলে তা অনেকটা সাধিত হয়েছিল। তাই, হিন্দুমুসলমানের মিলন নিমিত্তে আকবরের প্রচেষ্টা স্মরণ করে তিনি উচ্ছ্বসিত

> আকবর সকল ধর্মের বিরোধভঞ্জন করিয়া যে একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয়-মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।... তিনি কেবল রাজনীতির দ্বারায় নহে, প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন।[৬]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আকবরকে কেন্দ্র করে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে-মিলন লক্ষ্য করলেন ১৮৯৮ সালে চাপকানকে কেন্দ্র করে সে-মিলনই দেখলেন। 'কোট বা চাপকান' (১৩০৫) প্রবন্ধে হিন্দুমুসলমান মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে ঐক্য লক্ষ্য করলেন। দেখলেন, পোশাকপরিচ্ছদ শিল্পসাহিত্য প্রভৃতিতে উভয় সম্প্রদায়ের আদান প্রদান এতো ঘনিষ্ঠ যে সেখানে কার কতোখানি দান তা স্পষ্ট নির্ণয় দুঃসাধ্য। চাপকান বস্ত্রটি কার? তাঁর মত

> চাপকান হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বস্ত্র। উহা যে-সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সহায়তা করিয়াছে।[৭]

শুধু বস্ত্র নয়, সঙ্গীত এবং অন্যান্য শিল্পও উভয়ের মিলিত সৃষ্টি। এর কারণ উভয়ের পারস্পরিক আদানপ্রদান

> কারণ মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। তাহাদের শিল্পবিলাস ও নীতি পদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই; এবং মুসলমান যেমন বলের দ্বারা ভারতবর্ষকে আপনার করিয়া লইয়াছিল, ভারতবর্ষও তেমনই স্বভাবের অমোঘ নিয়মে কেবল আপন বিপুলতা আপন নিগূঢ় প্রাণশক্তি দ্বারা মুসলমানকে আপনার করিয়া লইয়াছিল।[৮]

উভয় সম্প্রদায়ের মিলনচিহ্ন রয়ে গেছে এদেশের চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্র, সূচিশিল্প, নৃত্যগীতে। তাঁর মনে হলো, ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমান একই অঙ্গের দুবাহু। এদের মিলনই দেশের শক্তি। তাই তিনি মনে করলেন

> এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটি জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনোমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না।[৯]

ভারতবর্ষীয় জাতি গঠনে তিনি মুসলমানকে ত্যাগ করতে পারেননি, বরং প্রবলভাবে কামনা করেছেন। কিন্তু ১৮৯৮ সালে মিলনের কোনো লক্ষণই দেখা যায়নি। এসম্মিলন কোন্-কোন্ দিকে ঘটবে তাও তিনি নির্দেশ করেছেন। বলেছেন, ধর্মে উভয়ে মিলবে না, মিলবে অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং উভয়ের পোশাক হবে অভিন্ন। তাঁর মত

> হিন্দু-মুসলমানে ধর্মে না-ও মিলিতে পারে, কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে,—আমাদের শিক্ষা, আমাদের চেষ্টা, আমাদের মহৎ স্বার্থ সেইদিকেই অনবরত কাজ করিতেছে। অতএব যে-বেশ আমাদের জাতীয় বেশ হইবে তাহা হিন্দু-মুসলমানের বেশ।[১০]

অমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯১২ সালে 'আত্মপরিচয়' (১৩১৯) প্রবন্ধে তিনি একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। তাঁর মতে, মানব প্রকৃতিতে দু'টি অংশ বিদ্যমান—একটি অতীতের চিরন্তন চিরপ্রবহমান ধারা, অপরটি ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা।[১১] এই তত্ত্বালোকে দেখলেন, ব্রাহ্মদের ব্রাহ্ম পরিচয়টি নবপরিচয়, চিরকালীন পরিচিতিতে তাঁরা হিন্দু। বললেন

> অতএব, আমি হিন্দু একথা বলিলে যদি নিতান্তই কোন লজ্জার কারণ থাকে তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে।[১২]

তিনি অবশ্য তাঁর সমসাময়িক হিন্দুধর্মের লক্ষণগুলোকে হিন্দুসমাজের 'নিত্য লক্ষণ' বলে মানেননি। ব্রাহ্মসমাজ, তাঁর কাছে, হিন্দুসমাজের ইতিহাসেরই একটি অঙ্গ, তা হিন্দুসমাজবিরোধী নয়, বরং তার পরিণতি।[১৩] 'হিন্দু' বলতে বোঝেন তিনি একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থা, 'ব্রাহ্ম' বলতে একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্ম। তাঁর এ-চিন্তার উন্মেষ ঘটে ১৮৯০ সালের দিকে। ১৮৯১ সালের আদমশুমারীতে ব্রাহ্মরা পৃথকভাবে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত এবং গণিত হবার দাবি জানায়। রবীন্দ্রনাথ, আদি ব্রাহ্ম সমাজের তদানীন্তন সম্পাদক, সেন্সাস প্রধানকে আদিব্রাহ্ম সমাজভুক্তদের 'হিন্দুব্রাহ্ম' বলে চিহ্নিত করার জন্যে অনুরোধ করেন, ব্রাহ্মদের উদ্দেশে তাঁর এমত পত্রিকায় বিজ্ঞাপিতও করেন। ১৩১৯ সালে তাঁর এমত প্রাবল্য লাভ করলো

> তবে কি মুসলমান অথবা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পার।[১৪]

এ-জাতি ও ধর্মে পার্থক্যনির্দেশক সূত্রাবলম্বন করে মুসলমানদের সম্বন্ধে বললেন

> বাংলা দেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রীস্টান, এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ—কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে তাহা সত্যের বাধা—তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি—এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত, অসংগত, তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধে।[১৫]

এই মন্তব্যের কাল ১৯১২, বিশ্ববিজয়ার্থে ভ্রমণ তখনও তাঁর শুরু হয় নি। 'হিন্দুসমাজ' বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে তপোবন এবং ভারততীর্থের আদর্শে উদ্দীপ্ত, অনুপ্রাণিত। তাই 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' শব্দদ্বয়ের ব্যঞ্জিত অর্থের পার্থক্য নির্দেশ করলেন নিম্নরূপে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

> হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।[১৬]

তিনি তাঁর মতসহায়ক উদাহরণের সাহায্য নিয়েছেন। দেখিয়েছেন, চীন, পারস্য, আফ্রিকা, বাংলাদেশে মুসলমান বসবাস করছে। তাদের মধ্যে মিল কেবল ধর্মমতে, জীবনধারণ পদ্ধতিতে নয়। অর্থাৎ দেশেদেশে ধর্মমত অভিন্ন হতে পারে, কিন্তু জীবনধারণ পদ্ধতি বিভিন্ন, আর এজীবনধারণ পদ্ধতির উপর ধর্মের প্রভাব খুবই কম।[১৭]

খ. হিন্দুমুসলমান সমস্যা, তার কারণসমূহ এবং সমাধান

হিন্দুমুসলমান সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল চিন্তা করেছেন। এচিন্তা অত্যন্ত গভীর, আন্তরিক, সদিচ্ছায় পরিপূর্ণ। তিনি প্রখর দৃষ্টিতে উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যের দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাদের মিলন না হবার কারণসমূহ তীক্ষ্ণ চোখে অবলোকন করেছেন এবং সমস্যাটির সমাধান সম্পর্কেও তাঁর সৎ মন্তব্য ছিলো। তাঁর মতাবলীর কালানুক্রমিক পরিচয় নেয়া যাক।

১৮৯৩ সালে লক্ষ্য করলেন, হিন্দুমুসলমান বিরোধ ক্রমবর্ধমান। এ বিরোধের মূলে দেখলেন সরকারের নিষ্প্রেম নীতি বিরোধ বাড়িয়ে তুলছে। এটি উভয় সম্প্রদায়ের অতিসচেতন বিরোধের উন্মেষকাল। তিনি দায়ী করলেন সরকারকে

> ভারতবর্ষে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশী করিয়া বপন করিয়াছে।[১৮]

'সুবিচারের অধিকার' (১৩০১, ১৮৯৪) প্রবন্ধে বিরোধের চাষ যে সরকারই করে যাচ্ছে, একথা স্পষ্ট বললেন। সরকারী 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' নীতিকে দায়ী করলেন

> অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেন্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কংগ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানগণ ক্রমশঃ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান এবং মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুর দর্পচূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট এবং হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।[১৯]

তাঁর মনে হলো, সরকার যেন অনেকটা মুসলমানের পক্ষাবলম্বী।[২০]

'ইংরেজের আতঙ্ক' (১৩০০) প্রবন্ধে লক্ষ্য করলেন, সরকার কংগ্রেসকে আঘাত করছেন না, তবে চেষ্টা করছেন যাতে মুসলমান কংগ্রেসে যোগ না দেয়।[২১] উভয়ের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঐক্যই সরকারের আতঙ্ক। রাজনীতি এবং ঐক্যক্ষেত্রে মুসলমানের অধিকার আছে বলে তাঁর মনে হলো

> আবহমানকালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পোলিটিক্যাল ঐক্যের কোন লক্ষণ কোনোকালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্সও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে; মুসলমান যদি দূরে থাকে কন্‌গ্রেস হইতে আশু আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।[২২]

এ-পর্যন্ত তিনি বিরোধের জন্য দায়ী করেছেন সরকারকে। ১৯০৭ সালে তাঁর মতবদল ঘটলো। বিরোধের কারণ, সরকার নয়, আবিষ্কার করলেন নিজেদের মধ্যে। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (১৩১৪) প্রবন্ধে বোঝালেন ইংরেজ যদি মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, তবে ইংরেজের ওপর রাগ করে ফল হবে না। ইংরেজ শত্রু, সে তার সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করবে। তাই তিনি মূল কারণ অনুসন্ধানে মনোযোগ দিলেন

> মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নহে। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব, শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে, শত্রু সেখানে জোর করবেই—আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে—অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্কার দিতে হইবে।[২৩]

তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো পাপের মূলবিন্দুতে। হিন্দুমুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে ত্রুটি বিদ্যমান, তিনি একে নৈতিক দিক দিয়ে দেখে বললেন 'পাপ' আর এপাপ অনেক দিনের। তখন বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হয়েছে, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান আন্দোলনে যোগ দেয়নি। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের যথার্থ সম্পর্কটি তুলে ধরলেন

> আর মিথ্যা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।[২৪]

এবিরুদ্ধতার জন্যেই তারা শত শত বছর ধরে অশান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান করেছে। উভয়ের মধ্যে সামাজিক বন্ধুত্ব গড়ে উঠেনি। এসম্পর্কবিপর্যয়ের জন্যে তিনি দায়ী করলেন হিন্দুকে এবং নিজে সাক্ষ্য দিলেন

> আমরা জানি, বাংলা দেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমান বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।[২৫]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হিন্দু এসব কাজের দোষক্ষলনার্থে দোহাই দেয় শাস্ত্রের। তিনি দৃঢ়মত পোষণ করলেন যে, এমন শাস্ত্র নিয়ে কোনো দিন স্বদেশ স্বজাতি স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হবে না।[২৬] পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর 'সভাপতির অভিভাষণ'-এ (১৩১৪, ১৯০৭) তিনি উভয়ের বিরোধের কারণগুলো বস্তুগত দৃষ্টিতে দেখলেন এবং সমাধান দানের চেষ্টা করলেন। দেখালেন হিন্দুমুসলমানের অন্য নানাবিধ পার্থক্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত অসাম্যজাত পার্থক্য। হিন্দু লেখাপড়া শিখেছে আগে থেকেই, সরকারী চাকুরী পেয়েছে, ফলত, পার্থক্য জন্মেছে। তিনি মনে করলেন, এ-পার্থক্য দূরীভূত না হলে মনের মিল হবে না।[২৭] তিনি অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত এবং অন্যান্য পার্থক্যের আশু বিলোপ কামনা করলেন

> মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত, জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তা ঘুচিয়ে গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি।[২৮]

ভারতবর্ষের সমস্যা বিপুল। এতো ভাষা, জাতি-আচার অন্যত্র কোথাও নেই, অথচ তিনি এদের নিয়ে একটি মহাজাতি গঠনের দরকার বোধ করেন। এ মহাজাতি গঠনে হিন্দুমুসলমানের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোনো মিলনলক্ষণই এদের মধ্যে দেখলেন না, বরং বঙ্গভঙ্গের সময়ে দেখলেন

> হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।[২৯]

মুসলমান বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে হিন্দুর সাথে যোগ দেয়নি, তার জন্যে তিনি সরকারকে নয়, দায়ী করলেন নিজেদের। নিজেদের অন্তর্গত পাপরাশির অশুভ ক্রিয়ার কথা পুনরায় বললেন। তাঁর মনে হলো, সরকার যদি মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগিয়েই থাকে, তবে সে বরং একটি বাস্তব সত্য সম্পর্কে দেশবাসীকে সজাগ করে উপকার করেছে।[৩০] 'সদুপায়' (১৩১৫, ১৯০৮) প্রবন্ধে লক্ষ্য করেন, পূর্ববঙ্গ মুসলমানগরিষ্ঠ দেশ, আর তাদের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান। ভাষা, সাহিত্য এবং অন্য কতিপয় ক্ষেত্রে হিন্দুর সঙ্গে তাদের বন্ধনও রয়েছে। তিনি বোধ করলেন, বঙ্গভঙ্গ এবন্ধনকে শিথিল করবে। এর কারণ উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য

> ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ, বাঙালি হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি, তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই; দুই পক্ষে এক রকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।[৩১]

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ-মিলন যান্ত্রিক, স্বাভাবিক নয়। বঙ্গভঙ্গ এ-মিলনকেও উচ্ছেদ করবে। বিচ্ছেদ এড়ানোর জন্যে তিনি নিজেদের মিলনপ্রচেষ্টা দরকার বলে বোধ করলেন। কিন্তু রাজনীতিবিদগণ আশ্রয় নিলেন বয়কটের, বিলাতি লবণ ও বস্ত্র বহিষ্কারকেই তাঁরা সমস্যা সমাধানের উপায় জ্ঞান করলেন। হিন্দুরা মুসলমানদেরও আন্দোলনে অংশ নেবার আহ্বান জানালো। তাঁর মতে, এ আহ্বান গরজের, হৃদয়ের নয়, তাই মুসলমান সাড়া দেয়নি। তিনি মুসলমানদের সাড়া না দেয়ার কারণ এবং আন্দোলকদের ত্রুটি তুলে ধরলেন

> ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি-সম্প্রদায়ের চিত্ত-আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। একথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী, তাহার কোনো প্রমাণ কোনো দিন দিই নাই; অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষীতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতিস্বীকার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া একজন খামাখা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে অমনি তখনই কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতরো ঘটে না।[৩২]

এ-প্রবন্ধেও তিনি স্বীকার করেন, মুসলমানদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দু কদাচ ভালো ব্যবহার করে নি, এবং সামাজিক ব্যবহারে হিন্দু নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের পশুর অধিক ঘৃণা করে।[৩৩] 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' (১৯১১) প্রবন্ধেও মুসলমানের প্রতি হিন্দুর আহ্বানের কারণ ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন। দেখালেন, তাদের আহ্বান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্তে। দেশে যখন রাজনৈতিক ঐক্যলাভের প্রয়োজন দেখা দিলো, তখনই হিন্দু আহ্বান করলো মুসলানকে।[৩৪] এডাক প্রয়োজনের, ভালোবাসার নয়। তাই আহ্বান সাড়া পায় নি। তিনি হিন্দুমুসলমানদের মধ্যবর্তী একটি 'সত্য পার্থক্য' স্বীকার করে হিন্দুর আহ্বানের অন্তঃসারশূন্যতা উদ্‌ঘাটন করলেন

> হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।[৩৫]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তিনি দেখতে চাইলেন, উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যানুভূতি কোন সময় থেকে তীব্রতা লাভ করলো। দেখলেন, হিন্দু যখন 'হিন্দুত্ব' নিয়ে গৌরব গান শুরু করলো, মুসলমানের মুসলমানিত্বও তখনি মাথাচাড়া দিলো। এর ফলাফল

> এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।[৩৬]

মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যলাভের প্রয়াসকে তিনি অভিনন্দিত করলেন এবং এ প্রয়াসের মধ্যে উভয়ের মিলনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করলেন।[৩৭] ১৯০৭ সালে তিনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি কামনা করেছেন, ১৯১১ সালে 'পদমানের রাস্তা'য় তাদের দ্রুতগতি কামনা করলেন।[৩৮] এসময়ে মুসলমানেরা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় দাবি করে। এর মধ্যে তিনি প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষ্য করলেন, তাকে 'সত্য ও স্থায়ী' পদার্থ ভাবলেন না, এর মধ্যে যা সত্য পদার্থ আবিষ্কার করলেন, তা মুসলমানের আত্মোপলব্ধি;

> ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।[৩৯]

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে মুসলমান যোগ দেয়নি রাজনৈতিক কারণে। তিনি এ রাজনৈতিক কারণ স্বীকার করেও অনৈক্যের সামাজিক কারণ লক্ষ্য করে এসেছেন। যাদের সামাজিক ঐক্য নেই, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি দুঃসাধ্য। কেবল আবেদন যথেষ্ট নয়। পূর্বের মতো, 'লোকহিত' (১৩২১, ১৯১৪) প্রবন্ধে মুসলমানের প্রতি হিন্দুর আহ্বানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেন

> একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল, কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই; যদি-বা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দেই না—সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া, আপন বলিয়া মানতে না পারি দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্য-ভঙ্গী করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।[৪০]

তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক সহৃদয় সম্পর্ক। কিন্তু লক্ষ্য করলেন, স্বদেশী প্রচারকও মুসলমান সহকর্মীর সঙ্গে এক দাওয়ায় দাঁড়িয়ে জল খায় না।[৪১] তাঁর মতে, অফিস, বিদ্যালয় ইত্যাদিতে মুসলমান পশ্চাৎপদ, সেখানে ঠেলাঠেলি গায়ে লাগে, 'কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে।'[৪২] এসমস্ত কারণে মুসলমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আন্দোলনে যোগ দেয়নি। এজন্যে তিনি দোষী করলেন নিজেদের, হিন্দুদের।[৪৩] ১৯১৭ সালের ২০ আগস্টে বিলাতের পার্লামেন্টের সামনে ভারতসচিব মন্টেগু ভারতের ভাবী শাসনের আভাস দেন। তিনি বলেন, ভারতীয়দের হাতে শাসনভার দেয়া হবে by successive stages.[৪৪] সেপ্টেম্বর মাসে (১৯১৭) বিহারে হিন্দুরা গরু কোরবানি উপলক্ষে মুসলমানদের উপরে জুলুম করে। ২৮ সেপ্টেম্বরে শাহাবাদ জেলায় দাঙ্গা শুরু হয়, ২ অক্টোবরের মধ্যে জেলার সর্বত্র দাঙ্গা বিস্তৃত হয়। ৯ অক্টোবর গয়া জেলার ত্রিশটি গ্রাম লুণ্ঠিত হয়। তাতে প্রায় ১০০০ লোক ধরা পড়ে এবং শাস্তি পায়।[৪৫] এ দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত 'ছোটো ও বড়ো' (১৩২৪, ১৯১৭) প্রবন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের মূলে দেখলেন দু'টি বস্তু—ধর্ম ও সরকার। মত দিলেন যে, এদেশের ধর্ম আচারসর্বস্ব অসহনশীল, নিজের আচার অপরের উপর আরোপ করতে যেয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে। হিন্দুকে দোষী করলেন

> নিজে ধর্মের নামে পশু হত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না।[৪৬]

ধর্ম যতোদিন আচারসর্বস্ব থাকবে ততোদিন মিল হওয়া তাঁর কাছে অসম্ভব বোধ হলো। মিলনের উপায় হিসেবে নির্দেশ করলেন 'দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল'কে।[৪৭] দেশবাসীর যৌথ দায়িত্বহীনতাও মিলনের প্রতিবন্ধক বলে তাঁর বোধ হলো।[৪৮]

১৯১৭ থেকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমুসলমানের বিভেদের জন্যে একটি বস্তুকেই প্রধানত দায়ী করতে থাকলেন, সেটি ধর্ম। এদের বিভেদের মূলে ধর্মের প্রভাব কতোখানি, কোন ধর্ম এর জন্যে কতোটা দায়ী, ধর্মের ছোবল এড়িয়ে তারা কোনোদিন মিলিত হতে পারবে কিনা—১৯১৭ থেকে মৃত্যু অবধি তিনি এ-বিষয়ে বারংবার চিন্তা করেছেন। ১৩২৯ সালে (১৯২২) কালিদাস নাগের কাছে লিখিত পত্রে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হলো, *কালান্তর* গ্রন্থে পত্রটি 'হিন্দু-মুসলমান' নামে মুদ্রিত। প্রবন্ধে দুটি ধর্মের স্বপ্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করে দেখলেন, এদের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা অত্যল্প। এ-বিশ্লেষণে খ্রিস্টধর্মকে এনে দেখালেন পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় বিদ্যমান, যাদের সঙ্গে অন্য ধর্মমতের বিরোধ অত্যুগ্র। এ-ধর্মদ্বয়—'খ্রীস্টান আর মুসলমান-ধর্ম।' এরা স্বধর্ম পালন করেই তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে প্রতিহত করতেও এরা উদ্যত। তাই এদের সঙ্গে মেলার উপায় ওই ধর্মাবলম্বন। হিন্দু ধর্মও তেমনি, তবে পার্থক্য এখানে যে, অন্য ধর্মের সঙ্গে তাদের বিরোধ সকর্মক নয়, অনেকটা অসহযোগিতামূলক। এ-ধর্মের বড়ো ত্রুটি এর আচারসর্বস্বতা।[৪৯] তাই, তাঁর মতে 'মুসলমান-ধর্ম' গ্রহণ করে মুসলমানের সঙ্গে সহজে মেলা যায়, কিন্তু হিন্দু ধর্ম গ্রহণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে হিন্দুর সঙ্গে সহজে মেলা যায় না। কেননা, আহারে বিহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু ধর্ম সারাক্ষণ নিষেধ করে। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, খিলাফত আন্দোলনের সময় মুসলমান হিন্দুকে মসজিদ বা অন্যত্র যতোখানি টেনেছে, হিন্দু ততোখানি টানতে পারে নি। তিনি নিজের কাছারিতেই দেখেছেন, মুসলমান প্রজাদের বসতে দেয়া হয় জাজিমের এক প্রান্ত তুলে।[৫০] তিনি এদের মিলন সম্পর্কে যেন অনেকটা হতাশ

> ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে; ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কি করে মিলবে।[৫১]

বললেন, 'হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ', এর প্রকৃতি হলো নিষেধ ও প্রত্যাখ্যান করা।[৫২] রবীন্দ্রনাথের মতোই কাজী আবদুল ওদুদ মুসলমানদের সম্বন্ধে বলেছেন

> আচারে হিন্দু অনুদার হলেও অপরের ধর্মের প্রতি সে চিরদিন শ্রদ্ধাবান; কিন্তু আচারে যথেষ্ট উদার হয়েও ধর্মমতে মুসলমান অনেক বেশি গোঁড়া। বিধর্মীয় ভাষা, আচার, এসব সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাইরে।[৫৩]

রবীন্দ্রনাথের কাছে এদের মিলন, তাঁর সমকালে, অসম্ভব বোধ হয়েছে। তিনি সমস্যা সমাধানের জন্যে দরকারবোধ করলেন 'মনের পরিবর্তন, যুগের পরিবর্তন', 'সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তি'র এবং ইউরোপের মতো উভয়ের মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে আগমন।[৫৪] এ সকলের জন্যে প্রয়োজনবোধ করলেন শিক্ষার, সমস্যা সমাধানের জন্যে দরকারবোধ করলেন কালান্তরের

> হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই; কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব; যদি না আসি তবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।[৫৫]

এদের মিলন সম্পর্কে ১৩২৯ সালের মত পুনরুত্থান করলেন ১৩৩০-এ (১৯২৩)। 'সমস্যা' (১৩৩০) প্রবন্ধে দেখালেন এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর উভয় সম্প্রদায়কে মিলিত করার প্রয়াসের ভিত্তিই অবাস্তব। এর প্রমাণ খিলাফত আন্দোলন, ওই মিলনের পরেও উভয়ের মধ্যে বিরোধ বেধেছে। এ বিরোধের জন্যে রাজনীতিবিদেরা দোষী করেন সরকারকে, আর তিনি [দায়ী] করেন আত্মমধ্যস্থ 'পাপ'কে।[৫৬] ধর্মই দায়ী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> ধর্ম যাদের পৃথক করে তাদের মেলবার দরজায় ভিতর দিক থেকে আগল দেওয়া।[৫৭]

তিনি দেখলেন, উভয় সম্প্রদায় ধর্মরজ্জুতে বাঁধা, মানুষের সঙ্গে মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক যোগের দিকে তাদের দৃষ্টি নেই।[৫৮] এ-ধর্ম যতোখানি আচারচালিত, ততোখানি শাস্ত্রনির্ভর নয়। উভয়ের বিরোধিতার চিত্র উন্মোচন করলেন

> আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে।[৫৯]

তিনি লক্ষ্য করলেন, তাদের মিল হয় একমাত্র 'তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে'। দেখালেন, এ মিলন অসত্য, এ জন্যেই বঙ্গভঙ্গের সময়ে মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে মেলেনি, কেননা বঙ্গভঙ্গ তাদের দুঃখ ছিলো না। কিন্তু 'অসহকারআন্দোলনে' সে হিন্দুর সঙ্গে মিলেছে, কেননা রুম সাম্রাজ্যের দুঃখ মুসলমানের কাছে বাস্তব। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বলেই এ মিলন অস্থায়ী।[৬০] কিন্তু এদের মিলন তার নানা কারণে কাম্য। বললেন

> ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তাহলে হিন্দুমুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয়পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।[৬১]

১৩৩২ সালে (১৯২৫) 'স্বরাজসাধন' প্রবন্ধেও উভয়ের মিলনের বাধা হিসেবে দেখলেন উভয়ের চিরাগত মানসিক সংস্কারকে।[৬২] এ-সংস্কারবশতই তারা স্বরাজলাভের লোভের মধ্যেও ভুলতে পারে না যে তারা পরস্পরের কাছে কাফের বা ম্লেচ্ছ। খিলাফত আন্দোলনও তাদের মানসিক কুসংস্কার নিষ্কাশিত করতে পারেনি। কিন্তু ভারতের উন্নতির জন্যে তিনি উভয়ের সম্মিলনকে জরুরী ভেবেছেন

> ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়োই ভুল করবো।[৬৩]

তিনি মত দিলেন, সামাজিক ভেদ পেরিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য অসম্ভব।[৬৪] এ-মিলনসূত্র আবিষ্কারার্থে তিনি ইতিহাসের দ্বারস্থ হলেন। 'বৃহত্তর ভারত' (১৩৩৪, ১৯২৭) প্রবন্ধে দেখালেন, মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুর ধর্মবিরোধের সময়ে জন্ম নেন সাধুসন্তগণ। তাঁরা 'আত্মীয়তার সত্যে'র দ্বারা উভয়কে বাঁধতে চেয়েছেন। এ-সাধকদের অনেকেই মুসলমান। তাঁদের রঞ্জনপদ্ধতি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> তাঁরা পোলিটিশান ছিলেন না, প্রয়োজনমূলক পোলিটিক্যাল ঐক্যকে তাঁরা সত্য বলে কল্পনাও করেননি। তাঁরা একেবারে সেই গোড়ায় গিয়েছিলেন যেখানে সকল মানুষের মিলনের প্রতিষ্ঠা ধ্রুব।[৬৫]

'হিন্দু-মুসলমান; (১৩৩৮, ১৯৩১) প্রবন্ধে ধর্মকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। ধর্মই মিলনের বাধা এ-বিশ্বাসে তিনি দৃঢ়। ভারতের মহাজাতি গঠনে ধর্মের বাধাটা তাঁর কাছে দুর্লঙ্ঘ্য বোধ হলো। তাই 'বিকৃত' এ-ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষও প্রচার করলেন। রুশবিপ্লব, ফরাসীবিপ্লব, স্পেনের বিপ্লব, মেক্সিকোর বিদ্রোহের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখালেন, ওই সমস্ত ভূখণ্ডে নবজীবনের আহ্বানে রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো।[৬৬] তাঁর বিদ্রোহ অবশ্য আদি প্রবর্তকদের মিলনকামী ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। বিকৃত ধর্মের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ, ওই বিকৃতধর্মের স্বরূপ

> তারপরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সংঘবদ্ধ করে বিকৃত করেছে, সংকীর্ণ করেছে; সেই ধর্ম নিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে এমন বিষয় বুদ্ধি দিয়েও নয়;...[৬৭]

তিনি সমকালে দেশান্তরে ধর্মবিদ্বেষ দেখছেন, কিন্তু,

> আমাদের প্রধান পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান।[৬৮]

সামাজিক কক্ষ রেখে রাজনৈতিক রাজপথের দিকেও তিনি দৃষ্টি দিলেন। তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমান সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ, তারা পৃথক নির্বাচন দাবি করছে। তিনি তাদের দাবি মেনে নিলেন।[৬৯] তাঁর বিশ্বাস, এতে মিল হবে। তবে ধর্মের সমস্যাটি রয়ে যাবে। এক দলের মসজিদের সামনে ঢাক বাজানোর উৎসাহ এবং অপর দলের কোরবানির সংখ্যাবৃদ্ধির আনন্দটা, তাঁর মতে, পরস্পর নিঃসম্পর্কিত শহরেই বেশি। মিলনের জন্য কামনা করলেন পরস্পরের মধ্যে আলাপ ও কাছাকাছি আগমন।[৭০] কিন্তু এদের মিলন ঘটে নি। রাষ্ট্র এবং সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই এরা পৃথক হয়ে গেছে, দূরে সরে গেছে। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে ১৩১২ সালে (১৯০৫) তিনি গভীর আবেগে বলেছিলেন

> কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনই আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন, এই পূর্ব-পশ্চিম হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে; এই পূর্ব-পশ্চিম জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙালির সন্তানকে পালন করিয়াছে।[৭১]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এতোখানি প্রগাঢ় আবেগ যে ব্যর্থ হলো তার অমোঘ বীজ নিহিত ছিলো এ-দেশবাসীর ইতিহাসের মধ্যেই। সে-বিষয়ে রবীন্দ্রবাণীই উদ্ধার করা যায়

> আমাদের কিছুতেই পৃথক করিতে পারে, এ-ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর-কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না।[৭২]

২

ওপরে আমরা মুসলমান সম্পর্কিত সমগ্র রবীন্দ্রপ্রবন্ধাবলী তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পাঠ করতে চেয়েছি। তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যের পরিচয় নিয়েছি কালানুক্রমিকভাবে, বিস্তৃত উদ্ধৃতি এবং ব্যাখ্যাসহ। তাই তাঁর চিন্তাধারার আর বিস্তৃততর বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন, বোধ হয়, নেই। আমরা যেদুটি শ্রেণীতে তাঁর চিন্তাধারাকে বিভক্ত করেছি, তার প্রথমাংশে তিনি যেকটি বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত, সেগুলো—সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, মধ্যযুগে হিন্দুমুসলমানের সম্পর্ক এবং মুসলমানদের ধর্মের দিক।

মুসলমান ভারতবর্ষে আসে ত্রয়োদশ শতকে, বিজয়ীর বেশে। সময়টা এ দেশের ইতিহাসের মধ্যযুগের ভূমিকাপর্ব। তিনি লক্ষ্য করেছেন, মুসলমান এদেশের মানসিক মণ্ডলে বিস্তৃতি সাধন করতে পারে নি, যেমন পেরেছে শাদা ইংরেজ। এর কারণ মুসলমান আধুনিক ছিলো না। মুসলমানের অবদানের কথা ভাবতেই রবীন্দ্রমানসে সর্বদা জ্বলেছে ইংরেজদের অবদানের উজ্জ্বল চিত্রগুলো। মুসলমান এদেশের চিত্তের প্রসার একেবারে সাধন করে নি, একথা তিনি বলেন নি। তবে তাঁর প্রত্যাশার তুলনায় ওই প্রসারণ সামান্য। তিনি বাংলা সাহিত্যে ফার্সির প্রভাব বিশেষ দেখেননি। একমাত্র *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যে এবং বঙ্গশব্দভাণ্ডারে ফার্সির প্রভাব দেখেছেন। বাংলা সাহিত্যে ফার্সির প্রভাব পড়ে নি, এমন গ্রহণযোগ্য নয়। মধ্যযুগে মুসলমান কবিদের রচিত রোমান্সময় প্রণয়োপাখ্যানগুলো অনেকটা ফার্সির প্রভাবজ। দেবনির্ভর বাঙলা কাব্যে মানবনির্ভরতা আনয়নের কৃতত্ব মুসলমান কবিদের[৭২ক], তবে এ-দান ইংরেজি সাহিত্যের দানের তুলনায় সামান্য। বাংলা শব্দভাণ্ডারই সবচেয়ে ফার্সি প্রভাবিত। বাঙলা ব্যাকরণেও ফার্সির প্রভাব আছে।

'আত্মপরিচয়' (১৩১৯) প্রবন্ধের কতিপয় মন্তব্য মুসলমানদের কাছে আপত্তিকর মনে হতে পারে। প্রবন্ধটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আদর্শে বিমুগ্ধ এবং প্রাচীন ভারতীয় বর্ণাশ্রম প্রথার উচ্ছ্বসিত সমর্থক। পূর্বোল্লেখিত তত্ত্বানুসারে, তিনি নিজেকে বললেন 'হিন্দু' এবং মুসলমানদের 'হিন্দুমুসলমান'। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমান ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ বা হিন্দু, এ সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তবু মুসলমানেরা নিজেদের 'হিন্দুমুসলমান' বলতে স্বীকৃত হবে না, ভারতীয় মুসলমান বলে পরিচয় দেবে। তবে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু' বলতে কি বুঝতেন, তাও জানা দরকার। আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা এবং রূপোদ্ভাবনী শক্তির মিশ্রণে যে-সামগ্রী গঠিত, তাই তাঁর কাছে হিন্দু।[৭৩] তাঁর সমকালীন হিন্দু সমাজ কর্তৃক গৃহীত ধর্মকে তিনি হিন্দু ধর্মের 'নিত্য লক্ষণ' বলে মানেন নি।[৭৪] সমাজতান্ত্রিক কল্পনায় তিনি অমিত উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। একই পরিবারে এক পিতামাতার সন্তানকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়ে সুখে বসবাসের কল্পনা তিনি করেছেন।

আমরা তাঁর চিন্তাধারাকে যে দুশ্রেণীতে বিভক্ত করেছি, তার মধ্যে, দ্বিতীয় শ্রেণী বিস্তৃততর, গভীরতর এবং স্পষ্টতর। মস্কোতে কৃষিভবন দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা কেন বাঁধে? তাঁর উত্তরটি ছিলো

> যখন আমার বয়স অল্প ছিল কখনো এ-রকম বর্বরতা দেখিনি। তখন গ্রামে ও শহরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাব ছিল না।... এমন সব কুৎসিৎ কাণ্ড দেখতে পাচ্ছি যখন থেকে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশীদের মধ্যে এই রকম অমানুষিক দুর্ব্যবহারের আশু কারণ যাই হোক, এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা। যে পরিমাণ শিক্ষার দ্বারা এই রকম দুর্বুদ্ধি দূর হয় আমাদের দেশে বিস্তৃতভাবে তার প্রচলন করা আজ পর্যন্ত হয়নি।[৭৫]

১৯৩০ সালে তাঁর নির্ণীত দাঙ্গার দু'টি কারণ—রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এবং অশিক্ষা। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি তাঁর মতে, মূল কারণ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও *A National in the Making* গ্রন্থে বলেছেন, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সূচনা স্বদেশী আন্দোলন থেকে, এর পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক মধুর ছিলো।[৭৬] এ-ধারণা ইতিহাসের স্বপক্ষে নয়। বর্তমান শতকের সূচনায় ফরিদপুর ও যশোরে মুসলমান চাষী এবং নমশূদ্রদের মধ্যে এক দীর্ঘকালীন দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। মোগল শাসনের শেষভাগে গুজরাট ও কাশ্মীরে দুটি দাঙ্গা বাঁধে। *সিয়ারুল মোতাআখেরীন* গ্রন্থ থেকে জনাব ওদুদ দাঙ্গার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন (বঙ্গানুবাদ তাঁরই)

> সম্রাট ফরোখশিয়ারের সিংহাসনারোহণের বৎসরে আহমদাবাদে এক হিন্দু গৃহস্থ হোলির সময়ে তার বাড়ির ওঠানে হোলি জ্বালালো। তখন হোলির সময়ে বিষম মাতামাতি হতো। আঙিনা-সংলগ্ন ও আঙিনার অতি অল্প অংশের অধিকারী মুসলমান গৃহস্থেরা তাতে আপত্তি করলে। হিন্দু গৃহস্থ সে আপত্তি শুনলে না, বল্লে, প্রত্যেকের তার নিজের বাড়ীতে সর্বময় কর্তৃত্ব আছে। পরের দিন পড়লে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুবার্ষিকী। সেই উপলক্ষে মুসলমান গৃহস্থেরা একটি গরু কিনে এনে সেই আঙিনায় জবাই করলে। এতে সেই অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু উৎক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করলে, মুসলমানেরা পালিয়ে যে যার বাড়িতে আশ্রয় নিলে। তখন সেই উৎক্ষিপ্ত হিন্দুজনতা গোহত্যাকারী কশাইয়ের সন্ধান করলে; তাকে না পেয়ে তার চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছেলেকে এনে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেই গোহত্যার স্থানে বলি দিলে।[৭৭]

অর্থাৎ এদের বিরোধ বহু দিনের। এর জন্যে প্রথমত দায়ী ধর্মের অসহনশীলতা। তাই বিরোধের জন্যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে সর্বতোভাবে দায়ী করা চলে না। তবে আন্দোলনসমূহ বিরোধকে বহুগুণে বর্ধিত করেছে, ধর্মবিদ্বেষের সঙ্গে যুক্ত করেছে স্বার্থগত বিদ্বেষ। আর রবীন্দ্রনির্দেশিত শিক্ষাহীনতা মূল কারণ নয়। শিক্ষিত বহির্বিশ্বে দাঙ্গা যে-স্বার্থিক কারণে বাধে, এদেশেও বেধেছে সেকারণেই। অশিক্ষা গৌণ কারণ। তবে দাঙ্গাই একমাত্র সমস্যাসার বা সংবাদ নয়। মূলকথা হচ্ছে, শান্তিপূর্ণ অবস্থায়ও এদের সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ ছিলো না। মধ্যযুগের হিন্দু কবিদের রচনায় মুসলমানদের জীবনবর্ণনা কিছু কিছু আছে। যেমন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের ‘মুসলমানগণের আগমন’ অধ্যায়।[৭৮] এখানে বর্ণিত জীবনধারা পাঠ করলে বোঝা যায় কবি ঘনিষ্ঠভাবে বিষয়বস্তুকে দেখেন নি।

আধুনিক ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমান সমস্যাটি একটি জটিল প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথের হিন্দুমুসলমান সমস্যা পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণদৃষ্টি মূলত সামাজিক, গৌণত রাজনৈতিক। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ সমস্যার কারণগুলো দেখেছেন, রাজনৈতিক কোণ থেকে যে দেখেননি এমন নয়, তবে রাজনৈতিক প্রশ্নটি তাঁর কাছে প্রধান হয়ে ওঠে নি। তিনি চেয়েছিলেন, উভয়ের সামাজিক সৌহার্দ্য, পরস্পরের মধ্যে মানবিক যোগাযোগ। যে সম্পর্ক যান্ত্রিক, তাকে তিনি কদাচ মূল্য দেননি। হিন্দুমুসলমানের বেলাতেও তাই। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সমস্ত ভেদাভেদ তুচ্ছকারী একটি জৈবিক সম্পর্ক তাঁর কাম্য ছিলো। উভয়ের সম্পর্কতিক্ততার যে-কটি কারণ তিনি দেখিয়েছেন, সেগুলো মোটামুটিভাবে

ক. সরকারী ভেদনীতি,

খ. অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও অন্যান্য বৈষম্য,

গ. ধর্মের উগ্রতা ও আচার সর্বস্বতা,

ঘ. রাজনৈতিক আন্দোলন।

হিন্দুমুসলমানের সম্পর্কবিপর্যয় প্রদর্শক ঊনবিংশ শতকের রচিত তাঁর প্রবন্ধ পেয়েছি আমরা তিনটি—‘ইংরেজ ও ভারতবাসী’ (১৩০০), ‘ইংরেজের আতঙ্ক’ (১৩০০),

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'সুবিচারের অধিকার' (১৩০১)। ঊনবিংশ শতকে তিনি বিরোধের মূলে দেখেছেন সরকারকে। সরকারই বিভেদ বাড়িয়ে তুলছে। সরকারের নীতি 'ডিভাইড য়্যাণ্ড রুল'। তিনি এমনও বলেছেন যে, সরকার যেন মুসলমানদের অনেকটা সহায়তা করছে, হিন্দুদের দমন করতে চাচ্ছে। সরকারী নীতিটি তিনি যথার্থ ধরেছেন। ১৮৭০ থেকে সরকার মুসলমানের আনুকূল্য শুরু করে। অবশ্য এ আনুকূল্য কথাবার্তা, বক্তৃতাতেই বেশীরভাগ সীমাবদ্ধ থাকতো। এ-মৌখিক পক্ষপাত বঙ্গভঙ্গের পরে চরম আকার পরিগ্রহ করে ব্যামফিল্ড ফুলারের উৎকট মন্তব্যে, 'হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় তাঁর দুই স্ত্রীর মতো   এর মধ্যে মুসলমানই প্রিয়তর।'[৭৯]

রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতকে বিরোধের মূলে দেখেছেন বিদেশী সরকারকে। ১৯০৭ সালে তিনি বিরোধের কারণসমূহ দেখতে চাইলেন আরো নিপুণভাবে, গভীর দৃষ্টিতে এবং বিরোধের বীজ আবিষ্কার করলেন নিজেদের মধ্যে। দেখলেন 'পাপে'র বসবাস নিজেদেরই মধ্যে, তাই সরকারকে দোষী করে লাভ নেই, ধিক্কার দিলেন নিজেদের অন্তর্গত পাপকে। স্বীকার করেছেন, এরা কেবল স্বতন্ত্র নয়, বিরুদ্ধ। উভয়ের বিরোধের কারণ স্বরূপ অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং অন্যান্য অসাম্য দেখিয়েছেন। সামাজিক সৌহার্দ্য যে সংস্থাপিত হয়নি, এর জন্যে বারংবার তিনিই হিন্দুকেই দায়ী করেছেন। মিলনের জন্যে সমস্ত অসাম্য বিদূরণের তীব্র বাসনা তিনি পোষণ করেছেন। এখানে দেখা যাবে মিলনার্থে তাঁর মধ্যে মানবিক উৎকণ্ঠা প্রবল। তাই বারংবার বঙ্গভঙ্গকালীন হিন্দুর আহ্বানের ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। হিন্দুর ত্রুটি প্রদর্শনে তিনি অস্বাভাবিক নির্মম, মুসলমানের ত্রুটি বিশেষ তিনি দেখাননি। ১৯১১ সালে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবোধের তীব্রতা লাভের কারণ ব্যাখ্যা করেন। 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, হিন্দু যেদিন হিন্দুত্বের গৌরব গাথা শুরু করলো, মুসলমানও সেদিন মুসলমানত্বের গর্ব বোধ করতে লাগলো। মুসলমানের আত্মোন্নতি চেষ্টাকে তিনি মিলনের সিঁড়িজ্ঞান করেছেন। বলেছেন

> মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।[৮০]

১৯১১ সালে তিনি মুসলমানের আত্মশক্তিসাধনাকে অভিনন্দিত করেন। ১৯৪২ সালের ১১ এপ্রিলে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নের প্রস্তাব গ্রহণ করে

> পঁচিশ বছর ধরে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন স্থাপন করবার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টার পর এবং এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে মুসলমানরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে, ব্রিটিশ সরকারের খসড়া পরিকল্পনা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> অনুযায়ী এই দুটি প্রধান জাতিকে এক অখণ্ড ভারতরাষ্ট্র গঠন করতে বাধ্য করা তাদের পারস্পরিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল নহে।... মুসলিম লীগের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, ভারত বিভক্ত করে স্বতন্ত্র অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করাই ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।[৮১]

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী মুসলিম লীগের এ-প্রস্তাব এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে একার্থবোধক মনে করেন।[৮২] আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। কেননা মুসলমানের জন্য পৃথক রাষ্ট্রকল্পনা তিনি করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন একই মঙ্গলমূলক রাষ্ট্রে সুখে, শান্তিতে, গাঢ় বন্ধনে উভয়ের বসবাস। ১৯৩৫ সালে ২৭ মার্চে অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি লিখেছেন, হিন্দুমুসলমান যদি না মেলে তবে 'ভারত স্বায়ত্তশাসন হবে ফুটো কলসীতে জলভরা।'[৮৩] ১৯১৪ সালে দেখালেন সামাজিক মিলন ব্যতিরেকে রাষ্ট্রনৈতিক মিলন অসম্ভব। ১৯১৭ সালে বিরোধের জন্যে মূলতঃ দায়ী করলেন ধর্মকে। ধর্ম উভয়ের মধ্যবর্তী মিলনবিরোধী রূঢ় দেওয়াল, এবোধ দৃঢ় হলো ১৯১৭-তে এবং, পরবর্তী সমগ্র জীবন বিরোধের জন্যে ধর্মকে নিন্দা করলেন। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁর কাম্য ছিলো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। গান্ধীজির সঙ্গে এখানে তাঁর অমিল। গান্ধীজি বুঝেছিলেন, মানুষ যদি স্বধর্মনিষ্ঠ হয় তবে মিলন সম্ভব হবে। তিনি ভুল বুঝেছিলেন এবং জনসাধারণ তাঁকে আরো ভুল বুঝেছিলো। এজন্য ক্রমবর্ধমান হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক তিক্ততার জন্যে সমালোচক তাঁকে দায়ী করেছেন।[৮৪]

ধর্মকে যে তিনি এতোবেশী দায়ী করলেন, তার কারণ বোঝা দরকার। কারণ বুঝতে পারলেই বুঝবো উভয় সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর কী প্রত্যাশা ছিল। রাষ্ট্রচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রবিমুখ, কল্যাণ ও প্রেমধর্মী সমাজমুখী। যে-সমাজে রয়েছে গতিস্থিতি, যার অধিবাসীরা সামাজিক বন্ধনে যুক্ত, পরস্পরের স্বার্থবন্ধনে নয়, হৃদয়বন্ধনে আবদ্ধ, সেসমাজ রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সমাজ। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে মিলনতীর্থ, এখানে সবার মিলন ঘটবে, এই ছিলো তাঁর কামনা। কিন্তু ধর্ম তা হতে দেয় নি। একারণেই ধর্মকে নিন্দিত, দায়ী করলেন সর্বাধিক, কেননা তা সামাজিক মিলনের পরিপন্থী। যে-মিলন সামাজিক এবং হৃদয়ধর্মবশত নয়, তাতে তিনি আস্থাহীন। তিনি বুঝেছিলেন সমাজে যদি উভয়ের মিলন সংসাধিত হয়, তবে সাধিত হবে রাষ্ট্রেও। সমস্যার সমাধান হিশেবে তিনি শিক্ষা, সর্ববিষয়ে উভয়ের সাম্য এবং সামাজিক দেয়ানেয়াকে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সমস্যাকে যুদ পরিবর্তনের হাতে ছেড়ে দেন ১৯২২-এ। তিনি বোধ করেছেন বিংশ শতকেও আমরা মধ্যযুগের অন্ধতায় ভুগছি, তাই তিনি আধুনিক যুগের আলো চেয়েছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দুমুসলমান সমস্যাটিকে রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ দেখেন নি। তিনি উভয়ের সামাজিক বিরোধের কারণগুলো অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন এবং মিলনের পথ সন্ধান করেছিলেন নিশীথের পথযাত্রীর মতো।

টীকা

১. 'কালান্তর', *কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (২৪), ১৩৫৪, পৃ. ২৪৩।

২. ওই, ওই, ২৪৩।

৩. ওই, ওই, ২৪৪।

৪. ওই, ওই, ২৪৪।

৫. 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (১৩০০), *রাজাপ্রজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১০), ১৩৫৭, ৩৮৮।

৬. ওই, ওই, ৩৯১-৯২।

৭. 'কোট বা চাপকান', *সমাজ, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১২), ১৩৫৮, ২২৮।

৮. কোট বা চাপকান' ওই, ২২৮।

৯. ওই, ওই, ২২৮।

১০. ওই, ওই, ২২৯।

১১. 'আত্মপরিচয়', *পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১৮), ৪৫২।

১২. ওই, ওই, ৪৫৪।

১৩. ওই, ওই, ৪৬০।

১৪. ওই, ওই, ৪৬৪।

১৫. ওই, ওই, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১৮), ৪৬৪।

১৬. ওই, ওই, ৪৬৪।

১৭. ওই, ওই, ৪৬৪।

১৮. 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', *রাজাপ্রজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১০), ১৩৫৭, ৩৯২।

১৯. 'সুবিচারের অধিকার', ওই, ৪১৮-১৯।

২০. ওই, ওই, ৪২০।

২১. 'ইংরেজের আতঙ্ক', পরিশিষ্ট, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১০), ১৩৫৭, ৫৩৮।

২২. ওই, ওই, ৫৩৮।

২৩. 'ব্যাধি ও প্রতিকার', ওই, ৬২৭।

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৪. ওই, পরিশিষ্ট, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১০), ৬২৮।

২৫. ওই, ওই, ৬২৮।

২৬. ওই, ওই, ৬২৮।

২৭. 'সভাপতির অভিভাষণ', *সমূহ, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১০), ১৩৫৭, ৫০১।

২৮. ওই, ওই, ৫০১।

২৯. 'সমস্যা', *রাজাপ্রজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১০), ১৩৫৭, ৪৮০।

৩০. ওই, ওই, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১০), ১৩৫৭, ৪৮১।

৩১. 'সদুপায়', *সমূহ, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১০), ১৩৫৭, ৫২৩।

৩২. ওই, ওই, ৫২৬।

৩৩. ওই, ওই, ৫২৮।

৩৪. 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়', *পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১৮), ১৩৬১, ৪৭৪।

৩৫. ওই, ওই, ৪৭৪।

৩৬. ওই, ওই, ৪৭৫।

৩৭. ওই, ওই, ৪৭৫।

৩৮. ওই, ওই, ৪৭৬।

৩৯. ওই, ওই, ৪৭৬।

৪০. 'লোকহিত', *কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (২৪), ১৩৫৪, ২৬১-৬২।

৪১. ওই, ওই, ২৬২।

৪২. ওই, ওই, ২৬২।

৪৩. ওই, ওই, ২৬২।

৪৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক* (২য় খণ্ড), তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৮, বিশ্বভারতী, ৪৯৯।

৪৫. ওই, ওই, পাদটীকা, ৫০৩।

৪৬. 'ছোটো ও বড়ো', *কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (২৪), ২৭৪।

৪৭. ওই, ওই, ২৭৪।

৪৮. ওই, ওই, ২৭৫।

৪৯. 'হিন্দুমুসলমান', *কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (২৪), ৩৭৫।

৫০. ওই, ওই, ৩৭৬।

৫১. ওই, ওই, ৩৭৬।

৫২. ওই, ওই, ৩৭৬।

৫৩. কাজি আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, ১৩৬৩, ১১৭।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫৪. 'হিন্দুমুসলমান', *কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (২৪), ৩৭৬।

৫৫. ওই, ওই, ৩৭৭।

৫৬. 'সমস্যা', ওই, ৩৪৬।

৫৭. ওই, ওই, ৩৪৮।

৫৮. ওই, ওই, ৩৫৩।

৫৯. ওই, ওই, ৩৫৪।

৬০. ওই, ওই, ৩৫৪।

৬১. ওই, ওই, ৩৫৬।

৬২. 'স্বরাজ সাধন', *কালান্তর*, সংযোজন, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (২৪), ৪১৭।

৬৩. 'স্বামী প্রজ্ঞানন্দ', (১৩৩৩), *কালান্তর*, সংযোজন, ওই, ৪৩৩।

৬৪. ওই, ওই, ৪৩৪।

৬৫. 'বৃহত্তর ভারত', ওই ৩৭২।

৬৬. 'হিন্দুমুসলমান', *কালান্তর*, সংযোজন, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (২৪), ৪৪৫-'৪৬।

৬৭. ওই, ওই, ৪৪৬।

৬৮. ওই, ওই, ৪৪৬।

৬৯. ওই, ওই, ৪৪৮।

৭০. ওই, ওই, ৪৫০।

৭১. 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', *আত্মশক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (৩), ৬১৯।

৭২. ওই, ওই, ৬১৯।

৭২ক. এটি বর্তমানের একটি বহু উচ্চারিত মত। এর অনেকটা মধ্যম পর্যায়ে সাহিত্য আলোচনার সময়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এমত নিয়ে অতিউল্লসিত হবার সমীচীন কারণ সম্ভবত নেই। কেননা, হিন্দুদের দেবনির্ভর মঙ্গলকাব্য পনেরো আনাই বাস্তব, অপর দিকে মুসলমান কবিদের মানবনির্ভর কাব্য ষোল আনাই অবাস্তব।

৭৩. 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', *পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১৮), ৪২৪।

৭৪. 'আত্মপরিচয়', ওই, ৪৫৫-'৫৬।

৭৫. *রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (২০), ১৯৬১, ২৯০।

৭৬. কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ*, ১৩৫৮, ১৬৩।

৭৭. ওই, ওই, ১৩৫৮, ১৬৩-'৬৪।

৭৮. *কবিকঙ্কণচণ্ডী* (প্রথম ভাগ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, ৩৪৩।

৭৯. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*, অক্টোবর, ১৯৬৪, ৯৬-৯৭।

৮০. 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়', *পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১৮), ১৩৬১, ৪৭৬।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৮১. উদ্ধৃতি ও অনুবাদ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দুমুসলিম সম্পর্ক', *সমকাল*, বৈশাখ ১৩৬৮, ৬৫৯।

৮২. ওই, ওই, ৬৫৯।

৮৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক* (৪র্থ খণ্ড), ১৩৬৩, ৭।

৮৪. কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ*, ১৩৫৮, ১৯৬।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ

গোলাম মোস্তফা

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিকবিতায় যে ভাব ও আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত ইসলামের চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে। তাঁহার ভাব ও ধারণাকে যে-কোন মুসলমান অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। বাংলা ভাষায় আর কোন কবি এমন করিয়া মুসলমানের প্রাণের কথা বলিতে পারেন নাই। শুধু বাংলা ভাষা কেন, জগতের কোন অ-মুসলমান কবির হাত দিয়াই এমন লেখা বাহির হয় নাই। অনেক কবি ও লেখকই ইঙ্গিতে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া গিয়াছেন, অথবা তাঁহাদের লেখায় এমন কিছু অনৈসলামিক ভাব মাখানো আছে যাহা কোন নিষ্ঠাবান মুসলমান প্রাণের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু গভীর আনন্দের বিষয় রবীন্দ্রনাথের লেখায় সে দোষ একটুও নাই। বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্যে কোথাও আমরা ইসলাম-বিদ্বেষ খুঁজিয়া পাই নাই। বরং তাঁহার লেখায় এত ইসলামী ভাব ও আদর্শ আছে যে তাঁহাকে অনায়াসে মুসলমান বলা চলে। পৌত্তলিকতা, বহুত্ববাদ, নিরীশ্বর-বাদ, জন্মান্তর-বাদ, সন্ন্যাস-বাদ প্রভৃতি যে সমস্ত ধারণা ইসলামের ঘোর বিরোধী তাহা রবীন্দ্রনাথের লেখায় আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল—ইসলাম কী, উহার বিশেষত্ব কী; কারণ তাহা হইলে ইসলামের সহিত রবীন্দ্রনাথের কোথায় কতটুকু মিল আছে, তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে।

ইসলামের বিশেষত্ব—

(১) খোদাতা'লাকে এক ও অদ্বিতীয় প্রভু মনে করা—ইসলামের মূল মন্ত্রই হইতেছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (এক খোদা ছাড়া অন্য কেহ উপাস্য নাই)। নিখিল-বিশ্বের নিয়ামক তিনি, জীবন মরণের প্রভু তিনি। "আমরা তোমাকেই আরাধনা করি, এবং তোমারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি ইহাই মুসলমানের দৈনন্দিন প্রার্থনা।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

(২) খোদাতালার মহান ইচ্ছার সম্মুখে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা—তাহাদের ইচ্ছাকে সর্ব অবস্থায় জয়যুক্ত করাই ইসলামের প্রধান শিক্ষা। সফলতা, নিষ্ফলতা, সুখ-দুঃখ, সম্পদ বিপদ—সমস্তই তাহারই দান। এখানে অহমিকা নাই, আমিত্বের কোন গর্ব্ব নাই। রিক্ত-মুক্ত ভাবে খোদাতা'লার জন্যই সমস্ত কাজ করিতে হয়।

(৩) খোদাতা'লা এবং তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের সহিত প্রেম স্থাপন করা—ইসলামের ধাতুগত অর্থও হইতেছে শান্তি। সুতরাং ইসলাম শান্তির ধর্ম। এখানে বিরোধ নাই, বিদ্রোহ নাই, আছে কেবল শান্তি, আছে কেবল প্রেম—খোদাতা'লার সহিত প্রেম, তাহার সৃষ্টির সহিত প্রেম।*

(৪) বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস বর্জ্জন করা—ইসলাম বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসে কখনো অনুমোদন করে না; সংসারের সমস্ত কর্তব্য পালন করিয় ধর্ম্মসাধন করিতে বিধান দেয়। খোদাতা'লা দত্ত এই আলোক-বাতাস, এই ভোগ-বিলাস, এই প্রিয় পরিজন সমস্তই ব্যর্থ করিয়া দিয়া নির্জন বনে একাকী ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় মুক্তি-সাধন করা ইসলামের বিধি নয়। বিশ্বের পরতে পরতে আপনাকে জড়াইয়া দিয়া অন্তরে অন্তরে অনন্ত প্রেম-রাজ্যে বাসা বাঁধাই ইসলামের অনুমোদিত ধর্ম পদ্ধতি।

(৫) জন্মান্তর-বাদ অস্বীকার করা।

(৬) সাম্য ও বিশ্ব-প্রেম স্থাপন করা—ইসলামে কৌলিন্য প্রথা নাই। এখানে সকলেই ভাই ভাই। মানুষ হিসাবে ব্রাহ্মণশূদ্র, রাজাপ্রজা, ধনীভিক্ষু সকলেই সমান।

ইহাই হইতেছে মোটামুটিভাবে ইসলামের বিশেষত্ব। এখন আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব—রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে এই সমস্ত ভাব ও আদর্শ কোথায় কতখানি প্রতিফলিত হইয়াছে। (অবশ্য ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি রবি বাবুর সমস্ত কবিতাই নিঃশেষে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। সেরূপ করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। ইসলামী ভাব সমন্বিত এত কবিতা রবি বাবু লিখিয়াছেন যে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখান অসম্ভব। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, গীতপঞ্চাশিকা, শেফালী, কেতকী ও অন্যান্য গানের বই সমস্তই খোদা প্রেম-বিষয়ক কবিতায় ভরপূর। তত্ত্বান্বেষী পাঠক রবিবাবুর কবিতা পড়িলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন)।

A Muslim, according to the Holy Quran, is he who has made his peace with peace with God and man, with the creator as well as His creatures. Peace with God implies submission to His will who is the source of all purity and goodness, and peace with man implies the doing of good to ones fellowmen—Muhammad Ali Preface to his Holy Quran.

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্ম-সমর্পণ

সর্ব্ব প্রথমেই গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে—

“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরবদান
নিজেরে কেবলি করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমার ইচ্ছা করহে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে!
যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম দলে।”

এই কবিতাটিকে আমি সর্বোচ্চ স্থান দিই। কোরান শরিফে “সুরা ফাতেহা” যেমন কোরানের প্রথমে থাকিয়া সমস্ত কোরানের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটিও সর্ব প্রথমে বসিয়া তাহার যাবতীয় ভাবসম্পদের আভাষ প্রদান করিতেছে। “সুরা ফাতেহা” যেমন সমস্ত কোরানের সার মর্ম, এই কবিতা তেমনই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার সার মর্ম। মাত্র এই একটি কবিতার দ্বারাই কবির সমস্ত কবিতার প্রকৃতি ও গতি-পথ নির্ণয় করা যায়। এই কবিতার ভিতরে ইসলামের প্রায় সব সত্যেরই সমাবেশ হইয়াছে। একমাত্র খোদাতা'লাকেই সর্বময় প্রভু মনে করিয়া তাহার চরণ-তলে মাথা নত করা, নিজের অক্ষমতা নিবেদন করা এবং তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করা, অহমিকা বিসর্জ্জন দিয়া খোদার ইচ্ছাকেই জয়যুক্ত করা, অন্য কিছু কামনা না করিয়া খোদাতা'লারই 'চরম শান্তি' ও 'পরম কান্তি' প্রার্থনা করা,—এই সমস্তই খাঁটি ইসলামের কথা। কোরাণ শরিফে আছে—পরকালে বেহেস্তে শুধু চির শান্তি বিরাজ করিবে; সকলের মুখে “শান্তি” “শান্তি” রব উত্থিত হইবে। আর বেহেস্তের দার্শনিক ব্যাখ্যাও হইতেছে—খোদাতা'লার 'দিদার'লাভ করা (অর্থাৎ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জ্যোতিঃ দর্শন।) পুণ্যবানেরা সেখানে সর্বদা খোদাতা'লার দিব্য কান্তি অনুভব করিবে। এই দুইটী কথার সহিত

"যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি"

এ কথার কি গভীর সম্বন্ধ!

অন্যত্র কবি বলিতেছেন,—

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু তোমার পানে তোমার পানে
তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু তোমার কানে তোমার কানে
তোমার কানে।"

এখানেও কবি শুধু খোদাতা'লাকেই একমাত্র অদ্বিতীয় প্রভু মনে করিতেছেন এবং নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব অভিযোগ তাঁহারই সকালে নিবেদন করিতেছেন।

অনিত্য সংসারে সকল ঠেলিয়া একমাত্র খোদাতা'লাকেই যে কামনা করিতে হয় সে সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

"চাই গো আমি তোমারে চাই
তোমায় আমি চাই
এই কথাটি সদাই মনে
বল্‌তে যেন পাই,
আর যা কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে
মিথ্যা সে সব, মিথ্যা ওগো
তোমায় আমি চাই।"

ইসলামের শিক্ষাও ত এই! খোদাতা'লাকে পাওয়াই ত সত্যিকার পাওয়া, আর যা কিছু সমস্তই মিথ্যা।

কবি যে পৌত্তলিকতা বা সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেন না, তাহা নিম্নের কবিতা হইতে অতি সুন্দর ভাবে বুঝা যায়—

"মুগ্ধ ওরে স্বপ্ন ঘোরে
যদি প্রাণের আসন কোণে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধূলায় গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস আপন মনে—
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে
কত না যুগ যুগান্তরে!"

এই সমস্ত কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ খাঁটী ইসলামী ভাবেরই প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন। একমাত্র খোদাতা'লাকেই তিনি অদ্বিতীয় প্রভু মনে করেন, তাহারই চরণে তিনি মাথা নত করেন, তাহারই সকাশে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি ছাড়া আর কোন "ধূলায় গড়া দেবতারে" আপন মনে স্থান দেন না।

প্রেম ও শান্তিস্থাপন

এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আলোচ্য কবিতার সমস্তই ত গভীর ঐশী প্রেমের পরিচায়ক! প্রেম না থাকিলে আত্ম-সমর্পণ ও মিলন কিসের? রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর সকল কবিতাতেই একটা অতৃপ্ত মিলনের আকাঙ্ক্ষা সূচিত হইয়াছে। কোথায়ও তিনি উদ্ধত ভাবের বা বিদ্রোহের পরিচয় দেন নাই। "তুমি এস, হৃদয়-পদ্ম-দলে দাঁড়াও", 'গানের সুরের আসনে বস' ঐ যে তুমি "আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে," 'যেও না সখা হেলায় ঠেলে'—ইত্যাদি ভাবের বিরহ ও বেদনার অভিব্যঞ্জনায় সমস্ত কবিতা ভরপূর। রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকৃতিও মিলন-প্রয়াসী। নিখিল বিশ্বের ছোট বড় সকলকেই তিনি তাঁহার উদার হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন; সকলকেই তিনি ভালবাসিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

"জগত আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ
জগত-প্রাণে মিলি গাহিছে একি গান!"

বাস্তবিকই তিনি "জগতের" সহিত এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাকে আলাদা করিয়া দেখিলে তাঁহাকে বুঝা যাইবে না। নিখিল বিশ্বের মর্মে মর্মে যে সহজ সুরের ঝঙ্কার উঠিতেছে, তাহারই মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তিনি যেন বিশ্ব প্রকৃতিরই বেশী আপন, আমাদের কেউ নন! কোরান শরিফে আছে—

"আল্লাহ মানবমণ্ডলীকে যে নিজের ফেৎরাতের (Nature বা প্রকৃতির) উপর সৃষ্টি করিয়াছেন, (তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর) আল্লার সৃষ্টিতে রদ্-বদল নাই, ইহাই সরল 'দিন' (ধর্ম্ম)—সুরা রুম, ৩০ আয়েত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ সেই প্রকৃতিরই সন্তান। তিনি প্রকৃতিকে বাস্তবিকই দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার ভিতরে কোনই রদ-বদল হয় নাই।

বিশ্ব-প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

কোরান শরিফে আছে—

"নিশ্চয়ই স্বর্গে মর্ত্যে বিশ্বাসীদিগের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।"—সুরা আল জাসিয়া, ৩ আয়েত।

"এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্ত্তনের মধ্যে এবং খোদাতা'লা লোকের জীবনধারণের জন্য মেঘ হইতে পৃথিবীতে যাহা প্রেরণ করেন এবং তদ্দ্বারা মৃত্যুকে পুনর্জীবিত করেন, (তাহার মধ্যে) এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের মধ্যে তাহাদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে—যাহারা চিন্তা করে।

—সুরা আল জাসিয়া, ৫ আয়েত।

কোরানের এই বাণী রবীন্দ্রনাথের জীবনে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। প্রকৃতিকে তিনি যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ইসলামের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। সূর্য-চন্দ্র, আঁধার-আলোকে, সন্ধ্যা-প্রভাত, ঝঞ্ঝা-বাদল, বর্ষা-বসন্ত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়া তিনি একমাত্র খোদাতা'লারই অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। দৃশ্যের সম্মুখে কখনো তিনি মস্তক অবনত করেন নাই, দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দৃশ্যের আড়ালে লুকান সেই বিরাট পুরুষের আভাষ পাইয়াই তাঁহার মন উদাস আকুল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কবি বলিতেছেন—

"এই যে তোমার প্রেম ওগো
হৃদয় হরণ!
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোণার বরণ!
এই যে মধুর আনন ভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে
এই যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ,
এই ত তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়হরণ!"

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রেমিকের উপযুক্ত কথাই বটে! বসন্তে কবি গাহিতেছেন—

"আজি গন্ধ-বিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে
* * *
আমি পুলকিত কার পরশনে।"

অন্যত্র—

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
* * *
মোর পরাণে দখিন বায়ু লাগিছে
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে
এই সৌরভ বিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণীতল জাগিছে!
ওগো সুন্দর বল্লভ কান্ত
তব গম্ভীর আহ্বান কারে!"

বর্ষায়—

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
* *
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে!"

অন্যত্র তিনি বাদল বরিষণের ভিতর দিয়া খোদাতা'লাকে কেমন সুন্দর ভাবে আহ্বান করিতেছেন—

"এস হে এস সজল ঘন
বাদল বরিষণে
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এস হে এ-জীবনে।"

শরতে—

"শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে
আনন্দ গান গায়ে হৃদয়

~ www.amarboi.com ~

আনন্দ গান গারে।
যে এসেছে তাহার মুখে
দেখরে যেয়ে গভীর সুখে
দুয়ার খুলে তাহার সাথে
বাহির হয়ে যারে।"

ঝড়ের রাতে—

"ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধুহে আমার
আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বার।"

সূর্য্য চন্দ্র দেখিয়া—

"এই যে তোমার আলোক ধেনু
সূর্য্য তারা দলে দলে
কোথায় বসে বাজাও বেণু
চরাও মহা গগণ তলে।

মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দিবে কি সন্ধ্যা হ'লে।"

প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলেই দেখিয়া থাকি, কিন্তু এমন ভাবে কয়জন দেখি? স্বর্গে মর্ত্যে যে "অসংখ্য নিদর্শন" আছে, সে কথা ত মিথ্যা নয়! রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সুখ-দুঃখ

ইসলাম সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, জীবনে মরণে খোদাতা'লারই জয়-গৌরব ঘোষণা করে। কোরান বলিতেছে—

"বল (হে মোহাম্মদ) নিশ্চয়ই আমার আরাধনা, ত্যাগ, জীবন ও মরণ সমস্তই আল্লার জন্য।"

—সূরা আল আনআম, ১৬৩ আয়েত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবি বলিতেছেন :—

"সুখী হও দুঃখী হও, তাহে চিন্তা নাই
তোমরা তাঁহারি হও, আশীর্ব্বাদ তাই।"

* *

"বাঁচান বাঁচি মারেন মরি
বল ভাই ধন্য হরি।
সুধা দিয়ে মাতান যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি।"

অন্যত্র—

"মোর মরণে তোমার জয় হবে
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।"

এই সমস্ত কবিতাতে কবি এই কথাই বলিতেছেন যে, সুখে দুঃখে, জীবনে মরণে খোদাতা'লাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য, সব অবস্থাতেই তিনি "আল্লার জন্য।"

সাফল্য বা বিজয় গৌরবের মধ্যেও যে খোদাতা'লারই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিতে হয় আর তাহারি সকাশে সাফল্যের গৌরব নিবেদন করিয়া দিতে হয়, সে কথা কবি তাহার নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি উপলক্ষে লিখিত কবিতায় অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন

"কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা
লুকিয়ে তুমি ঐ গানেরি আড়ালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে।"

অন্যত্র এই সম্বন্ধেই কবি বলিতেছেন—

"এই মণিহার আমার নাহি সাজে,
পরতে গেলে লাগে, এরে
ছিড়তে গেলে বাজে।
তাইত বসে আছি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ হার তোমায় পরাই যদি
তবে আমি বাঁচি।”

মুসলমানগণ দৈনন্দিন জীবনে প্রতি কাজে যে কথা ব্যক্ত করে ইহাও তাই।

দুঃখ দৈন্যকেও কবি ঠিক ইসলাম অনুযায়ী গ্রহণ করিয়াছেন। দুঃখ-দৈন্য পূর্ব জন্মের কর্মফল এমন কথা তিনি কোথায়ও ঘৃণাক্ষরে ও প্রকাশ করেন নাই। জীবনের সার্থকতার জন্য যে দুঃখ-দৈন্যেরও প্রয়োজন আছে, দুঃখ যে খোদাতা'লার বিশেষ অনুগ্রহেরই রূপান্তর, সুখ সম্পদ ছাড়া জীবনের যে মহত্তর লক্ষ্য আছে, এই কথা মনে করিয়াই কবি সগৌরবে দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোরান বলিতেছে :—

“হে বিশ্বাসিগণ! ধৈর্য এবং প্রার্থনার ভিতর দিয়া সাহায্য প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য-শীল-দিগের সহিত।”—সুরা বকর, ১৫৩ আয়েত।

“এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে ভয়, সম্পদ-হানি, জীবন-হানি, ফল-হানি বা তদ্রূপ কিছু দিয়া পরীক্ষা করিব; এবং যাহারা ধৈর্য্যশীল তাহাদিগের নিকট সুসংবাদ প্রেরণ করিব (অর্থাৎ ধৈর্য্যের পুরস্কার দিব)”

সুরা বকর, ১৫৫ আয়েত।

“তাহাদেরই উপরে (অর্থাৎ উক্ত ধৈর্যশীলদিগের উপরে) তাহাদের প্রভুর দিক হইতে আশীর্বাদ এবং করুণা (বর্ষিত হইবে।)”

ঐ ১৫৭ আয়েত।

কবি বলিতেছেন—

“আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচানে মোরে
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে।
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়
নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়
পূর্ণ করিয়া তবে এ জীবন
তব মিলনেরি যোগ্য করে।”

*   *

“দুঃখ যদি না পাবে ত
দুঃখ তোমার ঘুচবে [illegible]বে।”

~ www.amarboi.com ~

* *

"পুষ্প দিয়ে মোর যারে
চিন্‌ল না সে মরণকে
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে যে
ধরে তোমার চরণকে।"

"লাগে না গো কেবল যেন
কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ করো না।"

"দুঃখ-রথের তুমিই রথী
তুমিই আমার বন্ধু
তুমি শঙ্কট, তুমিই ক্ষতি
তুমি আমার আনন্দ।"

"এই করেছ ভাল নিঠুর
এই করেছ ভাল
এম্‌নি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বাল।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।
যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই ত পুরস্কার!"

"দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নাম্‌ল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থাম্‌ল।"

ইহাই রবীন্দ্রনাথের দুঃখ দৈন্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, সকল অবস্থাতেই তিনি খোদাতা'লাকে বন্ধু বলিয়া আকাড়িয়া ধরিয়াছেন। লক্ষ্যের

~ www.amarboi.com ~
প্রতি তাহার দৃষ্টি স্থির-নিবদ্ধ, কোন অবস্থাতেই তিনি গতি-পথ হইতে স্খলিত হন নাই। মুসলমানগণও দুঃখের দিনে বলিয়া থাকে—"আমরা আল্লার নিকট হইতে আসিয়াছি এবং আল্লাই আমাদের লক্ষ্য।"— (সুরা বকর, ১৫৬ আয়েত)

বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। গম্ভীরভাবে তিনি ঘোষণা করিতেছেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। * * * *
* * * ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।"

ইহাই ইসলাম! অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তি লাভ করাই ত প্রকৃত পৌরুষের কার্য্য! কোরাণ বলিতেছে—

"এবং যে সন্ন্যাস ব্রত (খৃষ্টানগণ) সৃষ্টি করিয়াছে তৎসম্বন্ধে আমি তাহাদিগকে কিছুই বলি নাই। পৃথিবীতে তোমাদের জন্য যে (ভোগের) স্বত্ব নির্দ্ধারিত আছে, তাহা বিস্মৃত হইও না।"

"হে মুসলমানগণ! খোদাতা'লা তোমাদের জন্য যে সমস্ত জিনিষ বৈধ করিয়াছেন, তাহা অবৈধ করিও না।"

হজরত মোহাম্মদের জীবনের গতিও এই পথেই চলিয়াছে। সংসারের সমস্ত বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া তিনি অধ্যাত্ম জগতে বিহার করিতেন। সব আনন্দের মাঝখানেই তিনি খোদার আনন্দ উপভোগ করিতেন।

সাম্য ও বিশ্ব-প্রেম

সাম্য ও বিশ্ব-প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠিক ইসলামের উক্তিরই প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন—

"যুক্ত করহে সবার সঙ্গে
মুক্ত করহে বন্ধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।"

"এস হে আর্য এস অনার্য
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ
এস এস খৃষ্টান।

এস ব্রাহ্মণ, শুচি কর মন
ধর হাত সবাকার
এস হে পতিত হোক অপনীত
সব অপমান ভার।"

কোরান বলিতেছে—

"সমস্ত মানব মণ্ডলীই এক জাতি"

—সুরা বকর, ২১৩ আয়েত।

"হে মানব, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বংশ ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পার।"

—সুরা অল্-হুজুরাত, ১৩ আয়েত।

অন্যত্র কবি, মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করার জন্য দেশের লোককে অভিশাপ দিতেছেন—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদেরে করেছ অপমান অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে

সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

তেরশত বৎসর পূর্ব্বে ইসলাম যে সত্য গম্ভীরভাবে ঘোষণা করিয়াছে, আজ তাহা নূতন করিয়া রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়া কোন্ মুসলমানের প্রাণে না আনন্দের সঞ্চার হয়!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপসংহার

এইরূপে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গীতি কবিতাতেই ইসলামী ভাব ও আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে। আকাশে-বাতাসে, স্থলে-জলে, সুখে-দুঃখে খোদাতা'লার মহিমা এমন ভাবে উপলব্ধি করিতে আর কোন কবিকে দেখি নাই। এক মাত্র খোদাতা'লাকে অদ্বিতীয় প্রভু জ্ঞান করা, তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়া, তাঁহার ইচ্ছার সম্মুখে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করা, সমস্ত কার্যে অহমিকা বিসর্জ্জন দেওয়া, তাহার সহিত মিলিত হইবার অদম্য পিপাসা জাগাইয়া রাখা, তাঁহার সৃষ্ট পদার্থকে ভালবাসা উদার হৃদয় লইয়া সকল মানুষের সহিত ভ্রাতৃভাবে মিলিত হওয়া—ইত্যাদি যা কিছু ইসলামের বিশেষত্ব, সমস্তই রবীন্দ্রনাথে পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার লেখাতে মুসলমানের দিক দিয়া আর একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে; সেটা হইতেছে অশরীরী ভাব spirit of abstraction ইহা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা। আমার মনে হয় পারশ্যের অমর কবি হাফেজ ও ওমর খৈয়াম ছাড়া এ ভাব আর কোন কবি ধরিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা ভাষায় রবীন্দ্রনাথই এই ভাবের গুরু। তাহার কবিতা পড়িলে মন যেন কোন্ অনন্তে উধাও হইয়া যায় এবং এমন কিছু উপলব্ধি করে যাহার আকার দেওয়া যায় না। এই ভাবটী মুসলমানের পক্ষে খুবই দরকারি, কারণ তাহারা নিরাকারবাদী। নিরাকায় খোদার ধারণা করিবার জন্য এ হেন কবিতারই প্রয়োজন বেশী। উহা মানবাত্মাকে অনন্ত ভাব রাজ্যে লইয়া যায়।

এই সমস্ত কারণেই আমি তাহাকে মুসলমান বলিয়াছি। ইহা দ্বারা আমি এই কথাই বুঝাইতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথ অ-মুসলমান হইলেও তিনি আমাদের অতি নিকট অতি আপনার। কিন্তু হায়! মুসলমান সমাজ রবীন্দ্রনাথকে একটুও চিনিতে পারে নাই। সুদূর বার্লিনে, জাপানে এবং অন্যান্য অ-মুসলমান প্রদেশে কবি-সম্রাটের সংবর্ধনা হইয়াছে, কিন্তু বিরাট মোসলেম জগতের একটী প্রাণীও তাহাকে আদর বা appreciate করেন নাই, ইহা আমাদের মস্ত বড় অগৌরবের কথা সন্দেহ নাই। আজ যদি সকলের আগে মুসলমান জাতিকে কবিকে আদর করিতে দেখিতে পাইতাম, তবে কী আনন্দই না হইত! তাহা হইলে ঠিক হইত।

এস মুসলমান! হিন্দু ভ্রাতৃগণের সহিত আমরাও কণ্ঠ মিলাইয়া কবিবরের গুণগান করি,

> "জগত-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব
> বাঙ্গালী আজি গানের রাজা বাঙ্গালী নহে খর্ব।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গল্পগুচ্ছের মুসলিম চরিত্র

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

বৈচিত্র্য আর বিচিত্র গতির এক আশ্চর্য সমুদ্র-সম্মিলন—এই হচ্ছে রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। এবং সম্মিলিত মহিমার বিপুলতাকে যদি তার অভ্রান্ত স্বরূপে স্পর্শ না করা যায় তবে যে কোন একটি মাত্র আলোক শিখায় একটি প্রদেশ উজ্জ্বল বলে মনে হলেও নানা আলোর যথার্থ মণিবর্ণটি থেকে যাবে অগোচরে। বস্তুত রবীন্দ্র-প্রতিভা বিচারের বিপত্তি এখানেই। তবু একটি একটি করে প্রদীপ জ্বেলে আলোকোৎসব পূর্ণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। হয়ত এ দেখায় দূর ব্যাপ্তি কি বিস্তৃতি থাকবে না, তবু সমুদ্রের গুণেই সমুদ্রের স্বাদ থাকবে জড়িয়ে।

দুই

'কেতাবী' আলোচনায় অনেকেই রুষ্ট হন। তাঁরা ভাবেন, তুষ্ট হলে তুচ্ছতার অপমৃত্যু নির্ধারিত তবে এমন দু'একজন দুর্লভ প্রতিভার সন্ধান মেলে যাঁরা, বুদ্ধদেব বসুর ভাষা, 'যাদুঘরের দ্রষ্টব্য বস্তু' মাত্র নন; যাঁদের রচনা 'পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক আপন প্রয়োজনে ব্যবহার করলেও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রেই যার মূল্য আবদ্ধ নয়, জীবিত পাঠকশ্রেণীর প্রাণের মধ্যে যা প্রাণবন্ত; তার মধ্যেই আমরা চিরন্তনের স্পর্শ দেখতে পাই।' 'কেতাবী' আলোচনায় যার মানহানি ঘটে না। রবীন্দ্র-প্রতিভা এই দুর্লভতম-জাতীয়। এ প্রতিভার একটি ক্ষুদ্র অনাদৃত দিক নিয়ে তাই এই অসঙ্কোচ 'কেতাবী আলোচনা।

'গল্পগুচ্ছের'[২] মুসলমান চরিত্রগুলোই বর্তমান আলোচ্য বিষয়।

'গল্পগুচ্ছের' রচনকাল ১২৯১ (ঘাটের কথা) থেকে ১৩৪০ (চোরাই ধন)। কিন্তু '১৮৯১ সাল (বাংলা ১২৯৮ সাল) হইতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার রীতিমত সূত্রপাত।'[৩] এবং এ সময় থেকেই মুসলিম চরিত্র তাঁর গল্পে চিত্রিত হয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'গল্পগুচ্ছের' তিন খণ্ডে মোট ৮৪টি গল্পের মধ্যে ৫টি গল্পে মুসলিম চরিত্র ও একটি গল্পে প্রসঙ্গ-উল্লেখ আছে। কালক্রম অনুযায়ী গল্পগুলো হচ্ছে 'দালিয়া' (১২৯৮, ১৮৯১), 'রীতিমত নভেল' (১২৯৯, ১৮৯২), 'কাবুলিওয়ালা' (১২৯৯, ১৮৯২), 'সমস্যাপূরণ' (১৩০০, ১৮৯৩), 'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৩০২, ১৮৯৫) ও 'দুরাশা' (১৩০৫, ১৮৯৮)।

তিন

দালিয়া ইতিহাসের আবরণে রোমান্স রসের গল্প। তবে ঐতিহাসিক সত্য গল্পের প্রথম লাইন—'পরাজিত শা সুজা ঔরঙ্গজীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আরাকান রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন।'—এইটুকু মাত্র। গল্পের অবশিষ্টাংশ কল্পনানির্ভর। শা শুজার হত্যাও ঐতিহাসিক সত্য বটে তবে কারণ এখানে নবরূপে নির্মিত

"সঙ্গে তিন সুন্দরী কন্যা ছিল। আরাকান রাজের ইচ্ছা হয়, রাজপুত্রদের সহিত তাহাদের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা সুজা নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করাতে, একদিন রাজার আদেশে তাঁহাকে ছলক্রমে নৌকাযোগে নদীমধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময় কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে পিতা স্বয়ং নদীমধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরে। এবং সুজার একটি বিশ্বাসী কর্মচারী রহমত আলী জুলিখাকে লইয়া সাঁতর দিয়া পালায় এবং সুজা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।"

গল্প-পাঠকের কাছে সত্যমিথ্যার সংবাদ অবশ্য তুচ্ছ। যা প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে—

"আমিনা খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দৈবক্রমে অনতিবিলম্বে এক ধীবরের জালে উদ্‌ধৃত হয় এবং তাহারই গ্রহে পালিত হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইয়াছে এবং যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।"

জুলেখা ও আমিনা দু'বোনের চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। রহমত আলী জুলেখাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, সে এখন ছদ্মপরিচয়ে আরাকান রাজসভায় আছে; সুযোগ খুঁজছে প্রভুহত্যার প্রতিশোধ নেবার। জুলেখার চিন্তাও অনুরূপ—

"ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। নহিলে আর তো কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না।"

কিন্তু আমিনার এ চিন্তায় উৎসাহ ন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"দিদি, আর ও-সব কথা বলিস না, ভাই। আমার এই পৃথিবীটা এক রকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় তো পুরুষগুলো কাটাকাটি করিয়া মরুক গে, আমার এখানে কোন দুঃখ নেই।"

জুলিখা বলিল' "ছি ছি, আমিনা, তুই কি শাহজাদার ঘরের মেয়ে। কোথায় দিল্লীর সিংহাসন, আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটির।" আমিনা হাসিয়া কহিল, "দিদি, দিল্লীর সিংহাসনের চেয়ে আমার বুঢ়ার এই কুটির এবং এই কৈলু গাছের ছায়া যদি কোনো বালিকার বেশি ভালো লাগে, তাহাতে দিল্লীর সিংহাসন একবিন্দু অশ্রুপাত করিবে না।"

আমিনার এই নির্মোহ-দৃষ্টি তার পারিপার্শ্বিকের প্রভাব। বন্য-হরিণের মত চঞ্চল দালিয়া এসেছে তার জীবনে। জুলিখার তা পছন্দ নয়। কিন্তু 'নদীর যেমন একদিকে স্রোত এবং আর একদিকে কূল, রমণীর সেইরূপ হৃদয়াবেগ এবং লোকলজ্জা।... সভ্য সমাজের বাহিরে আরাকানের প্রান্তে এখানে লোক কোথায়।...'

অতএব 'এই বর্বর কুটিরের মধ্যে নির্জন দারিদ্র্যের ছায়ায় যখন জুলিখার কূলগর্ব এবং লোকমর্যাদার ভাব আপনিই শিথিল হইয়া আসিল তখন পুষ্পিত কৈলুতরুচ্ছায়ে আমিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর খেলা দেখিতে দেখিতে তাহার বড়ো আনন্দ হইত।'

দালিয়ার চরিত্র খুব স্বল্পকথায় সুস্পষ্ট চিত্রিত হয়েছে—

"বর্বর দালিয়া প্রকৃতি-সম্রাজ্ঞীর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, শাহজাদীর কাছে কোন সঙ্কোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরাও তাহাকে সমকক্ষ লোক বলিয়া চিনিতে পারিত। সহাস্য, সরল, কৌতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নির্ভীক, অসংকুচিত তাহার চরিত্রে দারিদ্র্যের কোন লক্ষণই ছিল না।"

দালিয়ার কাছে জুলিখা আরাকানের রাজার সন্ধান চেয়েছে; রাজার বক্ষে ছুরি বসানো তার বাসনা। 'জুলিখার হিংসা প্রখর' মুখের দিকে চেয়ে দালিয়া ভাবল 'রাজপুত্রীর উপযুক্ত' পরিহাস বটে, 'প্রথম পরিচয়ে এইরূপ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ব্যবহার'।

পরদিন রহমত শেখ গোপনে জুলিখাকে জানাল যে আরাকানের নবীন রাজা তাদের সন্ধান পেয়েছেন এবং বিবাহ করতে চান, আর এই হচ্ছে পিতৃহত্যা প্রতিবিধানের উপযুক্ত সময়। যথাসময়ে দালিয়ার জন্য বেদনাহত হলেও আমিনা পাল্‌কিতে চড়ে চললো কর্তব্য সাধনে। কিন্তু আমিনা, জুলিখা ও সকল পাঠকের চূড়ান্ত বিস্ময়ের বিনিময়ে দেখা গেল সিংহাসনে বসে দালিয়া স্বয়ং। আমিনা মূর্ছিতা হল। এবং "ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া ঝিকমিক করিয়া হাসিতে লাগিল।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'রীতিমত নভেল'-এ কাহিনীর নায়ক 'কাঞ্চির সেনাপতি' 'ভারত ইতিহাসের ধ্রুবনক্ষত্র' ললিত সিংহের পরাক্রমের পরিচয় দেবার জন্য মুসলিম প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে

"আল্লাহো আকবর শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিন লক্ষ যবন সেনা, অন্যদিকে তিন সহস্র আর্য সৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশ্বত্থ বৃক্ষের মতো হিন্দুবীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল কিন্তু এইবার ভাঙিয়া পড়িবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেই সঙ্গে ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে এবং আজিকার ওই অস্তাচলবর্তী সহস্ররশ্মির সহিত হিন্দুস্থানের গৌরব-সূর্য চিরদিনের মতো অস্তমিত হইবে।

"হর হর বোম্ বোম্!" পাঠক বলিতে পার কে ওই দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশজন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কর-নিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রুসৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল? বলিতে পার কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবনসৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল? কাহার বজ্রমণ্ডিত 'হর হর বোম বোম' শব্দে তিন লক্ষ ম্লেচ্ছ-কণ্ঠের 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল?"

বঙ্কিমানুসারী এই বর্ণনায় বঙ্কিমের সঙ্গে যেখানে প্রভেদ তা এর প্রচ্ছন্ন কৌতুক, বস্তুত এই বর্ণনা যেমন তেমনি সমস্ত ঘটনা প্রবাহই কৌতুকরসে সিক্ত। বীরবর ললিত সিংহের পরবর্ত্তী জীবন অভূতপূর্ব। রাজকুমারীর প্রতি প্রেমবশত তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অবশ্য তাঁর বীরত্ব কথা স্মরণ করে রাজা দিলেন নির্বাসনদণ্ড। নির্বাসিত সেনাপতি পাঠকদের মত। 'খবরের কাগজ বাহির' না করে দস্যুদলপতি, হলেন। একদিন শরাঘাতে ছদ্মবেশী রাজকুমারীকে হত্যা করে নিজেও তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। বস্তুত 'দালিয়া' ও 'রীতিমত নভেলে' কৌতূকপ্রবণতাই মুখ্য এবং মুসলিম চরিত্র বা প্রসঙ্গ প্রধানত চমৎকার উৎপাদনের উদ্দেশেই ব্যবহৃত।

কিন্তু পরবর্ত্তী গল্পেই রবীন্দ্রদৃষ্টি গভীরতর পরিণতিমুখীন। 'কাবুলিওয়ালা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম। বহু আলোচিত এ গল্পের বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। সরল ঋজু দৃঢ়স্বভাব রহমত কাবুলিওয়ালা রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি। কাবুলিওয়ালার ব্যবসা, লেখকের কন্যা মিনিকে কেন্দ্র করে, তার অপত্য স্নেহের উৎসরণ; মিনির মায়ের ভীতি, জনৈক ব্যক্তির ঋণ অস্বীকার করার পরিণামে তাকে ছুরিকাঘাত, রহমতের কারাদণ্ড, দীর্ঘকাল পরে মিনির বিবাহের দিনে কারামুক্তি-মাত্র তার আবির্ভাব ইত্যাদি ঘটনা ও বর্ণনার মধ্য দিয়ে রহমতের চরিত্র আশ্চর্য জীবন্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়ে উঠেছে। ফোটো নয়, তৈলচিত্র নয়, ভূষিমাখা হাতের ছাপ—সুদূর বিদেশে কন্যার এইটুকু স্মৃতিমাত্র তার সম্বল! এ পরিচয় লেখককে, 'একজন বাঙালী সম্ভ্রান্ত বংশীয়' ব্যক্তিকে, ও একজন 'কাবুলি মেওয়াওয়ালাকে' একাসনে বসিয়ে দিল; 'বুঝিতে পারিলাম সেও যে আমিও সে, সেও পিতা, আমিও পিতা'। রহমতের সরল পিতৃচরিত্র লেখককে তার প্রতি সহৃদয় ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করল।

'সমস্যাপূরণে'র কাহিনী সামান্য জটিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপিনবিহারীর হাতে ঝিকড়াকোটার জমিদার কৃষ্ণগোপাল সরকার জমিদারীর ভার দিয়ে কাশী গমন করলে, প্রজারা অনুভব করল নবীন জমিদার দুর্বলচিত্ত নয়। অনেক মকদ্দমা-মামলা-হাঙ্গামা-ফেসাদ করে জমিদারীটা প্রায় গুছিয়ে নিলেও 'কেবল মির্জাবিবির পুত্র অছিমদ্দি বিশ্বাস কিচুতেই বাগ মানিল না।' বিপিনের আক্রোশ প্রবল।

"ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্রর একটা অর্থ বোঝা যায়, কিন্তু এই মুসলমান সন্তান যে কি হিসাবে এতটা জমি নিষ্কর ও স্বল্প-করে উপভোগ করে বুঝা যায় না। একটা সামান্য যবন বিধবার ছেলে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে দুই ছত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, কিন্তু আপনার সৌভাগ্যগর্বে সে যেন কাহাকেও গ্রাহ্য করে না!"

মামলা শুরু হল। মির্জাবিবি, অছিম ও বিপিন উভয়ের ধমক খেয়ে নীরব হলেন। উদ্ধত অছিমদ্দি প্রাণপণে অধিকার রক্ষার্থে বদ্ধ পরিকর হল। আপিল আদালতে আংশিক জয় হলেও দেনার দায়ে সকল কিছু তার নীলামে ওঠার উপক্রম করল। এ সময় একদিন হাটের মধ্যে বিপিনকে পেয়ে অছিমদ্দি আক্রমণ করল। হাটের লোক তাকে হাজতে পৌঁছে দিল। বিচারের দিন বিপিনের পিতা কৃষ্ণগোপাল কাশী থেকে কোর্ট প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হলেন। পুত্রকে ডেকে বললেন মামলা তুলে নিয়ে অছিমদ্দিকে সব ফিরিয়ে দিতে। 'মুসলমান সন্তানের জন্য' পিতার এই 'অধ্যবসায়ে'র কারণ জানতে চাইলে কৃষ্ণগোপাল "কম্পিত স্বরে কহিলেন,—

'লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে কর তো বলিয়ো, অছিমদ্দিন তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।'

বিপিন চমকিয়া কহিলেন, যবনীর গর্ভে?'

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, 'হা, বাপু।'

এহেন সংবাদ শুনে বিপিনের শিক্ষা ও চরিত্র আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল।'

আদালতে ফিরে সে ভাবতে চেষ্টা করল "শীর্ণ ক্লিষ্ট শুষ্ক শ্বেত ওষ্ঠাধর দীপ্ত নেত্র... দুই পাহারাওয়ালার হাতে বন্দী... মলিন চির" পরা অছিম তার 'ভ্রাতা'। মকদ্দমা

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকে নিষ্কৃতি ও পূর্বাবস্থা প্রাপ্তি কিভাবে হল অছিমদ্দি তার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পেল না। 'সূক্ষ্মবুদ্ধি উকিল' রামতরণ, কৃষ্ণগোপালের খরচায় যে লেখাপড়া শিখেছিল সে সব বুঝে ফেলল। এবং 'সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট'—কৃষ্ণগোপাল সম্পর্কে সমস্যামুক্ত এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে সে নিজেকে কৃতজ্ঞতার ঋণমুক্ত ভাবল।

"ক্ষুধিত পাষাণে'র পাগলা মেহের আলী ও আচ্ছন্নাবস্থার শাহী অন্দরমহলের দৃশ্য পরস্পর বিরোধী দুই তীব্রতার মধ্যে এক অতিপ্রাকৃত পরিবেশ রচনা করেছে। একদিকে 'কী অসীম ঐশ্বর্য, কি অনন্ত কারাগার' এ ঐশ্বর্যের কারাগারে বন্দী নারী তার নবীন যৌবনের ছন্দে আর বীণানিন্দিত কণ্ঠে মুক্তি প্রার্থনার আকুল আবেদন জানাচ্ছে এবং সে মুহূর্তেই পাগলা মেহের আলী চিৎকার করে উঠছে, "তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়।" প্রমথনাথ বিশী 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতার সমধর্মী চিন্তার পরিচয় পেয়েছেন এ গল্পে। "স্বর্গ যতই রমণীয় হোক তাহার সঙ্গে মানব হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়। ঠিক এই রকম অবস্থা ও অবাস্তবতা ক্ষুধিত পাষাণের প্রসাদের নয় কি? সেখানকার অবাস্তব রমণীয়তা তূলার মাশুলের হাকিমকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, কিন্তু কখনো আপন করিয়া লইবে না। এখানকার সুন্দরী ছায়াময়ীদের লাস্যময় ইঙ্গিতের চেয়ে এই পাগল মেহের আলীর রূঢ় সতর্ক বাণী যে অনেক বেশী সত্য, কারণ সেটা সম্পূর্ণ বাস্তব।"[৪]

আশাহত বদ্রাওনের নবাব-দুহিতার কাহিনী হচ্ছে 'দুরাশা' গল্পটি। প্রমথনাথ বিশী ধর্মের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দ্বন্দ্বের পরিচয় খুঁজেছেন এখানে।[৫] কিন্তু গল্পটির স্বতন্ত্র মূল্যও রয়েছে। এ গল্পে আবার দালিয়া ও রীতিমত নভেলের কৌতুক রসের পুনরাবর্তন ঘটেছে। বদ্রাওন দুহিতা আত্মপরিচয় দিচ্ছেন,—

"আমার পিতৃকুলে দিল্লীর সম্রাট বংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল, সেই কুলগর্ব রক্ষা করিতে গিয়া আমার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য হওয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সহিত আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব আসিয়াছিল, পিতা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময় দাঁতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহি লোকের সহিত সরকার বাহাদুরের লড়াই বাঁধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল।"

'ইংরাজ রচিত আধুনিক শৈল-নগরী দার্জিলিঙে' নবাব-নন্দিনীর কথা শুনে 'মায়াবলে' লেখকের মনশ্চক্ষে' মোগল অন্তঃপুরের দৃশ্য ভেসে উঠল। বর্ণনার কৌতুক-সিক্ত ভঙ্গিটি লক্ষ্যণীয়—

"শ্বেত-প্রস্তর-রচিত বড় বড় অভ্রবেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণঝালর খচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মসলিনের প্রচুর প্রসর জামা, পায়জামা, কোমরবন্ধে চক্র তরবারি, জরীর জুতার অগ্রভাগে বক্রশীর্ষ—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।"

যমুনা তীরবর্তী ভদ্রাওনের কেল্লার 'ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ' কেশরলাল। নবাব-দুহিতা কেশরলালের প্রতি প্রেমমুগ্ধ হলেন কিন্তু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে চিত্ত-সংবাদ প্রদান সম্ভব নয়। তাই—

"আমাদের পূর্ব পুরুষের কেহ একজন একটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আমি অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া তাহারই পুণ্যরক্ত-প্রবাহ আপন শিরার মধ্যে অনুভব করিতাম, এবং সেই রক্তসূত্রে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্য সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে তৃপ্তি বোধ হইত।"

নবাব-নন্দিনী মনে মনে হিন্দু-সংসারের কথা ভাবেন। হিন্দু দাসীদের সঙ্গে ধর্ম, আচার বিষয়ে আলাপ করেন। কিন্তু 'এমন সময় কোম্পানী বাহাদুরের সহিত সিপাহী লোকের লড়াই বাঁধিল।'

"কেশরলাল বলিল, 'এইবার গো-খাদক গোরালোককে আর্যাবর্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর একবার হিন্দুস্থানে হিন্দু-মুসলমানে রাজপদ লইয়া দ্যূতক্রীড়া বসাইতে হইবে।"

কিন্তু 'সাবধানী লোক গোলাম কাদের খাঁ দূরদৃষ্টিতে অনুধাবন করলেন 'হিন্দুস্থানের লোক ইংরেজের সঙ্গে পেরে উঠবে না। সুতরাং কেল্লা খোয়াবার ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। অনমনীয় দেশপ্রেমিক কেশরলালকে সামনে কিছু না বলে গোলাম কাদের খাঁ জেলা কমিশনারকে গোপনে বিদ্রোহের সংবাদ দিলেন। নবাবের এই বিশ্বাসঘাতকতায় নিষ্ফল যুদ্ধে কেশরলাল আহত হলেন; পিতৃকলঙ্কে কাতর নবাব-নন্দিনী 'ভীরু ভ্রাতার' ছদ্মবেশে রাজপুরী ত্যাগ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কেশরলাল মুমূর্ষ অবস্থায়ও যবনীর দেওয়া পানি পান করলেন না। বরং কঠিন প্রত্যাখ্যানে নারী হৃদয় চূর্ণ হল "বেইমানের কন্যা, বিধর্মী! মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি!"

যাহোক কেশরলাল 'তাতিয়াটোপির দলে' মিশে 'সেই বিপ্লবাচ্ছন্ন আকাশতলে' কর্তব্যসাধন করতে লাগলেন। নবাব-নন্দিনী খবরাদি পেলেও সাক্ষাতের কোন সুযোগ ছিল না।

"হিন্দুশাস্ত্রে আছে, জ্ঞানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে, মুসলমান ব্রাহ্মণ হইতে পারে কিনা সে কথার কোন উল্লেখ নাই, তাহার একমাত্র কারণ তখন মুসলমান ছিল না।"

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নবাব-নন্দিনী ব্রাহ্মণ হবার দুরূহ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু "ক্রমে ব্রিটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহবহ্নি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। তখন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাওয়া গেল না।"

দার্জিলিঙয়ে এতকাল পরে অনন্যচিত্ত প্রেমিকা মুসলমান ব্রাহ্মণী নবাব-নন্দিনী আজ কেশরলালের দেখা পেয়েছেন। কিন্তু দেখছেন, "বৃদ্ধ কেশরলাল ভুটিয়াপল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্র-পৌত্রি লইয়া ম্লানবস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।" "আটত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভয়ে বিজাতীয়ের সংশ্রবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে।"—এ সান্ত্বনা-বাক্য আজ নবাব-নন্দিনীর জন্য যথেষ্ট নয়। "এতদিন আমি কি মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম! যে ব্রাহ্মণ আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস, তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত।... হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ। আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।" এবং বিলাপের শেষে নবাব-নন্দিনী প্রথমে 'নমস্কার বাবুজী, বলে যেন সংশোধন করে পুনরায় বলল 'সেলাম বাবু সাহেব!'

লেখক বলছেন, "এই মুসলমান অভিবাদনের দ্বারা সে যেন জীর্ণভিত্তি ধুলিশায়ী ভগ্ন ব্রাহ্মণ্যের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল।"

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে বিদ্রোহের ৩১ বছর পরে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই একটি মাত্র গল্প ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও তাই নানা কারণেই মূল্যবান। কৌতুক রস মিশ্রিত এই কাহিনীতে নবাব-নন্দিনীর চিত্ত বিবর্তন এবং ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে স্বরূপে পুনর্জাগরণ রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য শিল্প-কলাকৌশল মণ্ডিত।

চার

বলাবাহুল্য 'গল্পগুচ্ছে'র রবীন্দ্রনাথ যে অমিত শক্তির অধিকারে অপূর্ব নির্লিপ্তির সিংহাসনে বসে 'গল্পগুচ্ছে'র জগৎ রচনা করেছেন সে শক্তি এ সব গল্পগুলোতেও বিধৃত। 'দালিয়া', 'রীতিমত নভেল' ও 'দুরাশা'র কৌতুক রসের আড়ালে মুসলিম নারীদের চিত্তচাঞ্চল্য ও মুসলিম প্রসঙ্গ; 'কাবুলিওয়ালার' মধুর অপত্যস্নেহ, 'সমস্যাপূরণের' সামাজিক জটিলতা এবং 'ক্ষুধিত পাষাণের' পাগলা মেহের আলির সতর্কবাণী—সব কিছুই রবীন্দ্র-প্রতিভার যাদুস্পর্শে দীপ্ত। লক্ষণীয় যে, ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে (১৮৯১-১৮৯৮) রচিত এই গল্পগুলোতে মুসলিম চরিত্র

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোথাও হীনমানের বা হীন মর্যাদার নয়, উনিশ শতকী হিন্দুজাতীয়তাবাদী লেখকদের মত হিন্দু গৌরব বৃদ্ধির অভিলাষে মুসলমানকে হীনবর্ণে চিত্রিত করার কোন প্রয়াস নেই রবীন্দ্র-মানসে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও উল্লেখ যোগ্য যে, যেমন উনিশ শতকের শেষ দশকের আগে, তেমনি এই দশকটির পরে (স্মর্তব্য যে, ১৩৪০ সন বা ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত কালের গল্প 'গল্পগুচ্ছে'ই আছে) রবীন্দ্রনাথ আর কখনো গল্প-সাহিত্যে মুসলিম প্রসঙ্গের অবতারণা করেননি।[৬] তবু এই সামান্য কয়টি মুসলিম চরিত্র চরিত্রবৈশিষ্ট্যে ও উজ্জ্বলতায় 'গল্পগুচ্ছে'র জনসমুদ্রে হারিয়ে যাবার নয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিতে আঁকা যে কোন রেখাই মূল্যবান, আর তা যদি হয় পূর্ণ ছবি তবে তার অমরত্ব তো প্রশ্নাতীত।

তথ্যনির্দেশ

১. বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, পৃ. ৪৩।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, একত্র প্রচার, ১৯৫৮।

৩. প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, দ্বি-স ১৩৬৪, পৃ. ২।

৪. ঐ, ৩৭। "মেহের আলির 'সব ঝুট হ্যায়' সতর্কবাণীকে রূঢ় বাস্তবের ঘণ্টাধ্বনি বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।"—ঐ, ৩৮, পা. টী।

৫. ঐ, পৃ. ৩৯ দ্রষ্টব্য।

৬. গল্পগুচ্ছের রোমান্সধর্মী নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে মুসলিম জীবন-দর্শনের পর বিভিন্ন প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে সমকালীন রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এ উপমহাদেশের মুসলমানদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বহু আলোচনা করেন। অন্যত্র সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

মূলগ্রন্থ

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, একত্র প্রচার ১৯৫৮

সহায়কগ্রন্থ

বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য, নিউ এজ, কলিকাতা ১৯৫৫
বিশী, প্রমথনাথ, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা দ্বি-স ১৩৬৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলিম সমাজ ও জীবন

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) যে-দেশে জন্মেছিলেন, তা বিচিত্র ধর্মসম্প্রদায়ের হলেও, প্রধানত, হিন্দু-মুসলমান এ দুই ভাগে বিভক্ত। এ দুয়ের কোনোটিই তাঁর উপাসনার ধর্ম ছিল না, তবে হিন্দু সমাজ, জীবন, পুরাণ, ইতিহাস, ঐতিহ্য তাঁর সাহিত্যের বেশির ভাগ স্থান জুড়ে আছে। সচেতনভাবে, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি মুগ্ধ হয়ে তাকে কাব্য-সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন, একথা না-ভাবাই ঠিক, কেননা কার্যকারণ সূত্রে নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। তাঁর সাহিত্যে সমন্বিত হয়েছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন, সুফি চেতনা ও বৌদ্ধ ভাবনা, বাউল দর্শন ও মানবতাবোধ। কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করেন এই বলে যে, রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সমাজকে উপেক্ষা করেছেন, এবং ব্যঙ্গ করেছেন মুসলমান জীবনকে। সুবিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলিম জীবন কেন ব্যাপকভাবে চিত্রিত হয়নি, তার উত্তর যেমন সহজ নয়, যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ এনেছেন, তাঁদের সন্তুষ্ট করাও তেমনি কঠিন।

সংশ্লিষ্টরা জানেন, 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ পুরুষের প্রেমকে জাতি বিশেষের কুক্কুট-প্রীতির সঙ্গে পরিহাস-বঙ্কিম দৃষ্টিতে তুলনা করেছিলেন। একে কোনো মতেই জাতি-বৈরিতা বলা যায় না। তাছাড়া সারা জীবনই তিনি আর্যামির সমালোচনা করেছেন কঠোরভাবে। এই পরিহাস এবং সমালোচনার আড়ালে যে কল্যাণবোধ সক্রিয়, তা-ই তাঁর আসল পরিচয়।

মুসলিম উপাদান তুলনামূলকভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে কম লক্ষ্য করা যায়, এর ঐতিহাসিক এবং বাস্তব কারণ আছে। মধ্যযুগের হিন্দু রচিত বাংলা কাব্যে শব্দ প্রয়োগ এবং প্রসঙ্গ-প্রীতি হিসেবে দ্বিজগিরিবর, মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্রের রচনায় মুসলিম প্রভাব যে কারণে অবশ্যম্ভাবী হয়েছে, উনিশ শতকে মুসলমান সাহিত্যিকের রচনায় হিন্দু চরিত্র ও প্রসঙ্গ প্রাধান্যের কারণও অনেকটা সেইরূপ। রবীন্দ্রনাথ

~ www.amarboi.com ~

নিজেকে হিন্দু-ব্রাহ্ম বলে পরিচয় দিয়েছেন। পুরুষানুক্রমে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্যের কথা তিনি জানতেন, হিন্দু ইতিহাস, পুরাণ এবং ভারতবর্ষের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। জীবনের নানা কাজে এবং সমাজের ননা সম্পর্কে অহর্নিশি যাঁরা তাঁর সামনে রয়েছেন, তাঁদের সিংহভাগ হিন্দু। ধর্ম, সমাজ ও পরিবেশগত প্রভাব সব শিল্পীকেই মানতে হয়।

দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে, সমাজবিবর্তনের প্রবাহে, বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাসে শিল্পীর কাছে সমাজ-মানুষের বিচিত্র দাবি ওঠে। সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব শিল্পীর উপরে অবশ্যম্ভাবী হলেও তাঁর কাছে জাতি বা সম্প্রদায়ের চেয়ে জীবন বড়। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান নায়ক-নায়িকা বা প্রসঙ্গ কবি-সাহিত্যিকের রচনায় গৃহীত হলেও তাঁদের বাণী দেশ-কাল-পাত্র-জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল কালের, সকল দেশের, সকল মানুষের হৃদয়ের কথা হতে পেরেছে কিনা, সেটাই আসল প্রশ্ন।

যেকালে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই তাঁদের রচনায় হিন্দু চরিত্র ও জীবন গ্রহণ করেছেন নির্দ্বিধায়, সেকালে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মুসলমান চরিত্র ও জীবন তাঁর রচনায় গ্রহণ করেছেন, তা অবশ্যই স্মরণীয় ব্যাপার। রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলমান সমাজ এবং জীবনের সামগ্রিক পরিচয় নেই, কিন্তু তার যে পরিচয় আছে, তা মহৎ অনুরাগে বিভূষিত, শ্রদ্ধায় অনুরঞ্জিত, সত্যবোধে দীপ্ত। ইতিহাস প্রসঙ্গে মুসলমান সেনাপতি, রাজকুমারী, রাজপুরুষ চরিত্র অঙ্কনের সময় রবীন্দ্রনাথ মানব চরিত্রের বিশিষ্টতাই অভিক্ষেপিত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি পরিহার করেছেন রঙ্গলাল (১৮২৭-৮৭), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (১৮৪৮-১৯২৫) মত ও পথ। উপন্যাস ও গল্পে মুসলিম ইতিহাস ও জীবন তাঁর সমকালে যেভাবে স্বদেশমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হিন্দু লেখকরা চিত্রিত করছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে ছিলেন ব্যতিক্রম। কবিতায় মুসলিম উপাদান ব্যবহারের সময় তিনি উপলব্ধি করেছেন জীবনের শাশ্বত মহিমা। প্রবন্ধ, অভিভাষণ এবং চিঠিপত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলিম সমস্যার গুরুত্ব দিয়েছেন; সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সমাজের দাবির প্রতি বৃহত্তর সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তাদের অবদানের স্বীকৃতি জানিয়েছেন, রাষ্ট্রনীতি এবং প্রশাসনে তাদের যোগ্যতার বিষয় উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস এবং কিংবদন্তী সূত্রে কবি জীবনকে নতুন রঙে রাঙিয়েছেন। কাব্য-কথাসাহিত্যে জীবনের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা ফুটেছে, প্রবন্ধে মাঝে-মাঝে তার ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'কণ্ঠরোধ' (১৮৯৩) ও 'সুবিচারের অধিকার' (১৮৯৪) প্রবন্ধে কবি মুসলমানদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে কবির বক্তব্যের পটভূমি। মুসলমানরা সর্বদা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। জাতি-বৈরিতা এবং হিংসা-বিদ্বেষ দ্বারা তাঁর সমালোচনা কলঙ্কিত নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলিম রাজা-রাজকুমার-সেনাপতি চরিত্র আছে, আর আছে গৃহভৃত্য, খানসামা, মাঝি ইত্যাদি নিম্নবিত্ত মুসলমান চরিত্র। মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজ তাঁর কাব্য-কথাসাহিত্যে একেবারেই স্থান পায়নি। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে, প্রতিষ্ঠানগত কারণে বহু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। যা নেই তা না-ভেবে যা আছে তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। নিম্নবিত্ত জীবনের প্রতি কবির মনোযোগ অবশ্যি গৌরবজনক। মুসলমান সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি এসব চরিত্র গ্রহণ করেননি।

জীবন রূপায়ণের ভাষাভঙ্গি, শব্দ-সঞ্চয়ন, পরিভাষা ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ কখনোই ঔচিত্যের সীমা লঙ্ঘন করেননি। মুসলিম জীবন রূপায়ণের ক্ষেত্রে কবি বিশেষভাবেই সচেতন ছিলেন। তাদের রাজপুরুষদের নামের আগে 'জনাব', 'জাঁহাপনা', পরে 'সাহেব' ইত্যাদি তিনি 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩), 'মুকুট' (১৮৮৫), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭)-র কালেই ব্যবহার করেছেন। কবি মুসলমানের উপাসনার প্রতিশব্দ হিসেবে 'নামাজ' 'নমাজ', স্রষ্টার প্রতিশব্দ হিসেবে 'আল্লা' ব্যবহার করেছেন। এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের মুসলিম প্রসঙ্গ বিচার এবং মুসলিম উপাদান ব্যবহারের মধ্যে আসলে মানবতার বিজয়-সুরই অনুরণিত হয়েছে। জীবন আচরণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মুসলিম আচার-আচরণের প্রতি মুগ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। মুঘল রীতির প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। সমালোচক বলেছেন

> Indeed it was notable that the Tagores, including the poet, often used near muslim dresses with easy dignity and Rabindranath felt always a certain fascination for Mughal lore as his famous poem Shahjahan and the little story Hungry Stones testfy.[1]

রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলিম উপাদান ব্যবহার এবং রবীন্দ্রচেতনায় তার প্রতিফলনকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়। রবীন্দ্র-জীবন, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের প্রতি দৃষ্টি রেখে নিম্নোক্তভাবে কাল বিভাগ করা চলে

১. ১৮৭৫—১৮৮৭
২. ১৮৯১—১৮৯৯
৩. ১৯০১—১৯১২
৪. ১৯১৪—১৯৪১

Hiren Mukherji, Himself a True Poem: *A Study of Rabindranath Tagore*, Peoples Publishing House Private Ltd., New Delhi, 1961, PP 32-33.

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এক

'হিন্দুমেলার উপহার' (১৮৭৫) কবিতা পাঠ থেকে 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) উপন্যাস প্রকাশ পর্যন্ত, তরুণ বয়সের আবেগে রবীন্দ্র-জীবনে স্বাদেশিকতার অঙ্কুর উদ্গম ও বিকাশের কাল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে বৎসরটি অবিস্মরণীয়---এ সময় থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাক। ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন না। রঙ্গলাল-বঙ্কিমচন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিহাসের পটভূমিকায় স্বাদেশিকতার যে বীজ বপন করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল হিন্দু পুনর্জাগরণ-স্পৃহা এবং যবন-বিদ্বেষ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্রব, হিন্দু মেলায় কবিতা পাঠ, এবং 'কার্বনারি' পদ্ধতির গোপন বৈঠকে উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষার উপলক্ষ কিন্তু প্রচলিত যবন-বিদ্বেষ থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটক প্রকাশিত হয়। নাটকের ঘটনা-সংস্থানে, আলাউদ্দিন যখন চিতোর প্রাসাদে প্রবেশ করছেন, তখন রাজপুত মহিলাদের চিতায় আত্মাহুতির দৃশ্যে, নাট্যকার যে গদ্য বক্তৃতা যোজন করেছিলেন, তাকে রবীন্দ্রনাথ 'জল্ জল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' এই গানে রূপান্তরিত করে দেন।[২] গানের একটি অংশ

শোন্‌রে যবন! শোন্‌রে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালাবি সবে
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

এ-রচনা রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু বক্তব্য তাঁর নয়। বক্তব্য নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের। সুতরাং এ যবন-ভর্ৎসনাও রবীন্দ্রনাথের নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) নাটকে যে মুঘল-বিদ্বেষ আছে, নাট্যকার তাতেও রবীন্দ্রনাথকে অংশীদার করেছেন। ১৮৭৭ সালে ইংলণ্ডের যুবরাজকে সংবর্ধনা দানের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে যে দরবার বসে, তার প্রতি ক্ষোভবশতঃ রবীন্দ্রনাথ 'ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা/যে গায় গাক আমরা গাবনা'[৩] ইত্যাকার একটি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতার 'ব্রিটিশ' শব্দ-স্থানে 'মোগল' শব্দ বসিয়ে তা নাটকে গৃহীত হয় গান হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের একালের কবিতায় অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের গৌরব বর্ণনা আছে, কিন্তু কোনো জাতি-বিদ্বেষ নেই।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি*, কলকাতা ১৩২৬, পৃ. ১৪৭।
যোগেশচন্দ্র বাগল *হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত*, নূতন সংস্করণ, কলকাতা ১৩৭৫, পরিশিষ্ট দ্র.।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসের পটভূমিতে লেখা 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩), 'মুকুট' (১৮১৫) এবং 'রাজর্ষি' (১৮৮৭)-তে মুসলিম প্রসঙ্গ আছে। 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নায়ক প্রতাপাদিত্য। যে-প্রতাপাদিত্যকে বাংলাদেশে জাতীয় বীরের মর্যাদা দেবার চেষ্টা হয়েছিল, তাঁকে রবীন্দ্রনাথ কোনো স্বীকৃতি দেননি। তিনি মনে করেছেন, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মধ্যে ছিল 'অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য'।[৪] উপন্যাসে কবি লিখেছেন, 'ম্লেচ্ছদের দূর' করে 'রাহুর গ্রাস থেকে আর্যধর্মকে মুক্ত করা এবং যবন-মিত্রদের বিনাশ করা' ছিল তাঁর ব্রত। মুক্তিয়ার খাঁকে দিয়ে প্রতাপ বসন্ত রায়কে হত্যা করিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই হিংস্রতার বিরোধী ছিলেন বলেই সমকালীন প্রতাপ-প্রীতির প্রতি ছিলেন বিরূপ। আসলে তাঁর বীরত্বেরও কোনো পরিচয় নেই। কোনো মুঘল সৈন্যকেই তিনি পরাস্ত করতে পারেননি।

'মুকুট' গল্পের ইশা খাঁ চরিত্র রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ সৃষ্টি। ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের সেনাপতি ইশা খাঁ ধর্মপ্রাণ মুসলমান, তাঁর জান ও জবান এক। তিনি রাজকুমারদের অস্ত্রগুরু এবং রাজার বিশ্বস্ত সেনাপতি। যুদ্ধের ময়দানে চরম সঙ্কটকালেও তিনি ধর্মের পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন। চারদিকে যুদ্ধ চলছে, এমন সময় তিনি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পশ্চিমমুখী হয়ে নামাজ পাঠ করেন। চরম বিপদের সময় তিনি সকল বিপদ নিজ স্কন্ধে নিয়ে যুবরাজকে আত্মরক্ষার্থে পালিয়ে যেতে বলেন। যুদ্ধ করতে করতে 'আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ' করে তিনি ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

'রাজর্ষি' উপন্যাসের মুঘল রাজকুমার সুজার করুণ পরিণতির কথা আছে। মুঙ্গেরে আওরঙ্গজেব-পুত্র মহম্মদ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি রাজমহলে ফিরে আসেন। মহম্মদ তাঁকে অনুসরণ করে রাজমহল পর্যন্ত এসে শিবিরে অবস্থান করতে থাকেন। এ সময় সুজার জ্যেষ্ঠা কন্যা গোপনে তাঁকে দূত মারফত জানান, তাঁর সঙ্গে তাঁর যে বাগদান হয়েছিল তা ভুলে কি তিনি রাজমহলে রক্তের স্রোত বহাতে এসেছেন? এ-পত্র প্রাপ্তির পর মহম্মদ পিতৃব্যের শিবিরে যোগদান করে বিবাহকার্য সম্পন্ন করেন। সুজা পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন আওরঙ্গজেবের মুকাবিলার জন্য, কিন্তু তখন তাঁর রাজকোষ শূন্য, প্রজারা করভারে পীড়িত। এমন সময় রঘুপতি দেড় লক্ষ টাকা নজরসহ নবাব দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করে 'গোবিন্দমাণিক্যকে নির্বাসিত করিয়া তাঁহার স্থলে নক্ষত্ররায়কে রাজা করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।'[৫] রঘুপতি আরও প্রস্তাব করে, যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ছত্রিশ হাজার টাকা রেখে যাবে এবং

---

৪ Jadu Nath Sarkar, *History of Bengal*, vol. II, D.U.P 225.
রবীন্দ্র-রচনাবলী ..., বিশ্বভারতী, ... ১৩৭০, পৃ. ৪৪৮।

~ www.amarboi.com ~

নক্ষত্ররায় ত্রিপুরার রাজা হওয়া মাত্র এক বৎসরের খাজনা অগ্রিম পাঠাবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুজা সম্মত হলেন এবং প্রস্তাবিত আদেশ জারি করলেন। মুঘল সৈন্য কর্তৃক বিতাড়িত সুজা নির্বাসিত গোবিন্দমাণিক্যের সাক্ষাৎ পান আরাকানে। সুজা বলেন

> আমিই তোমাকে বিনাপরাধে নির্বাসিত করিয়াছি এবং সে পাপের শাস্তিও পাইয়াছি—আমার ভ্রাতার হিংসা আজ পথে পথে আমার অনুসরণ করিতেছে, আমার রাজ্যে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। ছদ্মবেশে আমি আর থাকিতে পারি না, তোমার কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়া আমি বাঁচিলাম।... মহারাজ, আর সকলেই অতি সহজেই ভাইয়ের মতো ব্যবহার করে, কেবল নিজের ভাই করে না।[৬]

ঘটনা ইতিহাসের, কিন্তু লেখকের এই বক্তব্য চিরন্তন মানব হৃদয়ের অনুভূতিতে সিক্ত। বিপৎকালে দু'টি মানব হৃদয় দুঃখের কথা পরস্পরকে জানিয়েছে। নক্ষত্ররায়ের মৃত্যুর পর গোবিন্দমাণিক্য ফিরে আসেন ত্রিপুরার সিংহাসনে—অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতক আরাকান-পতি সুজাকে হত্যা করে নির্মমভাবে। সুজার জন্য গোবিন্দমাণিক্য দুঃখ করতেন; তাঁর নাম স্মরণীয় করে রাখবার জন্য তিনি কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুজা-মসজিদ। এ উপন্যাসের বিলম্বন মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রাজ্যে নিরাপত্তা বিধানে তৎপর, কিন্তু যখন পাঠানদের পাড়ায় মড়ক আরম্ভ হয়, তখন তিনি তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন—তাদের জন্য পথ্য দান করেন, ঔষধ আনেন এবং গোর দেন তাদের মৃতদেহ। তিনি বলেন 'আমি সন্ন্যাসী, আমার কোনো জাত নাই, আমার জাত মানুষ।'[৭] স্মরণীয় যে, বঙ্কিম-সৃষ্ট সন্ন্যাসীরা ভিন্ন ধাতের। আলোচ্যকালে (১৮৭৫-১৮৮৭) মুসলমান চরিত্র সৃষ্টিতে ও মুসলিম-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সমকালীন হিন্দু লেখকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছেন।

১৮৮৭ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ব্যবহৃত মুসলিম উপাদান মোটামুটি বাংলাদেশ-ভিত্তিক। জীবনবোধের দিক থেকেও একালের সাহিত্য শাশ্বত মূল্যে মহিমাদীপ্ত নয়। লক্ষণীয় যে, 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট', 'মুকুট', 'রাজর্ষি'-র চরিত্রাবলী হয় তাঁর কবি-কল্পনার, নয়তো ইতিহাস বা পাঠ্য জগতের মানুষের, কাছাকাছি-চোখে-দেখা মানুষ এরা নয়।[৮] জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে শিলাইদহে আগমনের পর, ১৮৯০-এর শেষ দিক থেকে, এই সীমাবদ্ধতা কাটতে থাকে। 'দালিয়া' (১৮৯১), 'কাবুলিওয়ালা' (১৮৯২), 'সতী' (১৮৯৭) তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তদেব, পৃ. ৫০০-৫০১

তদেব, পৃ. ৪৮৩।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৭৭, পৃ. ৩০৯।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই

১৮৯১ থেকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্ততঃপক্ষে পাঁচটি কবিতা, আটটি গল্প, এগারোটি প্রবন্ধ এবং 'ছিন্নপত্রে'র একটি পত্র, এই পঁচিশটি রচনায় মুসলিম উপাদান ও প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। মধ্যবঙ্গের পলল মৃত্তিকায় এসে কবি নানা শ্রেণীর সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে পারলেন। তাঁর প্রজাদের বেশির ভাগই ছিল মুসলমান। কবির রচনায় এরা আত্মপ্রকাশ করল। তবে ইতিহাসের উপাদান পাশাপাশি ব্যবহৃত, যেমন 'দালিয়া', 'রীতিমত নভেল', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'দুরাশা' গল্প এবং 'কথা'র পাঁচটি কবিতা।

ভাগ্য বিড়ম্বিত মুঘল রাজকুমার সুজা আরাকান অধিপতির হাতে নিহত হবার পরের ঘটনা নিয়ে লেখা হয়েছে 'দালিয়া' গল্প। সুজার কনিষ্ঠ কন্যা আমিনা নদীস্রোতে ভেসে গিয়ে আশ্রয় লাভ করে এক ধীবরের পর্ণকুটিরে। জ্যেষ্ঠ জুলিখাও আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। সাক্ষাৎ হলে জুলিখা আমিনাকে জানায় যে বিধাতা তাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত। কিন্তু আমিনার হৃদয় ততদিনে মগরাজকুমার দালিয়ার প্রেমে বিভোর—নিষ্ঠুর সংসারের প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে। দিল্লীর সিংহাসনের চেয়ে বৃদ্ধ ধীবরের পর্ণকুটির এবং 'কৈলুতরুচ্ছায়া' তার বেশি ভালো লাগে। মগরাজকুমার আরা মুঘল রাজকুমারীর মধ্যে ধর্মে ও আভিজাত্যে যে প্রভেদ, তা দূর হয়ে গেছে হৃদয়বৃত্তির দাবিতে।

'দালিয়া' গল্প যে বছর লেখা হয়, সেই বছরই (১৮৯১) 'মানসী' কাব্য প্রকাশিত হয় এবং প্রবর্তিত হয় 'সহবাস সম্মতি আইন'। ধর্মীয় পুনর্জাগরণ-মোহে আচ্ছন্ন এবং রক্ষণশীলতায় বদ্ধ হিন্দু সমাজে প্রগতিশীল চেতনা প্রবৃদ্ধ হতে বাধা পায়—সেই সমাজে যুবক-যুবতীর হৃদয় বিনিময় ও সমাজ-বহির্ভূত প্রেম-চিত্র অস্বাভাবিক হতো বলেই কবি এই কাহিনী গ্রহণ করেছেন।

'নাইনটিনথ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় ইংরেজ লেখিকার তুর্কি রমণীদের অবরোধ ও নিগ্রহের বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ এবং জাস্টিস আমীর আলীর প্রতিবাদ-নিবন্ধ পাঠ করে কবির মনে যে প্রতিক্রিয়া জাগে, তারই পরিচয় আছে 'মুসলিম মহিলা' প্রবন্ধে (১৮৯১)। ইংরেজ লেখিকা তাঁর প্রবন্ধে তুর্কিদের নারীর প্রতি অবহেলা প্রসঙ্গে কটাক্ষ করেছিলেন। মধ্যযুগের ইয়োরোপে নারীর যে শোচনীয় অবস্থা ছিল, তার অজস্র উদাহরণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রগতিশীল ব্যবস্থার প্রতি কবি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। প্রসঙ্গতঃ প্রাচ্যদেশে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর 'অধিকার-সীমা' এমনভাবে অতিক্রম করেছে যে আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লজ্জা নিবারণ করতে হয়। (মুসলিম মহিলা; সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮)।[৯] নবী মুহম্মদ (সঃ) এবং মুসলমান সমাজ নারীর যে মর্যাদা দিয়েছেন, সে-সম্পর্কে কবি বলেন

> পূর্বে বহুবিবাহ, দাসীসংসর্গ ও যথেচ্ছ স্ত্রীপরিত্যাগের কোনো বাধা ছিল না; তিনি তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্যপদবীতে আরোপণ করিলেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন, স্ত্রীবর্জন ঈশ্বরের চক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় কার্য। (প্রাচ্য সমাজ; সাধনা, পৌষ ১২৯৮)।[১০]

নবীর সংস্কারক সত্তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেছেন যে, যখন আরবদেশে চরম নৈতিক অধঃপতন বিরাজ করছিল, 'এমন সময়ে মহম্মদের আবির্ভাব হইল। মর্তলোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোক সমাজে একটা হুলস্থূল বাধাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে-সময়ে আরব-সমাজে যে-উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন।' (ঐ)।[১১]

এ সময় রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সচেতনতা আশ্চর্য তীব্রতা লাভ করে। প্রাজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানীর মতো তিনি বলেন, 'মহম্মদ প্রাচীন আরব কুপ্রথা কিয়ৎপরিমাণে দূর করিয়া তাহাদিগকে যেখানে দাঁড় করাইলেন তাহারা সেইখানে দাঁড়াইল, আর নড়িল না।... যেমন পাখি তা' না দিলে ডিম পচিয়া যায়, সেইরূপ কালক্রমে মহাপুরুষের জীবন্ত প্রভাবের উত্তাপ যতই দূরবর্তী হয় ততই আবরণবদ্ধ সমাজের মধ্যে বিকৃতি জন্মিতে থাকে।' (ঐ)।[১২] কবি সামাজিক গতিশীলতায় গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। আধ্যাত্মিকতার নামে রক্ষণশীলতার তিনি তীব্র সমালোচক। 'কালান্তরে; তিনি অনুভব করেছিলেন, হিন্দু-মুসলমান এই দুই প্রাচ্য জাতির মধ্যেই স্থবিরত্ব কাজ করেছে একই ভাবে।

১৮৯২ সালে লিখিত 'রীতিমত নভেল' একটি ছদ্ম-ঐতিহাসিক কাহিনী-নির্ভর গল্প। উনিশ শতকের শেষার্ধে হিন্দু লেখকগণ মধ্যযুগীয় ইতিহাসের মুসলিম প্রসঙ্গ নিয়ে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মহিমা বা আর্য অহমিকা প্রচার করতেন। সম্ভবতঃ তা রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। আলোচ্য গল্পে তিন সহস্র আর্য সেনা দ্বারা তিন লক্ষ যবন সেনা নিধনের হাস্যকর কাহিনী ও

---

৯ *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ১২শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮০, পৃ. ৪৫৬।
তদেব, পৃ. ৪৫৮।
তদেব, পৃ. ৪৫৮।
তদেব, পৃ. ৪৬০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সে-যুদ্ধের সেনাপতির অদ্ভুত আচরণ এবং করুণ পরিণতি চিত্রণ বস্তুতঃ আর্য অহমিকার প্রতি বিদ্রূপ।

'কাবুলিওয়ালা' (১৮৯২) গল্পে মুসলিম উপাদান ব্যবহারের আর এক বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাঙালি পরিবার ও সমাজ সমর্থিত স্নেহের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক জনের হৃদয়-আকুতির মিলন সাধনে অসমর্থ ছিল, এই সত্যটি আফগানিস্তানের মেওয়া-বিক্রেতা রহমতের সঙ্গে মিনি ও তার পরিবারের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কবি উদ্‌ঘাটন করেছেন।[১৩] মহানগরীর কৃত্রিম পরিবেশ থেকে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ ও প্রকৃতির অবারিত সংসর্গে এসে রবীন্দ্রনাথ মানুষে-মানুষে নতুন সম্পর্কের সন্ধান পেলেন। সেখানে মানবধর্ম ভূগোলের সীমা অতিক্রম করে গেলো।

শতাব্দীর শেষ দশকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক তৎপরতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ইংরেজ তার প্রশাসনকে ততই কঠোর করে তুলছিল। হিন্দু-মুসলিম নীতির ক্ষেত্রে ইংরেজ চতুরতার সঙ্গে ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে জাগিয়ে রাখা ইংরেজ শাসনের একটি বৈশিষ্ট্য। ইংরেজের কুশাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষুব্ধ ছিলেন। রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে নতুন সমস্যা দেখা দিলে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে থাকতেন। চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক গৌরহরি সেনের উত্তেজনায় কবি লিখলেন 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ।[১৪]

দেশবাসীর উপর ইংরেজের অত্যাচার-অবিচারে, তাদের কূটনৈতিক ক্রিয়া-কলাপে ও দাম্ভিকতায় তাঁর হৃদয়ে ক্ষোভ জন্মেছিল। তাই বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য সংহতি সৃষ্টি এবং আত্মবিশ্বাস উৎপাদনের দিকে তিনি হয়েছিলেন বিশেষ মনোযোগী। রাজা হিসেবে ইংরেজ ও মুসলমানের মধ্যে তুলনা করে মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তিনি দ্বিধাহীনভাবে বললেন

> মুসলমান রাজা অত্যাচারী ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে সমকক্ষতার সাম্য ছিল। আমাদের দর্শন কাব্য, আমাদের কলাবিদ্যা, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে রাজায়-প্রজায় আদানপ্রদান ছিল। সুতরাং মুসলমান আমাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত, কিন্তু অসম্মান করা তাহার সাধ্য ছিল না। মনে মনে আমাদের আত্মসম্মানের কোনো লাঘব ছিল না, কারণ বাহুবলের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা*, ১ম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ১৩৭২, পৃ. ৩২৯।

পূর্বোক্ত, *রবীন্দ্র*[illegible] খণ্ড, [illegible] ৩৮২।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> কিছুতেই অভিভূত হইতে পারে না। (ইংরাজ ও ভারতবাসী, রচনা--১৩০০, প্রকাশ-সাধনা, আশ্বি-কার্তিক ১৩০৯)।[১৫]

হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের কারণে রবীন্দ্রনাথ কতটা দুঃখিত এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন, তার পরিচয় ও প্রবন্ধে আছে। মুসলমান রাজাদের 'অত্যাচারী' বললেও তিনি তাদের অনেক প্রশংসাই করেছেন। মুসলমানের প্রতি কখনো কখনো বিক্ষুব্ধ হলেও তাদের অনাত্মীয় বলে দূরে সরিয়ে দেবার মনোভাব তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি। 'ইংরাজের আতঙ্ক' শীর্ষক প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য তিনি দায়ী করেছেন ইংরেজকে। তিনি মনে করেন, হিন্দু-মুসলমানকে পৃথক করে রাখা যেন তাদের অলিখিত নীতি। তাঁর ভাষায়

> হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ সম্প্রতি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা গবর্মেণ্টের পলিসি সম্মত না হইতে পারে, কিন্তু গবর্মেণ্টের অন্তর্গত বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরাজ বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুৎকারে এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া দিয়াছে। (ইংরাজের আতঙ্ক; সাধনা, পৌষ ১৩০০)।[১৬]

ইংরেজের দমন-নীতি এবং দেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিধারা লক্ষ্য করে কবি উপলব্ধি করলেন যে ইংরেজ হিন্দুর প্রতি অতিমাত্রায় কঠোর হয়ে উঠেছে এবং মুসলমানের উপর হয়েছে কৃপাপরবশ। 'কন্‌গ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যপথে অগ্রসর হয়' এই আশঙ্কায় ইংরেজ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ধর্মবিদ্বেষ' জাগিয়ে রেখে 'মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু দর্পচূর্ণ' করে 'মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে আভিভূত' করতে প্রয়াসী ছিল। ('সুবিচারের অধিকার' 'রাজা প্রজা')।[১৭] কবি সুবিচারের অধিকার দাবি করতে গিয়ে বলেছেন যে মুসলমানের জন্য 'ইংরাজের স্তনে ক্ষীরসঞ্চার' এবং হিন্দুর জন্য 'পিত্তসঞ্চার' হয়েছে। এবং 'মুসলমান রাজভক্তিভরে অবনতপ্রায়' হয়ে 'কন্‌গ্রেসের উদ্দেশ্যপথে বাধা স্বরূপ' হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মনে এমন ধারণা কেন জাগল? 'ইংরাজের আতঙ্ক' এবং 'সুবিচারের অধিকার' (১৮৯৩-৯৪) রচনাকালে কবি মুসলমানের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক ধূম্রজাল এবং মুসলমানদের কর্মকাণ্ড এজন্য দায়ী। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যকর্মের মধ্যে 'সুবিচারের অধিকার' একটি দুঃখজনক প্রক্ষেপ। তিনি আর কখনো হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখেননি।

---

১৫ *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (রাজা প্রজা) ১০ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১[illegible], [illegible]. ৩৮৮।
তদেব, পৃ. ৫৪০-৫৪১
তদেব, পৃ. ৪১৮[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতকের শেষ দশকে কবি কিছু প্রবন্ধে, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে বিচার করতে প্রয়াস পেয়েছেন, তাতে কিছু অপ্রত্যাশিত বক্তব্য লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তাঁর সমকালীন কবিতা এবং ছোটগল্প তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। 'সমস্যাপূরণ' (১৮৯৩), 'মণিহারা' (১৮৯৮) এবং 'দৃষ্টিদান' (১৮৯৮) গল্পে সামাজিক সমস্যার উপস্থাপন ঘটেছে গভীর শিল্পানুরাগে। 'সমস্যাপূরণে'র অছিমদ্দি জনৈক হিন্দু জমিদারের জারজ সন্তান। এমন ধরনের আখ্যান-পরিকল্পনায় মুসলমান সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগতে পারে, কিন্তু ঘটনার বাস্তবতাকে কি অস্বীকার করা যায়? গল্পের একটি ভিন্ন ব্যাখ্যাও হতে পারে—কবি মুসলমান সমাজকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে এ গল্প লেখেননি, বরং তিনি বলতে চেয়েছেন, ছুঁৎমার্গের ভক্ত যবনবিদ্বেষীরাও এমন অপকর্ম করে, সেই আঘাত যদি লাগে, তবে তা লাগবে তাঁর নিজ সমাজের গায়ে।

'মণিহারা' গল্পের এক স্থানে কবি মাঝির নামাজের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা সশ্রদ্ধ অনুরাগে অনুপম। তিনি বলেছেন

> তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে... বোটের ছাদের উপরে মাঝি নমাজ পড়িতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখায়, সোনার রঙ হইতে ইস্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর-এক আভায় মিলাইয়া আসিতেছিল।[১৮]

উপাসনার নীরব-ভাষা পশ্চিমের আকাশপটে যে-মন ছবির মতো আঁকা পড়তে দেখেছে সে-মন শ্রদ্ধা-সম্মত। রবীন্দ্রনাথ বোটে করে নদীতে ভ্রমণের সময় এমন চিত্র অবশ্যি দেখেছেন। 'দৃষ্টিদান' গল্পে ডাক্তার অবিনাশের স্ত্রী দরিদ্র মুসলমান বৃদ্ধকে অর্থ সাহায্য করে নাতনীর জন্য হরিশ ডাক্তারকে ডাকবার পরামর্শ দিয়েছে, এ ঘটনার মধ্যে মানসিক অনুভূতিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, 'রাজর্ষি' উপন্যাস লেখার পর কবি ইতিহাসের পটভূমি ছেড়ে সমাজ জীবন নিয়ে গল্প লিখতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ সমাজ জীবনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সে কথা সত্য, তবে ইতিহাস-পটভূমি তিনি বিস্মৃত হননি, যেমন—'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৮৯৫) ও 'দুরাশা' (১৮৯৮) গল্প, 'কোট বা চাপকান' প্রবন্ধ এবং 'কথা' (১৮৯৯) কাব্যে ইতিহাসের প্রচুর উপাদান আছে। মুঘল, শিখ, রাজপুত ও মারাঠা ইতিহাস তাঁর রচনায় বিস্তার করেছে দীর্ঘতর ছায়া।

গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৭, পৃ. ৩৯৫।

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পে অতি-প্রাকৃত উপাদান বা সমকালীন সমাজের যে স্পর্শই থাকুক, এর আখ্যান-সংস্থানে আছে ছদ্ম-ঐতিহাসিক আবহ। এতে ফুটে উঠেছে মধ্যযুগের সামন্ত পরিবেশ, শাহী মহলের বিলাস-বৈভব; আড়াইশত বছর আগে শুস্তা নদীতীরে নির্মিত দ্বিতীয় মামুদ শার প্রাসাদের দিব্য পরিচয়

> সেই শীকরশীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া, কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া, তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া, সেতার কোলে, দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।[১৯]

কবির কল্পনানেত্রে ভেসে উঠেছে মধ্যযুগীয় মুসলিম শাহীমহলে ভোগের যে উন্মত্তশিখা প্রজ্জ্বলিত ছিল তারই চিত্তদাহ, এবং প্রস্তরে-প্রস্তরে প্রমূর্ত হয়েছে কামনার অভিশাপ। আরব মরু আর বেদুইন জীবন কবির নিকট জীবনের এক উত্তেজনাময় আহ্বান।

'ক্ষুধিত পাষাণে'র বর্ণনা—নিরাজের সুবর্ণ মদিরা, নূপুরের নিক্কণ, দাসীর চামর দুলানো, বাইরের দ্বারে দণ্ডায়মান যমদূতের মতো হাবশির খোলা তলোয়ার ইত্যাদি আরব্য উপন্যাসের ছবি। সমকালীন একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন 'দামাস্ক, সমর্‌কন্দ্‌, বুখারা—আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, সিরাজের মদ—মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস—পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড়-পরা দোকানি।' (সাজাদপুর, ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪)।[২০] সাজাদপুরের নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে কবির মনে এই সুদূরের স্বপ্ন উঁকি দিত। 'দুরাশা' (১৮৯৮) গল্পেও সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ কল্পনায় রবীন্দ্র-মন উড়ে গিয়েছিল মুঘল যুগে

> শ্বেতপ্রস্তরখচিত বড়ো বড়ো অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণঝালরখচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মস্‌লিনের প্রচুরপ্রসর জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরীর জুতার অগ্রভাগে বক্র শীর্ষ—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।

রবীন্দ্রনাথের উদার মানবতাবোধ উত্তর-শিলাইদপর্বে আরও বলিষ্ঠ রূপ লাভ করে। 'সতী' কাব্যনাটিকা সেই হৃদয়ধর্মের প্রকৃষ্টতম পরিচয়। 'দালিয়া'-য় মুঘলরাজকুমারী মগরাজকুমারের 'প্রেমে আত্মহারা' হয়েছিল, তাকে সে আবদ্ধ করেছিল বিবাহ-বন্ধনে। 'সতী'র অমা মুসলমান ফৌজদার কর্তৃক লুণ্ঠিতা হয়েছিল বিবাহ-বাসর

তদেব, পৃ. ৩১৯।

ছিন্নপত্র, পুনর্মুদ্র[illegible]কাতা ১৩৬৭, পৃ. [illegible]

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকে, কিন্তু সে ফৌজদারকেই বিয়ে করেছে ভালোবেসে। পিতামাতার কোনো নির্দেশ সে পালন করেনি, তার বক্তব্য

> হৃদয় অর্পণ
> করেছিনু বীর পদে। যবন ব্রাহ্মণ
> সে ভেদ কাহার ভেদ। ধর্মের সে নয়
> অন্তরে অন্তর্যামী সেথা জেগে রয়
> সেথায় সমান দোঁহে। (সতী)।[২২]

এখানে কবির মূল বক্তব্য, সমাজের চেয়ে 'হৃদয়ের সত্য ধর্ম নিত্য চিরদিন।' 'সতী'-র আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, এ সময় (১৮৯৭) থেকেই হিন্দু কবির বিশ্বমানুষে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়।[২৩] কিন্তু 'সতী'র বিপরীত 'দালিয়া' গল্পের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া পূর্বেই (১৮৯১) আরম্ভ হয়েছিল বলে মনে করবার একাধিক কারণ আছে। 'দুরাশা' গল্পের আখ্যান 'সতী'র বিপরীত, এর দর্শন আরও তাৎপর্যময়। মুসলমান নবাবনন্দিনী ভালোবেসেছে ব্রাহ্মণ কেশরলালকে। কেশরলাল তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু নবাবজাদী তাকে ভুলতে পারেনি, প্রেমের বেদনায় সে সারাজীবন খুঁজেছে কেশরলালকে। শেষ জীবনে সে দেখেছে ভুটিয়া স্ত্রী ও তার সন্তানদের নিয়ে কেশরলাল ভুট্টা ছাড়াচ্ছে। 'যে নৈষ্ঠিকতার জন্য কেশরলাল নবাবকুমারীর হৃদয় হরণ করেছিল এবং তাকে নিদারুণ আঘাতে প্রত্যাখ্যান করেছিল তা তার প্রকৃত ধর্ম ছিল না, সে ছিল আচার, সে সহজেই তার অভ্যাস পরিবর্তন করেছে',[২৪] কিন্তু নবাবনন্দিনীর ধর্ম তার প্রেম, সে অপরিবর্তনীয়। তাই সে উচ্চারণ করেছে 'হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর-এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর-এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাই।' (দুরাশা)।[২৫]

১৮৯৮ সালে সিডিসন বিলকে কেন্দ্র করে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধে কবি প্রধানতঃ এই বিলের সমালোচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন—ইংরেজ সুযোগমত মুসলমানদের ব্যবহার করছে হিন্দুর বিরুদ্ধে, আবার

রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬২, পৃ. ১০১।

'The process of transformation of Hindu poet into a universal man began as early as 1897 when he wrote his dramatic poem Sati.'—Bimanbehari Majumdar *Heroines of Tagore*, Calcutta 1968, p. 11.

২৪ ডঃ মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া *রবীন্দ্র-ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশচেতনা*, ঢাকা ১৯৭৮, পৃ. ১১০।

গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুসলমানদের সঙ্গে তার আচরণও শোষকের সাধারণ আচরণ থেকে আলাদা নয়। কলকাতার একদল অবিবেচক মুসলমান লৌহ লোষ্ট্র নিয়ে ইংরেজের উপর উপদ্রব করেছিল, এ কারণে তাদের শাস্তি হয়েছিল যথেষ্ট। ইংরাজি সংবাদপত্রগুলো ঘটনাটির ব্যাখ্যা দিয়েছিল এইভাবে যে, কন্‌গ্রেসের সঙ্গে যোগসাজসে এটা 'রাষ্ট্র বিপ্লবের সূচনা।'[২৬] সুতরাং মুসলমানদের বস্তিগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হোক। কবির বক্তব্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইংরাজ ও ইংরাজ-সমর্থকদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ।

মুসলমান সমাজের প্রতি সমবেদনা এবং তাদের কীর্তির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি তাদের শিল্প-সংস্কৃতি-রাজ্যশাসন প্রণালীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। তাঁর মতে সমকালীন ভারতে প্রচলিত অনেক কীর্তিই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনায় সৃষ্ট, মিলিত অবদানে পুষ্ট। যাঁরা চাপকানকে বিজাতীয় বলে কোট ধরেছেন, তাঁদের এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। কবি বলেছেন 'তাহা (চাপকান) ত্যাগ করিয়া যেদিন কালো কুর্তির মধ্যে প্রবেশপূর্বক গলায় টাই বাঁধিলেন, সেদিন আনন্দে এবং গৌরবে এ-তর্ক তোলেন নাই যে, পিতা ও-চাপকানটা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন।'

'কোট বা চাপকান' প্রবন্ধে তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন 'চাপকান' উভয় জাতির মিলিত বস্ত্র। তার বর্তমান রূপের মধ্যে উভয় জাতির সহায়তা রয়েছে। অন্যান্য কীর্তি সম্পর্কেও কবির মতামত কুণ্ঠাহীন

> আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত মুসলমানেরও বটে হিন্দুরও বটে, তাহাতে উভয়জাতীয় গুণীরই হাত আছে; যেমন মুসলমান রাজ্যপ্রণালীতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই স্বাধীন ঐক্য ছিল।
>
> তাহা না হইয়া যায় না। কারণ মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। তাহাদের শিল্পবিলাস ও নীতিপদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই; এবং মুসলমান যেমন বলের দ্বারা ভারতবর্ষকে আপন করিয়া লইয়াছিল, ভারতবর্ষও তেমনই স্বভাবের অমোঘ নিয়মে কেবল আপন বিপুলতা আপন নিগূঢ় প্রাণ-শক্তির দ্বারা মুসলমানকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য-নির্মাণ, দন্তকার্য, নৃত্য, গীত এবং রাজকার্য, মুসলমানের আমলে ইহার কোনোটাই একমাত্র মুসলমান বা হিন্দুর দ্বারা হয় নাই; উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হইয়াছে। তখন ভারতবর্ষের যে একটি বাহ্যাবরণ নির্মিত হইতেছিল, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের ডান হাত ও বাম হাত হইয়া টানা ও পোড়েন বুনিতেছিল। (কোট বা চাপকান)।[২৭]

কণ্ঠরোধ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৪
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়াস পাচ্ছে। তাদের ঐক্য যদি সম্ভব হয়, তবে হিন্দু মুসলমানের মিলনও সম্ভব বলে কবি আশাবাদী। তিনি একান্তভাবে বিশ্বাস করেন, এ দুই জাতির মিলন হবে—ধর্মে না হলেও জনবন্ধনে হবে। ভারতবর্ষীয় জাতিসত্তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কবি বলেন 'যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনো মতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না।' (ঐ, পৃ. ২২৯)। এ দিক থেকে আধুনিক ভারতে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রথম দূত রূপে অভিহিত হবার যোগ্য।

ইতিহাসের গৌরবময় দিনকে স্মরণ করে কবি বলেন—অতীতে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবেই দেশের হিতসাধন করত। তাঁর মতে, মিলনেই কল্যাণ, বিরোধে স্বার্থহানি। মুসলমান শাসনামলে বিজেতা এবং বিজিতদের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য ছিল না। বিজেতারা নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও বিজিতদেরও নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা ছিল। (অপর পক্ষের কথা)।[২৮] সে কারণে বিজিতরা দেশকে তুচ্ছবোধ করত না। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য ছিল। কবি নানাভাবে মুসলমান রাজত্বকালের প্রশংসা এবং মুসলমানের দুঃখ-দুর্দশার জন্য আক্ষেপ করেছেন। ১৩০৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতী-তে নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন

> মুসলমানের রাজত্ব গিয়াছে, অথচ কোথাও তাহার জন্য স্থান শূন্য নাই। ইংরাজ রাজত্বের রেলের বাঁশি, স্টিমারের বাঁশি, কারখানার বাঁশি চারিদিকে বাজিয়া উঠিয়াছে—চারিদিকে অফিস ঘর... কোথাও কোন বিচ্ছেদ নাই। তথাপি নিখিলবাবুর মুর্শিদাবাদ কাহিনী পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এই নতুন কর্ম-কোলাহলময় মহিমা মরীচিকাবৎ নিঃশব্দে অন্তর্হিত, তাহার পাটের কলের বাঁশি নীরব, কেবল আমাদের চতুর্দিকে মুসলমানের পরিত্যক্ত পুরীর প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছে। নিঃশব্দ নহবৎখানা, হস্তীহীন হস্তিশালা, প্রভুশূন্য রাজতক্ত, প্রজাশূন্য আম দরবার, নির্বানদীপ বেগমমহল একটি পরম বিষাদময় বৈরাগময় মহত্ত্বে বিরাজ করিতেছে।[২৯]

রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী এবং সমকালীন অধিকাংশ হিন্দু লেখকই দেশাত্মবোধক অনুরাগ প্রকাশের জন্য হিন্দু ভারতের গৌরব বর্ণনা করতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে মুসলিম রাজত্বের মহিমা, এমন কি ধ্বংসপ্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের প্রতি শ্রদ্ধার আলোক-সম্পাত করেছেন। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—লেখক যেখানে ইতিহাসের

রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৩।

মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫।

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রহস্যযবনিকা উন্মোচন করেছেন সেখানে, 'মোগল-সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ প্রাসাদদ্বারে ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় অত্যন্ত দীনভাবে দণ্ডায়মান। এমন সময়ে সিরাজদ্দৌলা যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং ইংরাজের স্বেচ্ছাচারিতা দমন করিবার জন্য কঠিন শাসন বিস্তার করিলেন। রাজমর্যাদাভিমানী নবাবের সহিত ধনলোলুপ বিদেশী বণিকের দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিল... এই দ্বন্দ্বের হীনতা-মিথ্যাচার প্রতারণার উপরে তাঁহার সাহস ও সরলতা, বীর্য ও ক্ষমা রাজোচিত মহত্ত্বে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। (সিরাজদ্দৌলা; ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫)।[৩০] সেদিনের ইংরেজ রাজত্বে, তাদের অপ্রতিহত প্রতাপের সামনে এমন বাক্য উচ্চারণ সহজসাধ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তা নির্ভয়ে করেছেন। তা ছাড়া হতভাগ্য সিরাজের বিরুদ্ধে সকল নিন্দাকে অতিক্রম করে তাঁর প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তা দেশপ্রিয়দের জন্য এবং জাগরণকামী জাতির জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, বিদেশীদের রাজ্য বিস্তার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বিজিত জাতির লোকেরা খুশি হতে পারে না এবং বিজিত জাতির লেখকরা বিজয়ীদের প্রশংসাও করে না, কিন্তু মুসলমান বিজয়ের কাহিনী রবীন্দ্রনাথ 'আশ্চর্য সংযম ও ন্যায়দর্শিতার' সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।[৩১] শ্রীআবদুল করিম বি. এ. প্রণীত 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৩০৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতীতে কবি বলেন

> ...ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বহুতর খণ্ডবিচ্ছিন্ন জাতি মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচণ্ড আকর্ষণবলে একীভূত হইয়া মুসলমান নামক এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল।... সে সময়ে নূতনসৃষ্ট মুসলমানজাতির বিশ্ববিজয়োদ্দীপ্ত নবীন বল সংবরণ করিবার উপযোগী কোনো একটা উদ্দীপনা ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল না। (মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস)।[৩২]

কবি নিরঙ্কুশ প্রশংসাই করেননি—ইতিহাসের তথ্য ও সত্যের প্রতিও তিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। 'ভয়ঙ্কর কাড়াকড়ি, রক্তপাত' এবং 'এত মহাপাতক' যেমন এ জাতির ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়, 'একত্র আর কোথাও দেখা যায় না'। তবু রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন যে 'এই রক্তস্রোতের ভীষণ আবর্তের' মাঝে 'দয়া দাক্ষিণ্য ধর্মপরতা রত্নরাজির ন্যায়' উৎক্ষিপ্ত হতে দেখা যায়। বিশ্ববিজয়ী মুসলমান জাতির ইতিহাসে যে হিংস্রতা নেই তা নয়। কবি বলেছেন '...মুসলমানদের ইতিহাসে দেখি উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনার সম্মুখে, ক্ষমতালাভ স্বার্থসাধন সিংহাসনপ্রাপ্তির নিকটে স্বাভাবিক

রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৫, পৃ. ৫০০-৫০১।
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী *রবি-পরিক্রমা*, ঢাকা ১৩৬৩, পৃ. ৬৯।
রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৫।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্নেহ দয়া ধর্ম সমস্তই তুচ্ছ হইয়া যায়; ভাই-ভাই, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে বিদ্রোহ বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, রক্তপাত এবং অকথ্য অনৈসর্গিক নির্মমতার প্রার্দুভাব হয়।' (ঐ, পৃ. ৪৯৭)। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক এসব কথা স্বীকার করবেন। ইতিহাস গ্রন্থ সমালোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, তা রীতিমতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঐতিহাসিকের। ইতিহাসের সত্যবোধে উদ্দীপ্ত রবীন্দ্রনাথ মুসলিম ইতিহাস বর্ণনায়—হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিষয়ের আলোচনায় যে সংযম, নিরপেক্ষতা এবং সত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা দুর্লভ।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরাজিত অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা দেশের জন্য, মনুষ্য সমাজের জন্য সমূহ অকল্যাণের ব্যাপার। অথচ এই অবিশ্বাস বেড়ে উঠেছে তুচ্ছ কারণে, প্রতারণায় বা অন্যের উসকানিতে; তাই ইতিহাস থেকে কবি উভয় জাতির মহাপ্রাণ বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করেছেন। ভারতের ইতিহাসের মহাপ্রাণতা ও অভয়বাণী রবীন্দ্রনাথের সাংগঠনিক কল্পনার আলোকে উজ্জ্বল হয়েছে 'কথা' (১৮৯৯) কাব্যে। প্রাত্যহিক জীবনের লাভক্ষতি এ ক্ষেত্রে গণনার বিষয় হয়নি।[৩৩] 'অপমান-বর', 'বন্দী বীর', 'মানী', 'শেষ শিক্ষা' এবং 'হোরিখেলা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই মহৎ সুন্দরের পরিচয় দান করেছেন।

যবন-জোলা সাধক কবীরের খ্যাতিতে প্রতিহিংসা পরায়ণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁর যশ নাশ করবার জন্য এক নষ্ঠ নারীকে পাঠান। কবীর সহাস বদনে তাকে বলেন, 'দীনের ভবনে তোমাকে পাঠাল হরি'। অনুশোচনায় সে-নারী কবীরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কবীর তাকে বললেন, 'ভয় নাই মাতঃ লইব না অপরাধ/এনেছ আমার মাথার ভূষণ অপমান অপবাদ।' এই সহিষ্ণুতা এবং প্রতিবাদের পরোক্ষ নীতি বস্তুতঃ ভারতীয় শান্ত আদর্শের প্রবর্তনা। 'বন্দী বীর' কবিতায় মুঘল-শিখ সংঘর্ষের কথা আছে। অমিত-তেজ মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে শিখ-উত্থান তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু শিখদের শঙ্কাহীন প্রাণদান স্বাধীনতাকামী জাতির জন্য এক চিরন্তন প্রেরণা। কবি বলেছেন

এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ
জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন। (কথা)।[৩৪]

---

[৩৩] কাজী আবদুল ওদুদ *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ* ১ম খণ্ড, কলিকাতা ১৩৬২, পৃ. ৪২১।
[৩৪] *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ৭ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮২, পৃ. ৫৭।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বন্দীকে প্রাণদণ্ড দান বা সাত শত শিখকে হত্যা সম্ভবত কিংবদন্তী। শিখ ও মুঘল এখানে প্রতীক; আসল বক্তব্য, শ্বেতাঙ্গ অত্যাচারের বিরুদ্ধে শঙ্কাহীনভাবে প্রাণদানের প্রস্তুতি। 'মানী' কবিতায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। বীর শত্রু হলেও আওরঙ্গজেব তার মর্যাদা দিতে জানতেন। 'শেষ শিক্ষা' কবিতা অনুতাপ ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে অপরাধ স্খালনের বিরল উদাহরণ। 'হোরিখেলা' পাঠান ও রাজপুত সংঘর্ষের কিংবদন্তী-নির্ভর কাহিনী। উত্তাল রাজনৈতিক তৎপরতা ও মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রতিকূল পরিবেশে 'কথা'-র মুসলিম উপাদানমালায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত করেছেন মানবতা, উদারতা, সহিষ্ণুতা, দেশপ্রেম এবং অহিংস আদর্শ।

তিন

'নকলের নাকাল' (১৯০১) থেকে 'আত্মপরিচয়' (১৯১২) প্রবন্ধ পর্যন্ত অনধিক ১৬টি বিভিন্ন শ্রেণীর রচনায় মুসলিম প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে—শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ক্রমশঃ বাস্তব ও ন্যায়বাদী ভূমিকা পালন করেছেন। ভারতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পটভূমিতে মুসলমানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার সম্পর্কে কবি নতুন নীতি অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। মুসলিম জাতিসত্তার সামগ্রিকতা বিষয়ে ধারণা হয়ে ওঠে সুবলয়িত।

১৩০৮ সালে আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "আলোচনা ('নকলের নাকাল' সম্বন্ধে)" প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, কালে কালে ছোটখাট অনুকরণের বিস্তারে জাতির চেহারা অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। মোগল রাজত্বকালে মুসলমানের অনুকরণ দেশে ব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু একালের ইংরেজিয়ানার নকলের সঙ্গে সেই নকলের গুরুতর প্রভেদ ছিল। এই পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, মুসলমান রাজত্ব ভারতেই প্রতিষ্ঠিত; তার মূল বাইরে ছিল না, সে-কারণে 'মুসলমান ও হিন্দু সভ্যতা পরস্পর জড়িত' হয়েছিল এবং 'পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক আদান-প্রদানের সহস্র পথ ছিল।' এই আদানপ্রদানের সুফল সম্পর্কে কবি বলেছেন

> মুসলমানের সংস্রবে আমাদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলা বেশভূষা আচার-ব্যবহার, দুই পক্ষের যোগে নির্মিত হইয়া উঠিতেছিল। উর্দুভাষার ব্যাকরণগত ভিত্তি ভারতবর্ষীয়, তাহার অভিধান বহুলপরিমাণে পারসিক ও আরবি। আধুনিক হিন্দুসংগীতও এইরূপ। অন্য সমস্ত শিল্পকলা হিন্দু ও মুসলমান কারিকরের রুচি ও নৈপুণ্যে রচিত। [আলোচনা ('নকলের নাকাল' সম্বন্ধে)]।[৩৫]

[৩৫] রবীন্দ্র-রচনাবলী [illegible] পৃ ৪[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'কোট বা চাপকান' প্রবন্ধেও কবি এই আদানপ্রদান-নির্ভর সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে কবি সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে—ভাষা, সঙ্গীত, পোশাক ইত্যাদি ব্যাপারে মুসলিম অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন যে, উর্দুভাষা, চাপকান জাতীয় পোশাক, আধুনিক হিন্দু সঙ্গীত উভয়ের দানেই গঠিত।

সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে জাঁকজমকপূর্ণ দরবার অনুষ্ঠিত হয়, তাতে রবীন্দ্র-মনে যে প্রতিক্রিয়া জাগে, তারই উত্তাপে রচিত 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধ। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে কবি বলেন যে, সাম্রাজ্যের বলপ্রকাশের সময় ভারতীয়দের রাজভক্তির বিপুল ঘোষণা পড়ে, কিন্তু তাদের প্রতি সিকি পয়সার বিশ্বাসও সরকারের নেই। নানা দমনমূলক আইনের দ্বারা সরকার গোটা দেশটাকে নিরস্ত্র করে রেখেছে—একটা হিংস্র পশু তাড়াবারও উপায় নেই। কবি সগর্বে উল্লেখ করেন, মুসলমান আমলে এমনটি ছিল না।

ক. 'মুসলমান সম্রাটের সময় দেশনায়কতা-সেনানায়কতার অধিকার আমরা হারাই নাই; মুসলমান সম্রাট যখন সভাস্থলে সামন্তরাজগণকে পার্শ্বে লইয়া বসিতেন, তখন তাহা শূন্যমার্গ প্রহসনমাত্র ছিল না। যথার্থই রাজারা সম্রাটের সহায় ছিলেন।' (অত্যুক্তি)।[৩৬]

খ. 'দিলদরাজ মোগলসম্রাটের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত। আজ সে দিল নাই, সে দিল্লি নাই, তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে।' (ঐ, পৃ. ৪৪৪)।

গ. 'পূর্বেকার দরবারে সম্রাটেরা যে নিজের প্রতাপ জাহির করিতেন তাহা নহে,... সে-সকল উৎসব বাদশাহ-নবাবদের ঔদার্যের উদ্বেলিত প্রবাহস্বরূপ ছিল। সেই প্রবাহ বদান্যতা বহন করিত, তাহাতে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিত, দীনের অভাব দূর হইত, তাহাতে আশা এবং আনন্দ দূরদূরান্তরে বিকীর্ণ হইয়া যাইত।' (ঐ, পৃ. ৪৪৫)।

কবি সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির দৃষ্টিতে মুসলমান আমলের জীবন-যাত্রার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। মুসলমান আমলে হিন্দুদের ক্ষতি হয়নি, কারণ সে-আমলে ভারতবর্ষের সম্পদ দেশের বাইরে চলে যেত না। দেশের অর্থ দেশেই থাকত। ফলে 'অন্নের সচ্ছলতা ছিল'। সে-আমলের 'বিলাসিতা সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত' হয়নি। (বিলাসের ফাঁস)।[৩৭]

দিল্লীর দরবার, কার্জনের ঘোষণা এবং ব্রিটিশ দমননীতির ফলে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া জাগে, তাই স্বদেশী আন্দোলনের আবেগ তীব্রতর করে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ২য় সং ১৩৪৭, পৃ. ৪৪৪।

রবীন্দ্র-রচনাবলী [illegible] খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দক্ষিণে তিলকের শিবাজী-উৎসব (১৮৯৫), সেখানে দেশকর্মীদের প্রাণদণ্ড-দীপান্তর সমগ্র ভারতবর্ষের আবহাওয়াকে উত্তাল করে তোলে, তার ঢেউ বাংলা দেশেও লেগেছিল। শিবাজীকে স্বাধীনতা ও জাতীয় বীরের প্রতীকরূপে কল্পনা করে অনেক রচনা এবং গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও ১৯০৪/১৩১১ সালে 'শিবাজী উৎসব' কবিতা রচনা করেছিলেন। এ কবিতায় 'এক ধর্মরাজ্যপাশে' ভারতকে বেঁধে দেবার শিবাজী-সংকল্প,[৩৮] কবির যত আবেগ-প্রসূত প্রক্ষেপই হোক, বহু বিচিত্র ধর্মের দেশ ভারতবর্ষের আবেগকে তা আহত করেছিল। বিশেষ করে মুসলমানদের আপত্তি অস্বাভাবিক ছিল না। ধর্মের ভীতি তাদের মনে বিশেষভাবেই জেগেছিল। কবিতাটির মূল বক্তব্য সম্ভবত পরে কবিকে পীড়িত করেছিল। তাই বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীতে তা গৃহীত হয়নি। পরবর্তীকালে তাঁর মতামত হয়ে উঠেছে মুসলিম জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের পরিপোষক।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫) এবং রাখি-উৎসব কালে রবীন্দ্রনাথ উভয় জাতির মিলন কামনা করেছিলেন আন্তরিকভাবে। 'বিজয়া' ধরনের উৎসবকে সামাজিক উৎসবে পরিণত করবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। বিজয়া সম্মিলনীর ভাষণে কবি বলেছিলেন 'যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো—যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। (বিজয়া-সম্মিলন; কার্তিক ১৩১২)।'[৩৯] এক ধর্মরাজ্যপাশে ভারতকে বেঁধে দেবার এ স্বপ্ন নয়, বরং হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবোধ এখানে সক্রিয়।

'চরিত্রপূজা' গ্রন্থের 'মহাপুরুষ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মহাপুরুষরা ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে যান, আমরা ধর্মটা বাদ দিয়ে সম্প্রদায়টা গ্রহণ করি।[৪০] এই সম্প্রদায়-চেতনা বা সাম্প্রদায়িকতা প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজের পুরাতন ব্যাধি। এর প্রতিকার বড় কঠিন। লোকে সাম্প্রদায়িকতাকে মুখে স্বীকার করে না, কিন্তু মনে পোষণ করে। এ দেশে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধ মধুর নয়, এর কারণ নাকি ইংরেজ—মুসলমানকে তারাই নাকি হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন 'শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধে

'হে রাজা শিবাজী/তব ভালে উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ/... এসেছিলে নামি/... এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত/... বেঁধে দিব আমি।'—*রবীন্দ্র-রচনাবলী* ৩য় খণ্ড, জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা ১৩৬৮, পৃ. ৯১৭।

রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, [illegible], পৃ. [illegible]

তদেব, পৃ. ৫৩৬।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাবধান হইতে হইবে।' ('ব্যাধি ও প্রতিকার'; প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৪)।[৪১] হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধ নিয়ে একটা পাপ আছে। এ পাপের ফল ভোগ না করে নিষ্কৃতি নেই। যাঁরা হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রয়াসী, তাঁরা বিশেষ উদ্দেশ্যে অকস্মাৎ মিলনের উদ্যোগ নেন—আসল সত্যটা স্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাথই প্রথম স্বীকার করলেন, বস্তুতঃ আবিষ্কার করলেন, 'হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।... বহু বৎসর একত্র বাস করিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই।' (ঐ)।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা-ব্যাধির কারণ কবির নিকট এখন সুস্পষ্ট হয়েছে, তাই নিরাময় বিধানও তিনি দিতে পারবেন। এবারে তিনি ক্ষোভ ছেড়ে পক্ষপাতহীন আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কাজের ব্যাঘাত দূর করবার জন্য কোনোমতে মিলন সাধন করে বল লাভ করব, একথা বড় সত্য নয়।

১৩১৪/১৯০৭ সনে কংগ্রেসের পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণে কবি নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেন। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে মুসলমানের অসহযোগিতায় তিনি ব্যথিত হলেও এই অসহযোগিতার যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করলেন। তিনি বললেন, হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদকে বাইরে থেকে বিরোধে পরিণত করবার চেষ্টা করলে আমরা ভীত হব না—নিজের ভিতরে যে পাপ আছে তাকে নিরস্ত করতে পারলে পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করা যাবে। হিন্দু সমাজ যে মুসলমানের উপর অন্যায় করেছে, তা তিনি স্পষ্ট করে বললেন

> আমরা ইংরেজের ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্ত করিয়াছি বলিয়া গবর্মেণ্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে।... যে রাজপ্রসাদ এত দিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুরপরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি। (সভাপতির অভিভাষণ)।[৪২]

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণার অনেক কারণ সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি জানতেন—বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু মুসলমানে বসে না, মুসলমান ঘরে এলে জাজিমের একাংশ তুলে দেওয়া হয়, ফেলে দেওয়া হয় হুঁকার জল। তর্কের বেলায় তারা বলে, 'শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো

---

৪১ *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত ...।

৪২ তদেব, পৃ. ৫০১

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিধান দেখি না, যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ প্রতিষ্ঠা স্বরাজের স্বজাতি কোনো দিনই হইবে না।' ('ব্যাধি ও প্রতিকার')।

বঙ্গভঙ্গের কালে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মর্মান্তিক রূপে বীভৎস হয়ে উঠেছিল। ১৯০৮ সালে 'সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি উভয় জাতির পৃথক সত্তার কথা জোর দিয়ে বললেন। সমস্যাকে ধামা-চাপা না দিয়ে নিরপেক্ষ বিচার করে উচ্চারণ করলেন 'আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতেই যাই-না কেন, এই বাস্তবটি আমাদিগকে কখনোই বিস্মৃত হইবে না।' ('সমস্যা' 'রাজা প্রজা')।[৪৩] মুসলমান এ দেশে আসবার পর পুরুষানুক্রমে 'জন্মিয়া এবং মরিয়া' এ দেশের মাটিকে আপন করে নিয়েছে। ('পূর্ব ও পশ্চিম')।[৪৪] তাই ক্ষীণপক্ষকে জোরের দ্বারা নিজের 'মতশৃঙ্খলে দাসের মতো আবদ্ধ' ('সদুপায়')[৪৫] করবার প্রয়াসের মতোই ইষ্টহানি আর কিছুতেই হতে পারে না।

বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি ভেদ রয়ে গেছে। রাজা যদি সেই ভেদটাকে বড় করে তোলে এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করে রাখে তবে কালক্রমে হিন্দু-মুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষের তীব্রতা বেড়ে চলবে। (ঐ)। মুসলমান পক্ষ থেকে দাবি ছিল এবং সরকারের ইচ্ছার কারণে ১৯০১ সালে 'মর্লি-মিন্টো রিফর্ম' প্রবর্তিত হলো এবং মুসলমানরা লাভ করল পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা।[৪৬] অতঃপর বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের বাধা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ব্যবস্থা ব্যাপকতা লাভ করে। কবি এবং কোনো কোনো মহল না চাইলেও স্বাতন্ত্র্য রেখাটি প্রবল হয়ে ওঠে।

বাইরের সংঘাত—মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, হিন্দু-মুসলিম সংঘাত, মর্লি মিন্টো রিফর্ম কবির মনের মিলনের ভাবনাকে আহত করেছে। মুধু হিন্দু-মুসলমান মিলন ইচ্ছাতেই তাঁর ব্রত শেষ হয় না। তিনি মনে করেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু হিন্দু-মুসলমানের নয়, এতে ইংরেজেরও একটা অর্থপূর্ণ স্থান আছে। ('পূর্ব ও পশ্চিম')।[৪৭] বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং মুহম্মদকে তিনি মানুষের ধর্মরাজ্যে সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণকারী বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। ('ভক্ত')।[৪৮] এ সময় কবি-মন

---

[৪৩] তদেব, পৃ. ৪৮১।

রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১।

[৪৫] প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৫; সমূহ *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৮।

V D. Mahajan *Constitutional History of India*, 5th ed. Delhi 1962, p. 7.

রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪।

রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৭৬, পৃ. ৪৯২। দ্রঃ তপোবন, ঐ, পৃ. ৪৭৭।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তপোবনের শান্ত প্রকৃতি এবং আধ্যাত্মিক ভাবনায় বিশেষ ভাবে অভিভূত ছিল। তবে 'দেশের সমস্যার কথা তিনি ভুলতে পারছেন না,' তাই লিখছেন 'ভারত তীর্থে'র মতো কবিতা; 'তপোবন' ও 'ভক্ত' প্রবন্ধ, 'আত্মপরিচয়', 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' ইত্যাদি, "হিন্দু ধর্ম ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে বিশ্বজননীন আদর্শ অনুসন্ধান করলেন।" ('রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা')।[৪৯]

'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসের নায়ক বলেছে, 'আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই।'[৫০] এক বছর পরে, ১৯১১ সালে, 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে তিনি বললেন, ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে যখন রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেতনার উদ্রেক হলো, তখন মুসলমানদেরও এক করে নেবার ইচ্ছা জাগল, কিন্তু সেক্ষেত্রে কৃতকার্য হওয়া গেলো না। কারণ

> হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই।... আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। ('হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়')।[৫১]

হিন্দু মুসলমানের মিলন এবং ভারতীয় জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবির নিজস্ব বক্তব্য আছে—তিনি ব্রাহ্মদের যখন হিন্দু-ব্রাহ্ম বলেন, তখন তাদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ দেশের খ্রিস্টানকেও তিনি হিন্দু খ্রিস্টান বলে অভিহিত করার পক্ষপাতি। একই ভাবে এদেশীয় মুসলমানকেও তিনি 'হিন্দু-মুসলমান' বলতে চান। এ প্রসঙ্গে তাঁর থিয়োরি হলো—'মুসলমান একটি ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে, হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।' চীন পারস্য আফ্রিকার মুসলমান স্থূলত মুসলমান বলেই পরিচিত। সূক্ষ্মভাবে দেখলে, বোঝা যাবে, অনেক বিষয়ে চীনের স্বজাতি কনফ্যুসীয়দের সঙ্গে চীনা মুসলমানদের মিল আছে, পুরাতন জাতিগত বিশেষত্বের মধ্যে পড়ে তা বৈচিত্র্য লাভ করেছে। কবি মনে করেন, ভারতবর্ষেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না।

---

৪৯ আনিসুজ্জামান *রবীন্দ্রনাথ*, ঢাকা ১৩৭৫, পৃ. ৫৪৫।

রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮২, পৃ. ৫৭১।

পরিচয় *রবীন্দ্র-রচনাবলী* ১৮শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৭৬, পৃ. ৪৭৪।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চার

গীতাঞ্জলি পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন এবং ১৯১৪-১৯৪১ পর্যায়ে মুসলিম প্রসঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী ধারণা অনুবর্তিত হয়েছে স্থিতধি প্রজ্ঞায়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের কথা আছে, তবে তা নিয়ে তিনি কারো সেনটিমেণ্টে আঘাত লাগে, এমন কথা বলেননি। সমস্ত ক্ষোভকে নির্বাসন দিয়ে প্রশান্তি, অধ্যাত্মচেতনা আর দার্শনিক জিজ্ঞাসায় তিনি একদিকে নিমগ্ন হয়েছেন, অন্যদিকে সারা বিশ্বের মানুষের কল্যাণ-ভাবনায় তিনি নব নব বাণী বন্দনা করেছেন।

'বলাকা'-র 'শাজাহান' (সবুজপত্র; অগ্রহায়ণ ১৩২১/১৯১৪) এবং 'তাজমহল' কবিতায় চিরন্তন মানব হৃদয়ের প্রেমের ও বেদনার বাণী সম্রাট শাজাহানের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে উৎসারিত হয়েছে। 'হায়রে হৃদয়! তোমার সঞ্চয়/দিনান্তে পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়'—'শাজাহান' কবিতায় জীবনের এই অনিত্যতা এবং 'তাজমহল' কবিতায় প্রেমের নিত্যতা—অনিন্দ্য বাণীমূর্তি লাভ করেছে। কবিতা দু'টি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় মহিমায় দীপ্ত।

'কালান্তর'-এর প্রবন্ধাবলী (১৯১৪-৩৭)-তে রাজা-প্রজা, সমূহ-এর বক্তব্য নতুন ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় জীবনে বিড়ম্বনার প্রধান কারণ একদিকে ইংরেজের উগ্র মূর্তি, অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।

'লোকহিত' (১৩২১) প্রবন্ধে কবি তাঁর পুরনো ধারণাতেই অনুবর্তন করলেন। স্বদেশী অভিযানের সময় একজন স্বদেশী এক গ্লাস জল খাবার জন্য মুসলমান স্বদেশী সহকর্মীকে দাওয়া থেকে নেমে যেতে বলতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করতেন না। সেই বে-আব্রু পার্থক্যের মূলে রয়েছে ধর্ম। 'ছোটো ও বড়ো' (১৩২৪) প্রবন্ধে কবি বলেছেন

> একথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানে শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয় এমন আর-কিছুই হয় না। ('ছোটো ও বড়ো')।[৫২]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপারে শাস্ত্রমত-প্রধান আচার-সর্বস্ব ধর্মের দুঃখজনক ভূমিকার বিষয়ে কবি বলেছেন

---

[৫২] *কালান্তর*, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮২, [illegible]৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশু হত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায়, এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্ম-মতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনোকালেই মিটিতে পারে না। (ঐ)।[৫৩]

১৩২১ সালে প্রকাশিত 'সমস্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমান সমস্যাকে দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯২৭ সালে একই শীর্ষে লিখিত প্রবন্ধে সেই দুরপনেয় কথাই বলেছেন। তিনি মনে করেন, আপন আপন ধর্মের দ্বারা দু'পক্ষই সীমা নির্দেশ করে দিয়েছেন। শুধু ভারতবর্ষ নয়, ধর্ম মানব-বিশ্বকেই সাদা-কালোয় বিভক্ত করেছে।[৫৪] হিন্দু মুসলমান উভয়েই নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় দেয়। ধর্ম দিয়েই তারা জগতের অন্য সবাইকে দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এ-সব থেকে রবীন্দ্রনাথকে মনে হয় ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী। 'শ্রদ্ধানন্দ' হত্যা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা প্রসঙ্গে তাঁর কিছু কিছু মন্তব্যের ভিন্নমত ব্যাখ্যা দেবার অবকাশ আছে। অবশ্যি উদারতার কারণেই হিন্দু মহাসভা গঠনে (১৯২৩) তিনি পরোক্ষ সমর্থন জানিয়েছিলেন[৫৫] এবং দেশ-বন্ধুর স্বরাজ্য দল (১৯২৩) গঠনের তিনি বিরোধিতা করেননি। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রশ্নে তিনি সর্বদাই বিরোধী মনোভাব পোষণ করেছেন। ১৯৩২ সালে দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হলে তিনি মদনমোহন মালব্যকে তার বার্তায় জানান

> You will know that I have always disapproved the Communal award. I hope, our leaders will join their forces to save from its paralysing grip the political integrity of the nation.[৫৬]

১৯৩৬ সালে ভারত-সংস্কার আইন বিরোধী যে সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে হিন্দু বা মুসলমান কারো পক্ষে বক্তব্য পেশ করতে তিনি নারাজ ছিলেন, কিন্তু মুসলিম প্রসঙ্গটি তাঁর ভাষণে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। কবি বলেন

> মুসলমান সম্প্রদায় তাহাদের সংখ্যাগুরুত্বের সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হউক ইহা আমরা চাহি না, তবে ভবিষ্যতে পারস্পরিক সহযোগিতার সমস্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হউক ইহাও কাহারো পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে।[৫৭]

---

৫৩ তদেব, পৃ. ৮৬।
৫৪ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় *রবীন্দ্র-জীবনী* ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ বিশ্বভারতী ১৩৫৯, পৃ. ১১৪।
৫৫ তদেব, ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৩৭১, পৃ. ৬৮।
তদেব, পৃ. ৬৯-৭০।
৫৭ তদেব, পৃ. ১১০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ সভায় রবীন্দ্রনাথ ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা 'ধর্ম তথা সম্প্রদায় নিরপেক্ষ' হোক এটাই চেয়েছিলেন। তাঁর এ ভাষণের বক্তব্য অনেকটা ১৯০৭ সালের পাবনা কন্‌ফারেন্সের ভাষণের মর্মবাণী। ১৯৩৭ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' কবিতাকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত রূপে গ্রহণের আলোচনা কালে তিনি জওহরলাল নেহরুকে যে চিঠি লেখেন, তাতে কবিতার প্রথম দুই স্তবক জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণের পক্ষে অভিমত দান করেন। গানটি সম্পর্কে মুসলমানদের অনেক আপত্তি ছিল, কিন্তু কবি বলেন, উপন্যাসের কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ গানটি মুসলিম মনে আঘাত করতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে প্রথম স্তবক দু'টি তা করবে, এমন কথা নেই।[৫৮]

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে কবির নানা কর্মকাণ্ড মুসলমান সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। তাঁর মনে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থাই শুধু প্রাধান্য পায়নি, তিনি হয়ে উঠেছেন উদার মানবতাবাদী—বাতায়নিকের পত্র, সমস্যা, হিন্দুমুসলমান ('শান্তিনিকেতন' ও 'কালান্তর'), 'স্বরাজসাধন', 'কালান্তর' ইত্যাদি প্রবন্ধে, 'রাজা প্রজা', 'সমূহ', 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়', পাবনা সম্মিলনীর ভাষণ ইত্যাদির বক্তব্য অভিজ্ঞতারসে জারিত হয়ে আরও বাস্তব হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সমাজতাত্ত্বিক চেতনা ও মানবতাবাদী দৃষ্টি বলিষ্ঠ রূপ ধারণ করেছে। মুসলমান সমাজের জন্য তিনি যা করতে পারেননি, তা অন্যভাবে অন্য কারো দ্বারা হোক, এই ছিল তাঁর আকুতি। মৃত্যুর এক বছর আগে, যখন দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তখন অধ্যাপক আবুল ফজলকে লিখেছেন, 'আধুনিক মুসলমান সমাজের সমস্যা ঐ সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই জানতে হবে—এর প্রয়োজন আমি বিশেষ করেই অনুভব করি। আপনাদের মতো লেখকদের হাত থেকে এই অভাব যথেষ্টভাবে পূর্ণ হতে থাকবে।'[৫৯] নজরুল ইসলামকে গ্রন্থ উৎসর্গ করে (১৯২৩), জসীমউদ্‌দীনকে উপন্যাসের প্লট (বোবাকাহিনী) দিয়ে, বন্দে আলী মিয়াকে প্রশংসাপত্র দিয়ে, শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল উৎসবে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবস্থা করে, শান্তিনিকেতনে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষকদের এনে, বিশ্বভারতীতে 'নিজাম-বক্তৃতা'র ব্যবস্থা করে, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহম্মদ হাবিব, পারস্য ভাষা ও সংস্কৃতির ইরানী অধ্যাপক আগাপুরে দাউদ (১৯৩৩), মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের প্রখ্যাত সহযোগী কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতিকে এনে একদিকে তিনি মুসলমান সমাজকে জানবার আকুলতা প্রকাশ করেছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা

---

[৫৮] আবুল ফজল *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ*, ঢাকা ১৯৭৯, পৃ. ৩৫।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় *রবীন্দ্র-জীবনী* ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পরি-সং ১৩৭১, পৃ. ১৬১-১৬২।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ করেছেন, উৎসাহিত করেছেন; অন্যদিকে দেশ-বিদেশের মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে, জ্ঞানের বিকাশ ও সংস্কৃতির প্রবৃদ্ধি সাধনে নিরন্তর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

মুসলিম প্রতিভার পরিচর্যায় এবং তাঁদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে তাঁর প্রয়াস ইতিহাস অমর হয়ে থাকবে। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি যখন বয়সের ভারে এবং রোগে ক্লান্ত-অশক্ত, তখনও মুসলমান সমাজের কথা নিরন্তর ভেবেছেন, অসুস্থ অবস্থাতেও মুসলমান ছাত্রদের জন্য আন্তরিক বাণী দিয়েছেন।

১৯৩৮ সালের ১৮ই অক্টোবর কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু-সংবাদে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ করা হয়। এবং আয়োজন করা হয় একটি শোকসভার। কবি এ সভায় উপস্থিত হয়ে ভাষণ দান করেন। নবীন তুরস্কের আত্মগৌরব-দৃষ্টে এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অংশের মানুষ তাদের স্বাধীনতা পথে অনুপ্রাণিত হবে বলে তিনি আশা পোষণ করেন। কামালের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন

> তিনি তুর্কীকে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছেন সেইটেই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়, তিনি তুর্কীকে তার আত্মনিহিত বিপন্নতা থেকে মুক্ত করেছেন। মুসলমান ধর্মের প্রচণ্ড আবেগের আবর্ত-মধ্যে দাঁড়িয়ে ধর্মের অন্ধতাকে প্রবলভাবে তিনি অস্বীকার করেছেন। যে অন্ধতা ধর্মেরই সবচেয়ে বড়ো শত্রু, তাকে পরাভূত করে তিনি কী করে অক্ষত ছিলেন, আমরা আশ্চর্য হয়ে তাই ভাবি।[৬০]

এইভাবে নানা প্রসঙ্গে কবি মুসলমান সমাজ-জীবন ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে মুসলমান সমাজও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম বিশ্বভারতীকে দান করেছিলেন এক লক্ষ টাকা। নিজাম-অধ্যাপকের বাসগৃহ নির্মাণের জন্যও তিনি দান করেছিলেন আরও উনিশ হাজার টাকা। মুসলমান প্রভাবাধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করে। মুসলিম কর্তৃত্বাধীন ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে একই উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছিল। পারস্য, ইরাক এবং মিশর ভ্রমণকালে কবি অজস্রভাবে সংবর্ধনা লাভ করেন। মিশরের রাজা ফুয়াদ বিশ্বভারতীকে উপহার দিয়েছিলেন বহু আরবি গ্রন্থ (১৯২৩), ইরানের শাহ নিজ খরচে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক প্রেরণ করেন। ১৯৩৭ সালে শেষবার যখন তিনি পতিসর যান, তখন 'সম্প্রদায়িক দুর্দিনে' কবি 'মুসলমানবহুল প্রজামণ্ডলের যে সংবর্ধনা' লাভ করেন, তা নাকি চোখে না দেখলে 'বোঝা খুবই শক্ত'। সে সময়ে মোঃ কফিল উদ্দীন আকন্দ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ করেন, তার অংশ বিশেষ

তদেব, পৃ. ১০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রভুরূপে হেথা আস নাই তুমি দেবরূপে এসে দিলে দেখা,
দেবতার দান অক্ষয় হউক হৃদিপটে থাক স্মৃতিরেখা।[৬১]

হিন্দু-প্রধান শিলাইদহে কবি যে কার্যসূচী বাস্তবায়িত করতে পারেননি, মুসলমান-প্রধান পতিসরে সেই গ্রামোন্নয়ন কার্যসূচী সফল হয়। তাই মনে হয়, কবির সঙ্গে মুসলমান সমাজের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এ বছরে ৬ মার্চ মুসলিম স্টুডেন্ট্স্ ফেডারেশন-এর একটি দল শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সে-সময় কবি অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু তাঁদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করেন এবং একটি কবিতা লিখে তাঁদের উপহার দেন

আমার আত্মার মাঝে ঘন হলো কাঁটার বেড়া এ
কখন সহসা রাতারাতি
স্বদেশের অশ্রুজলে তারেই কি তুলিব বাড়ায়ে
ওরে মূঢ় ওরে আত্মঘাতী!
ওই সর্বনাশটাকে ধর্মের দামেতে করো দামী
ঈশ্বরের করো অপমান
আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন শয়তান!
ও কাঁটা দলিতে গেলে দুই দিকে ধর্ম-ধ্বজী দলে
ধিক্কারিবে। তাহে ভয় নাই,
এ পাপ আড়ালখানা উপাড়ি ফেলিব ধূলিতলে
জানিব আমরা দোঁহে ভাই।

আত্মার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে কাঁটাগাছ জমেছে, তাকে উৎপাটন করতে হবে এবং নির্ভীকভাবে উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরকে ভাই বলে গ্রহণ করতে হবে, কবি এ কবিতায় সেই আশা লালন করেছেন।

জীবনের শেষ প্রহরের রচনা 'তিনসঙ্গী'-র গল্পাবলী ও 'মুসলমানীর গল্পে' মুসলিম প্রসঙ্গের যে অবতারণা আছে, তা চিরন্তন মানবতা ও মুক্তবুদ্ধির অভাবনীয় পরিচয় সমৃদ্ধ।

'রবিবার'-এর অভীক বার্ন্-কোম্পানীতে কাজ করবার সময় মুসলমানের সঙ্গে খেতো। লোকে যখন এ নিয়ে সমালোচনা করত, সে তখন ভাবত, 'মুসলমান কি নাস্তিকের চেয়েও বড়ো?'[৬২] এই ছোট্ট মন্তব্যটি সমকালীন হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের

তদেব, পৃ. ১০২।
গল্পগুচ্ছ. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮৫।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পরিচয় বহন করে। 'ল্যাবরেটরি' গল্পে সোহিনী মোবারক খানসামাকে দিয়ে রেবতী ভট্টাচার্যকে চা দিয়েছে—'এটা ওকে পরীক্ষার জন্য'। রেবতী মানুষকে মানুষ বলে গ্রহণ করতে পারছে কি না, এটাই সে-পরীক্ষার উদ্দেশ্য।

মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসাই যে প্রকৃত ধর্ম, 'মুসলমানীর গল্প' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিয়ের দিনে দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিতা কমলা নিজ সমাজে ছুঁৎমার্গের বলি হয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু সে আশ্রয় পেয়েছে পাঠান খাঁর গৃহে। কমলা মুসলমান হয়ে মেহেরজান নাম নিয়ে সেখানে লাভ করেছে জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা। সে বলেছে 'যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পূজো করি, তিনিই আমার দেবতা—তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন।'[৬৩] দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে এমন বক্তব্য উচ্চারণ একদিকে সাংঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ, অন্যদিকে অভাবিত গৌরবজনক।

[৬৩] তদেব, পৃ. ৮৮৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংকলিত রচনার সূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান-সমাজ কাজী আবদুল ওদুদ ['শাশ্বত বঙ্গ'। কলকাতা, ১৩৫৮]

২. ক. মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ ও রবীন্দ্রনাথ। খ. রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ আবুল ফজল ['রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ'। ঢাকা, জুলাই ১৯৭৯]

৩. ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ অমিতাভ চৌধুরী ['ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য প্রসঙ্গ'। কলকাতা, মাঘ ১৪০০]

৪. রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ একটি ভূমিকা আনিসুজ্জামান ['রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ' ভূঁইয়া ইকবাল। ঢাকা, বৈশাখ ১৪১৭]

৫. রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ খোন্দকার সিরাজুল হক ['দ্য চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব্ আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ', রবীন্দ্র-সার্ধশত জন্মবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা, ২৫ বৈশাখ ১৪১৮/৮ মে ২০১১]

৬. রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ আসাদ চৌধুরী ['কোন্ অলকার ফুল'। ঢাকা, বৈশাখ ১৩৮৯ / মে ১৯৮২]

৭. রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ ভূঁইয়া ইকবাল ['বাংলা গবেষণা পত্রিকা', বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, নভেম্বর ২০০২/কার্তিক ১৪০৯]

৮. হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রবোধচন্দ্র সেন ['রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' ক্ষুদিরাম দাস ও অন্যান্য সম্পাদিত। রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবন্ধ সংকলন, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ ১৩৯৫]

৯. হিন্দু-মুসলমান ও রবীন্দ্রবাণী মৈত্রেয়ী দেবী ['হিন্দুমুসলমান ও রবীন্দ্রবাণী'। কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১/মে ১৯৭৪]

১০. হিন্দু-মুসলমান বিরোধ—রবীন্দ্রনাথের চোখে গৌরী আইয়ুব ['চতুরঙ্গ', কলকাতা, পৌষ ১৩৯৪/জানুয়ারি ১৯৮৮]

১১. রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ['রবি-পরিক্রমা', ঢাকা, জুলাই ১৯৬৩]

১২. রবীন্দ্রপ্রবন্ধ মুসলমান ও হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক হুমায়ুন আজাদ ['রবীন্দ্রপ্রবন্ধ রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা'। ঢাকা, শ্রাবণ ১৩৮০/আগস্ট ১৯৭৩]

১৩. ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ গোলাম মোস্তফা ['বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', কলকাতা, শ্রাবণ ১৩২৯]

১৪. গল্পগুচ্ছের মুসলিম চরিত্র মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ['আধুনিক বাংলা সাহিত্য', ঢাকা, আষাঢ় ১৩৭২/জুন ১৯৬৫]

১৫. রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলিম সমাজ ও জীবন মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া [রবীন্দ্রচেতনায় মুসলিম সমাজ'। কলকাতা, অক্টোবর ১৯৯০/আশ্বিন ১৩৯৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও